ASARIRI JHARH

A Bengali Novel

By SAIAD MUSTAFA SIRAJ

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস্. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
গৌতম রায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

দাম
১৮·০০

শিশির কর

প্রীতিভাজনেষু

কিন্তু ততদিনে মুসহরদের দলে যোগ দিয়েছে বাবু ভদ্রলোকের ছেলে-পুলেরা। তাই রাজনীতির ঝাণ্ডা উড়িয়ে বস্তী উচ্ছেদ রোখা হয়েছিল।

কিন্তু মুসহর বস্তীর উন্নতি হল কই? সেই নীচু ঘর, তালপাতার ছাউনি, হাড় বের হওয়া দারিদ্র্য, কয়েকটা ট্রানজিস্টারের মুহুর্মুহু চিৎকারেও ঢাকা পড়ে না। কয়লাকুড়ানী বুড়ী বুধনী বহরী যৌবনে সাতকাণ্ড করেও এখন মাঝে মাঝে ভিক্ষেয় বেরোয়। তার মেয়ের নাম ছিল সৈকা। বুধনী কানে কালা। তাই বহরী নামে পরিচিত। মেয়েটা তার ডাকে সাড়া দিতে মুখে রক্ত তুললেও সে সমানে ডেকে যেত, হেই গে সৈকিয়া-আ-আ! সৈকিয়া গে-এ-এ-এ!

সৈকার বয়স হয়েছিল চৌদ্দ-পনেরো বছর। হাল্কা ছিপছিপে শরীর। মুখে আশ্চর্য একটা লাবণ্য ছিল বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মতো। গত বছর সন্ধ্যায় সবে মস্ত চাঁদ উঠেছে, সে তার আদরের ছাগল খুঁজে আনমনা আসতে আসতে ট্রেনের চাকায় পিষে মরেছিল।

সে ঘটনা ডিস্ট্যাণ্ট সিগনালের কাছে। ওই শ্মশানবটের সামনা-সামনি।

কিন্তু অপমৃত্যুর পরিণামে সৈকা যে ভূত হয়েছে, আজকাল কারুর বিশ্বাস করার কথা ছিল না। অথচ হুলো বলে গেল, অমিকে সৈকা ধরেছে। কারণ, সারারাত নাকি অমি মুসহরদের বুলিতে কথা বলেছে। এমন কি সৈকার আদরের ছাগলটার নাম ধরে কেঁদেছে ও।

হুলোর বলায় নিশ্চয় বাড়াবাড়ি আছে। হুলোকে দেখতে যেমন গবেট এবং কতকটা জড়ভরত গোছের হাবাগোবা ছেলে, বস্তুত সে তা নয়। ভেতরে ভেতরে নাকি ভীষণ ধূর্ত। মোহনপুরে সবাই জানে, হুলো ডনের গ্যাং-এর মারাত্মক চর। তার আপাতনিরীহ ড্যাবডেবে গোলাকার চোখের কোণায় চোরা একটা দৃষ্টি আছে, যা গোয়েন্দার।

হেমাঙ্গ মুখ ধুয়ে প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ

মোছে। তারপর খালের এপারে বাঁধ বরাবর হাঁটতে থাকে। গত রাতে কলকাতা থেকে ফিরে ঘুমটা ভারি গভীর হয়েছিল বলেই এত সকাল সকাল উঠতে পেরেছে। নয়তো অন্তত আটটা অব্দি শুয়ে থাকত। এবং ভালো ঘুমের দরুণ অনেক দিন পরে তার মন মেজাজ ও শরীর বেশ হাল্কা ছিল। কিন্তু অমির ব্যাপারটা শুনে আনমনা ভাব তাকে পেয়ে বসেছে।

বড় পোলের কাছে গিয়ে সে বাঁদিকে বাড়িব রাস্তায় ঘোরে না। ডাইনে বড় পোল পেরিয়ে বাজারের দিকে হাঁটতে থাকে। মুনাপিসি চা করে নিয়ে বসে থাকবে। থাক। বাজারে গিয়েই চা খাবে সে। কেন কে জানে, অমির ব্যাপারটা তাকে ক্রমশ অস্বস্তিতে ভোগাতে শুরু করেছে। এড়িয়ে থাকার জন্যেই যেন এমন করে তফাতে সরে যাওয়া।

একপাশে রেলকলোনী, অন্য পাশে বাজার এলাকা। মাঝামাঝি জায়গায় চৌরাস্তা। মধ্যিখানে গোল ঘাসের পার্ক। তার কেন্দ্রে দেশনেতা নলিনাক্ষবাবুর আবক্ষ প্রতিমূর্তি আছে। ক'দিন আগে ওঁর জন্মদিন গেল। গলায় মালাটা শুকনো হয়ে ঝুলছে এখনও। থাম ঘেঁষে একটা পাগল বসে আছে হাত-পা ছড়িয়ে। ঘুমোবার ভান করছে। অন্যদিন হলে হেমাঙ্গ হয়তো একটু রসিকতা করত। আজ সোজা হরসুন্দরের চায়ের আখড়ায় ঢুকে পড়ে।

ঢুকেই একটু চমকে যায়। ডন কোণার দিকে বসে আছে।

ডন থাকলে তার ইয়াররাও থাকে। হেমাঙ্গ এক পলকে দেখে নেয় ইদ্রিস আর মুসহর বস্তীর ঝেন্টুও আছে। ঝেন্টুর বাবা রেলে গ্যাংম্যানের চাকরি পেয়েছিল। কবে মরে হেজে গেছে। ঝেন্টুয়াকে হাইস্কুলে কয়েক ক্লাস-তক পড়াতে পেরেছিল। সেই সুযোগে হেমাঙ্গর সহপাঠী হয়েছিল কিছুদিন। মুসহরের ছেলে বলে ক্লাসে অনেকে তাকে ছি-ঘেন্না করত। আর আজকাল? ঝেন্টুই পাল্টা ছি-ঘেন্না করতে পারে। ডনের সঙ্গে জুটে মোহনপুরের এক মার্কামারা মস্তান হয়ে উঠেছে। চেহারা আর পোশাকে তাকে অবশ্য মুসহর বলে চেনাও

বুক কেঁপে উঠেছিল, তাতে কোন ভুল নেই। ওভারব্রীজ তখন নির্জন। নীচের প্ল্যাটফর্মগুলোও প্রায় খাঁ খাঁ।

ডন বলেছিল, আপনি দিদিকে বিয়ে করছেন কবে?

হেমাঙ্গ চমকে উঠেছিল।—তার মানে?

মানে! এত সোজা কথার মানে জানেন না?

না।

ডন অশ্লীল ভঙ্গীতে বলে উঠেছিল, না? তাহলে ফোকটে ফুর্তি ওড়াবেন?

অন্য কেউ হলে হেমাঙ্গ চড় মারত। কিন্তু ডনের গায়ে হাত তোলার সাহস তার নেই। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিল, ছিঃ ডন! তুমি এ কী বলছ!

লিমিট ছাড়িয়েছে বলেই বলছি। আমার সোজা কথা। হয় বিয়েটা শীগগির করে ফেলুন, নয়তো এখনই কাট আপ করে দিন। নৈলে…

নৈলে কী?

মোহনপুরে থাকা যাবে না। বলে ডন হনহন করে এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর সিঁড়ির মুখে হঠাৎ থেমে গলা চড়িয়ে বলেছিল, আমার দিদি বলেই কথাটা বললাম না। আর কোন মেয়ে হলেও বলতাম।…

হেমাঙ্গ জানে, ডনের মতো বদমাসেরও কিছু ব্যাপারে যেন নীতি-বোধ থাকে। মানুষের চরিত্রের এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। অন্তত ডনের যতটা খবর সে রাখে, সব রকম বদমায়েশী এ বয়সেই সে করতে পারে, শুধু মেয়েছেলে বাদে। এই একটা ব্যাপারে ডনের কোন বদনাম নেই। এক সময় যখন সে তত কিছু কুখ্যাতি কুড়োয়নি, তখন হেমাঙ্গ দেখেছে, অনেক বড় ঘরের মেয়েরা ডনকে প্রচণ্ড পাত্তা দেয়। দেশনেতা নলিনাক্ষবাবুর বাড়ির মেয়েদের ডনের সঙ্গে রেলকলোনীর জব্বর ফাংশনে পাঠানো হত। কলকাতার নামী দামী আর্টিস্টদের নিয়ে ফাংশন শেষ হতে রাত প্রায় একটা বেজেছে। ডন মেয়ে-গুলোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে! ঘরেও গতিবিধি অবাধ ছিল।

অবশ্য নলিনাক্ষর পরিবারে ডনের খাতিরের কারণ ছিল রাজনীতি। ডন ও তার সঙ্গীদের দরকার হত ওদের। একালের রাজনীতিতে মাস্তান গুণ্ডা চাই-ই। ওদিকে স্থানীয় প্রশাসন মুখে যতই শাসন-তর্জনের ভঙ্গী করুক, ডনকে তাদেরও দরকার হয় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার জন্যে। কিছুদিন আগেই তো রেলইয়ার্ডে বাইরের ওয়াগান ব্রেকার গ্যাংটা ডনেরই সাহায্যে ধরা পড়ল। একালের সমাজে ডনের প্রয়োজন আছে বলেই ওর উদ্ভব ঘটেছে হেমাঙ্গের ধারণা।

তবে অনেক সময় হেমাঙ্গর মনে হয়েছে, কুৎসিত ব্যাপারকেও স্বীকার করে নেবার অসহায় অভ্যাস যেন মানুষের রক্তে আছে। একটা ব্যাখ্যা দাঁড় না করিয়ে পারে না মানুষ। এবং বিনা কারণে কিছু ঘটে না, এই নিয়তিবাদের খপ্পরে পড়েই সে যেন সান্ত্বনা চায়। কলেজে ইতিহাসের লেকচারার বিধুবাবু বলতেন, ওই যে হিটলারের আবির্ভাব ঘটেছিল, তারও প্রয়োজন ছিল। ইতিহাস বিশ্লেষণ কর, সব টের পেয়ে যাবে। সু-এ কু-এ ঘাত সংঘাত লেগে না থাকলে সমাজ এগোবে কেমন করে? রাবণ না থাকলে, রামের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না। ভগবানের বল, মহাকালের বল, এটাই লীলা। ঐতিহাসিক নিয়মও বলতে পারো, আমি আপত্তি করব না।···বলে জব্বর একটিপ নস্যি নিয়ে মুখটা শুওরের মতো আকাশে তুলতেন হাঁচির প্রত্যাশায়।

ঝেণ্টু বেরিয়ে এলো।

হেমাঙ্গর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেন যেন হাসে সে। হেমাঙ্গ সাড়া দিয়ে ঘাড় নাড়ে। ঝেণ্টু কবে সাইকেল কিনেছে লক্ষ্য করেনি সে। ঝকমকে নতুন সাইকেলটা একপাশে দাঁড় করানো ছিল। সেটা টেনে দোকানের সামনে আনে সে। ডনকে বলে, চলি রে! তারপর সাইকেল চেপে বেরিয়ে যায়।

ডনের মুখ অন্য পাশে ফেরানো। এতক্ষণে ডাকে, হেমাদা, ভেতরে আসবেন না?

হেমাঙ্গর চা খাওয়া শেষ। কাপ প্লেট নীচে রেখে ভেতরে ঢোকে। যেন কেউ তাকে টেনে ঢোকায়। হয়তো ডনের এই ক্ষমতা আছে। তাকে অস্বীকার করা যায় না। তাকে ঘৃণা করেও ঘৃণা দানা বাঁধে না মনে। হেমাঙ্গর মনে হয়, ডনকে আসলে সে বড্ড ভয় পায়। অথচ হাতাহাতি লড়লে ডন তাকে কাবু করতে পারবে না সম্ভবত। হেমাঙ্গ তার চেয়ে ঢ্যাঙা। শরীরের হাড় মোটা। ডন তো সে তুলনায় পাঁকাটি।

কিন্তু হেমাঙ্গর এ মুহূর্তে ভাল লেগেছে ডনের এই ডাক। তাছাড়া অমির সত্যি সত্যি কি হয়েছে, জানবার ইচ্ছেও প্রবল। সে ভেতরে ঢুকে আগে একটা সিগারেট ধরায় এবং ইদ্রিসকে বলে, নাও।

ইদ্রিস প্যাকেটটা নিয়ে ডনকে বলে, খা রে গুরু! হেমাদার মাল!

সে খিকখিক করে হাসে। ডন কিন্তু নিঃসঙ্কোচে সিগারেট বের করে নেয়। তারপর বলে, কলকাতা গিয়েছিলেন হেমাদা?

হ্যাঁ, রাতে ফিরেছি।

জামসেদপুর থেকে ডাবুদা এসেছে পরশু। আপনার কথা জিগ্যেস করছিল।

ডাবু! তাই বুঝি?

আপনাদের বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিল। পিসিমা বলেনি?

কৈ, না তো!

ইদ্রিস বলে, পিসিমা মাইরি বুধনী বহরীর মতো…বলেই সে জিভ কাটে। হাসতে থাকে। ডন হাসে না। হেমাঙ্গ হাসে একটু।

ডন বলে, ডাবুদা থাকবে দিন কতক।

পাঠিয়ে দিও। আমি আছি।…বলে হেমাঙ্গ ডনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর দিদির ব্যাপারটা বলছে না কেন ডন? নাকি হুলোর নিছক রসিকতা? তবে হুলো তার সঙ্গে কোন দিন রসিকতা করেনি। হঠাৎ কেন করতে যাবে? এই অজ্ঞাতকুলশীল

পড়ে পাওয়া ছেলেটি যতই দাগী খচ্চর হোক, তাকে মোহনপুরের লোকেরা বরাবর স্নেহও করে। ষোলো সতেরো বছর আগে বাস স্ট্যাণ্ডে দু-আড়াই বছরের একটা বাচ্চাকে ফেলে তার ভিখারিণী মা পালিয়ে গিয়েছিল। হুলোকে দয়া করে মানুষ করেছিলেন বাস-আপিসের রহমান সায়েব। রহমান সায়েব মারা গেলে আবার অনাথ হয়ে যায়। তখন স্টেশন বাজারের সবাই ওর ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেয়। তারপর দেখতে দেখতে ছেলেটা এত বড় হয়ে গেল। বাস-আপিসেই থাকত ড্রাইভারদের সঙ্গে। ইদানিং থাকে গুলাইয়ের হোটেলে। সত্যি বলতে কি, হুলোকে গুলাই থাকতে দিয়েছে সেও ডনের ভয়ে। হুলো কোন কাজে আসে না। খায় দায় ঘুরে বেড়ায়। সব সময় নানান ফন্দি ফিকির তার মাথায়। হুলোকে ডনদের চর বলে জানে সবাই। তাই গায়ে হাত তোলার সাহস নেই কারও। তাছাড়া সেই পুরনো স্নেহের তাগিদ।

ডন হঠাৎ একটু হাসে।—ডাবুদাকে চিনতে পারবেন না। খুব মোটা হয়েছে।

এবার হেমাঙ্গ বলে ওঠে, ইয়ে, হুলো বলল, অমির কি নাকি অসুখবিসুখ হয়েছে? বলেই সে অস্বস্তিতে পড়ে। ডন কি ভাবে নেবে বলা যায় না। বড্ড খামখেয়ালী ছেলে সে। আর এখানে এত কাছে ইদ্রিস বসে আছে। হেমাঙ্গ সাহস পায় না ডনের দিকে তাকাতে। ইদ্রিসের দিকে তাকায়। ইদ্রিস কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে।

ডন একটু পরে আস্তে বলে, হুলো কী বলেছে আপনাকে?

হেমাঙ্গ মরিয়া। হাসে।—কী সব ভূত-টুত বলছিল।

ডন মাথা দোলায়। তারপর তেমনি আস্তে বলে, ভারি অদ্ভুত ব্যাপার হেমাদা। আমি তো একেবারে স্টাণ্ট। শালা, রাত্রে আর ঘুমই হল না!

কেন? কী ব্যাপার?

ঝেণ্টুদের ভাষায় কথা বলছে। হুবহু ওই রকম টাং। ডনের মধ্যে থেকে এখন সেই ছেলেবেলার সরল বালকের মূর্তিটি বেরিয়ে এসেছে। মুখে সেই বিস্ময়।

হেমাঙ্গ শুধু বলে, বল কি! সত্যি!

আবার একটু চুপ করে থাকার পর ডন বলে, কাল সন্ধ্যায় নাকি ঝেণ্টুদের বস্তীর কারা দেখেছে, সিগন্যালের ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল একা। এইমাত্র ঝেণ্টু বলে গেল। তা, কাল আমার শরীরটা ভাল ছিল না। শুয়ে পড়েছিলুম সকাল-সকাল। রাত্ত এগারোটা নাগাদ জেঠিমা ওঠাল। দিদি নাকি ফিট হয়ে বারান্দায় পড়ে আছে।

নীচের, না ওপরের?

নীচের। ডন চাপা গলায় বলতে থাকে, জেঠিমারা নাক টিপে ধরে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেছে। পারেনি। আমাকে ডেকেছে। ডাক্তার ডেকে আনলুম…

বাধা দিয়ে হেমাঙ্গ বলে, নীচে গিয়ে তুমি অমিকে কি অবস্থায় দেখলে?

ফিট হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে খিঁচুনির মতো হাত পা ছুড়ছে। আমি ভাবলুম, যা শালা! মরেই যাবে তাহলে। যাই হোক, ডাক্তারকে ওঠালুম। নিয়ে এলুম। স্মেলিং সল্ট না কি শোঁকাল। জ্ঞান হল। কিন্তু ভুল বকতে শুরু করল ঝেণ্টুদের ভাষায়। ডাক্তার বলল, জল ঢালো আরও। কিস্যু হল না। বরং বেড়ে গেল। হাত-পা ছোড়াছুড়ি করছিল দেখে যেই ধরতে গেছি, এমন চড় মারল!…

ডন গালে হাত রাখে। হেমাঙ্গ বলে, তারপর?

ডাক্তার বলল, হিস্টিরিয়া। যত ব্যস্ততা দেখাবে, তত পেয়ে বসবে। ছেড়ে সরে যাও সবাই।

ওষুধ বা ইঞ্জেকশান দিল না?

হ্যাঁ। ব্রোমেন্ড না কি বলল। ওষুধটা খেয়ে ঘুমোল, তখন রাত্ত

তিনটে প্রায়। হেমাঙ্গ একটা ভারি নিশ্বাস আস্তে আস্তে বের করে দেয়। তারপর বলে, এর আগে কখনও ফিট-টিট হত নাকি?

ডন মাথা নাড়ে এবং হেমাঙ্গর চোখে চোখ রেখে বলে, আমি আপনাকে জিগ্যেস করব ভাবছিলুম···

কী? হেমাঙ্গ নড়ে ওঠে।

ইদ্রিসের দিকে অপলক তাকিয়ে ডন সংযত হয়। আর ততক্ষণে হরসুন্দরের চা খেতে আরও খদ্দের এসে গেছে। ডন উঠে দাঁড়ায়।

ইদ্রিস বলে, উঠলি?

হ্যাঁ। তুই বাড়ি যাবি তো?

ইদ্রিস হাই তুলে আড়ামোড়া দিয়ে বলে, যাই। বাপটা আজ খচে হয়তো লাল হয়ে আছে। জবাই করবে। রাতভোর বেপাত্তা ছিলুম।

ওদের সঙ্গে হেমাঙ্গও বেরোয়। হরসুন্দরকে চায়ের দাম দিয়ে পা বাড়ায় ডনের পিছনে। ডনের মুখটা গম্ভীর। ইদ্রিস ফের হাসতে হাসতে বলে, আজ মাইরি গুলাইচাচার হোটেল ভরসা।

ডন কোন কথা বলে না। পিছন থেকে হেমাঙ্গ বলে, ডন বাড়ি যাচ্ছ তো?

একটু পরে যাব। আপনি?

যাব। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

ঠিক নেই। চলুন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাই।

ইদ্রিস চলে যায়। ডন ও হেমাঙ্গ খালপোলের কাছে এসে দাঁড়ায়। কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় আশেপাশের গাঁয়ের লোকেরা শাকসবজি বেচতে এনেছে। ভিড় আছে। হেমাঙ্গ একবার ভাবে, বাজারটা করে নিয়ে গেলে মুনাপিসি খুশি হত। অগত্যা কিছু টাটকা মাছও। রুমাল তো আছেই।

হঠাৎ হেমাঙ্গ লক্ষ্য করে ডন তার দিকে তাকিয়ে আছে। হেমাঙ্গ একটু অস্বস্তিতে পড়ে যায়। বলে, হ্যাঁ, তখন কি যেন জিজ্ঞেস করবে বলছিলে?

ইদানিং দিদির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে নাকি ?

না। বলে হেমাঙ্গ হাসবার চেষ্টা করে। এই ভিড়ের মধ্যে ডনের সঙ্গে অমির ব্যাপারে কথা বলা শুধু নয়, ডনের সঙ্গে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লোকের এমন কিছু ধারণা হওয়াও হেমাঙ্গের কাছে সঙ্গত মনে হচ্ছে না। সে ফের বলে, এখানে দাঁড়ালে কেন ? চল, এগোই।

চলুন। বলে চিন্তিত ডন পা বাড়ায়।

খালপোল পেরিয়ে গিয়ে হেমাঙ্গ বলে, প্রথম কথা, ইদানিং আমি চাকরির ব্যাপারে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছি। দ্বিতীয় কথা, তুমি অমন করে চার্জ করে বসলে গত মাসে। তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতো ডন।

হাত তুলে ডন বলে, ও কথা থাক। আমার হঠাৎ রাগ হয়েছিল ওভারব্রিজে আপনাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। থাক সে কথা।

হেমাঙ্গ অন্তরঙ্গতার আশায় সাহস করে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে পা বাড়ায়। ডন আপত্তি করে না। হেমাঙ্গ হাঁটতে হাঁটতে বলে, তোমাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়েছি সেই কবে ? মাস চারেক তো বটেই। তোমার জ্যাঠামশাই তো খুব ইনসালটিং টোনে কথা বলেছিলেন।

বাঁদিকে সরু একফালি রাস্তা। এবড়ো খেবড়ো। দু'ধারে রাঙচিতা বেড়া। ঘন গাছপালা, কলাবাগান, শাকসবজীর ক্ষেতের মধ্যে ঘরবাড়ি। এটা উদ্বাস্তু এলাকা। ডন এই মোড়ে দাঁড়ায়। বলে, আমি কলোনীতে যাব।

হেমাঙ্গ বুঝতে পারছে না এখনও অমির ব্যাপারটা নিয়ে ডন এত মুসড়ে পড়েছে কেন। কেন যেন হেমাঙ্গকে জড়িয়ে ফেলেছে অমির ভূতে পাওয়ার সঙ্গে। ডনের খামখেয়ালী হাবভাব তার জানা। কিন্তু এটা রীতিমতো অস্বস্তিকর। ডন কি তার দিদির ভূত-টার জন্যে হেমাঙ্গকেই দায়ী করতে চায় ? হেমাঙ্গ বলে, ডাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছ কখন ?

আপনি যান না! ডাবু এখনও ঘুমোচ্ছে। কাল রাতে দিদির জ্বালায় কারুর তো ঘুম হয়নি।

বলেই ডন হন হন করে চলতে থাকে কলোনীর রাস্তায়। একটু পরে হেমাঙ্গর আবছা কানে আসে ডন শিস দিয়ে কী সুর ভাঁজতে ভাঁজতে যাচ্ছে। হেমাঙ্গ সোজা এগিয়ে পোড়ো আগাছা ঢাকা একটা জমির পাশ ঘুরে আবার খালের ধারে পৌঁছয়। শর্টকাট রাস্তায় বাড়ি ফেরে।

মুনাপিসী বাইরের চেয়ারে বসে কাঁসার গেলাসে চা খাচ্ছে। চিরদিনের অভ্যেস। নিকেল ফ্রেমের সেকেলে চশমা নাকের ডগায় নেমেছে। পাশের মিত্তিরবাড়ির ছোট বউমার সঙ্গে রসিকতা করছে। ভদ্রমহিলা মেয়েকে রেলকলোনীর কিণ্ডারগার্টেনে দিতে যাচ্ছেন। হেমাঙ্গকে দেখে একটু হেসে বলেন, মর্নিং ওয়াক হল ঠাকুরপোর?

হল। হেমাঙ্গ হাসে।—মিনি স্কুল যাচ্ছে বুঝি? হাঁটিয়ে নিয়ে যাবেন অদ্দুর?

রিক্‌শোওলা এলো না এখনও। তো কী করব? ওদের যা রোয়াব হয়েছে! অসুখবিসুখ হয়েছে হয়তো।…বলে হেমাঙ্গ বারান্দায় ওঠে।

মিত্তিরদের ছোট বউমা মেয়েকে নিয়ে চলে যান। মুনাপিসি বলে, বাজারে চা খেতে গিয়েছিলি তো? তা বেশ করেছিস। কিন্তু সেই সঙ্গে বাজারটাও করে আনলে কেমন হত।

হেমাঙ্গ বলে, তোমার কলোনীর সেই বুড়ো তো আসবে। ভাবছ কেন?

মাছ ছাড়া যে তোর ভাত উঠবে না বাবা!

হেমাঙ্গ হাসে।—আজ নিরিমিষ হোক না বাবা!

মুনাপিসি হাসতে গিয়ে চা পড়ে যায় কাপড়ে। হেমাঙ্গ বাইরের ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকতে যাচ্ছে, মুনাপিসি সেই সময় চাপা গলায় বলে ওঠে, হ্যাঁ রে হেমা! বোসদার ভাই ঝি, মানে অমির কি হয়েছে শুনেছিস? কেলেঙ্কারি নাকি?

শুনেছি। কিন্তু কেলেঙ্কারি কেন ?

বুধনী বহরীর মেয়ে নাকি ওকে ধরেছে ? মুনাপিসি হাসে না। গম্ভীর মুখেই বলতে থাকে। ও মাসে কায়েতপাড়ার সুবীর বউমাকেও নাকি ধরেছিল। কদমতলার থানে গিয়ে ছাড়িয়ে এনেছিল। কাকেও জানতে দ্যায়নি।

সৈকা ধরেছিল বলছ ?

না বাবা, না! লোকে বলছে।

পিসিমা, তুমি কখনও ভূত-টুত দেখেছ ?

এবার হাসতে হাসতে মুনাপিসি উঠে আসে। দু'জনে ঘরে ঢোকে। হেমাঙ্গর শোয়ারও ঘর, আবার গেস্টরুমও বটে। সতীশ পিসেমশাইয়ের মোক্তারীর টাকায় তৈরি। একতলা এই ছোট্ট বাড়িটার গায়ে সতীশ মোক্তারের স্নেহের ছাপ লেগে আছে।

মুনাপিসি কাঁসার গেলাসটা উঠোনের দিকের বারান্দায় রেখে এসে বলে, ভূত-প্রেতের কথা বললি তো ? আমি বাবা কখনও ওনাদের দেখিনি। এ জন্মে যেন দেখতে টেখতে না হয়। তবে তোদের মোহনপুরে কিন্তু বরাবর ভূত-প্রেতের আখড়া। সেই কবে বউ হয়ে এখানে এলুম। কত দেখলুম, শুনলুম। এখানে তখন গলিতে ভূত, গাছে-গাছে ভূত। আর এ বেলা ও বেলা বউ-ঝিদের দুমদাম করে ভূতে ধরছে।

হেমাঙ্গ আগ্রহী হয়ে বলে, ভূতে ধরলে কি করে পিসিমা ?

ফিট হয়। দাঁত কিড়মিড় করে। লাল চোখ পাকিয়ে তাকায়। হিহি করে হাসে। আর আবোল-তাবোল বকে।…কথা ভালভাবে বলার জন্যে মুনাপিসি মেঝেয় বসে পড়ে।—তোর পিসেমশাই এসব মানতেন না। বলতেন হিস্টিরিয়া। আমি বলতুম হিস্টিরিয়া কি মড়কের মতো। হল তো হল একেবারে দলে দলে ? আর সব্বাই কম বয়সের মেয়ে ?

কম বয়সের মানে, কত ?

ওই অমির বয়সী, নয়তো মিনির মায়ের মতো। কারুর বিয়ে

হয়েছে, কারুর হয়নি, এমন মেয়ে। আর জানিস হেমা? কে ধরেছে, তাও বলত।

তুমি বিশ্বাস কর না এ সব?

কে জানে বাবা! আমি কিছু বুঝতে পারিনে। তবে একবার স্টেশনের ছোটবাবুর বউকে ধরেছিল। মেয়েটা ইংরেজি বলছিল। অথচ মেয়েটা ইংরেজি তেমন জানতই না। বাড়িতেই সামান্য লেখাপড়া।

হেমাঙ্গ গম্ভীর হয়ে থাকে। তারপর বলে, আমি আবার চা খাব পিসিমা।

খাবি! বেশ তো। কথাটা সস্নেহে বলে মুনাপিসি রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

॥ দুই ॥

হেমাঙ্গর মনে মায়ের কোন স্মৃতি নেই। তার দেড়বছর বয়সে মা মারা যায়। তার বাবা বরদাপ্রসন্ন রেলের টিকিট চেকার ছিলেন। বড় উচ্ছৃঙ্খল মানুষ ছিলেন তিনি। মদ্যপান করতেন। আরও নানা রকম দোষ ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রেলেরই এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ডের বিধবাকে বিয়ে করেন। সে ভদ্রমহিলা আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছিলেন। তাই বরদা দ্বিতীয় স্ত্রীকে আত্মীয় স্বজনের বাড়ি কখনও নিয়ে যেতে পারেননি। হেমাঙ্গ অবশ্য সৎমায়ের স্নেহ পেয়েছিল। ওঁর কোন ছেলেপুলে ছিল না। হবারও সম্ভাবনা নাকি ছিল না। ছ-সাত বছর বয়সে কী ভেবে বরদা হেমাঙ্গকে তার আপন মামার বাড়িতে রেখে আসেন। কাটোয়ায়। সেখানে হেমাঙ্গ প্রাইমারি অব্দি পড়াশোনা করেছিল। খেয়ালী বরদা আবার কী ভেবে তাকে মোহনপুরে দূর সম্পর্কের এই দিদির বাড়ি রেখে যান। সতীশ মোক্তারেরও ছেলেপুলে ছিল না। হেমাঙ্গ আদর খেয়ে বড় হতে থাকে মুনাপিসির কাছে। এখানে হাইস্কুল আছে। পরে কলেজও হয়েছিল। হেমাঙ্গর পড়াশোনার খরচ বরদাই যোগাতেন। হেমাঙ্গ যখন ক্লাশ টেনে পড়ছে, বরদা স্যুইসাইড করেন। রেলের লোক বলে রেলে মরেননি, সাইনাইড খেয়েছিলেন কফির সঙ্গে। গুজব আছে, হেমাঙ্গর সৎমাই নাকি বিষ খাইয়ে মেরেছিলেন। পুলিস কেসও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা বলে ব্যাপারটা চাপা পড়ে। আর সেই আদিবাসী মহিলা, মিসেস উর্মিলা ব্যানার্জি। প্রাক্তন উর্মিলা জেভিয়ার নিকে করেন এক দক্ষিণ ভারতীয় রেল অফিসারকে। হেমাঙ্গ যতদূর জানে ওঁরা এখন নাকি খড়্গপুরে থাকেন। শৈশবের 'মাম্মি'কে একটু আধটু মনে পড়ে তার। মনটা কেমন করে ওঠে।

কতদিন স্বপ্নেও দেখতে পায়। ঘুম ভেঙে কতক্ষণ মন খারাপ করে।

হেমাঙ্গর ইংরেজি উচ্চারণের প্রশংসা স্কুল কলেজে প্রচুর ছিল। সে তো তার ছোটমায়ের দৌলতেই। তার ওই অল্প বয়সে মাথায় কিছু ঢুকে গেলে স্থায়ী থেকে যায় বুঝি। হেমাঙ্গর ইংরেজিটা ভালই আসে।

মোহনপুরে হাইস্কুলে অন্তত মাস্টারিটা পেতে পারত সেই তারই জোরে। কিন্তু রাজনীতি অতি বিষম বস্তু। বি-এ পাশ করে পাঁচটা বছর বসে আছে। কত চেষ্টাচরিত্র করেও কিছু হল না। প্রথম টের প্রায় আর্টস পড়াটাই ভুল হয়েছিল। সায়েন্স কিংবা কমার্স পড়লে কিছু হয়তো জুটে যেত। কিন্তু অঙ্কের প্রতি তার বরাবর আতঙ্ক।

দু-একটা চান্স একেবারে না পেয়েছিল, এমন নয়। কিন্তু সে বড্ড দূরে এবং কাজও খুব বাজে রকমের। মুনাপিসি তার চাকরিতে উৎসাহ দেখায় না। বলে—কী দরকার বাবা? বেশ তো আছিস। বরং মোহনপুরে আজকাল বাড়বাড়ন্ত ব্যবস্থা। ব্যবসা কর কিছু। পুঁজি অল্পস্বল্প যোগাতে পারব। বাকিটা ছাখ না, ব্যাংক থেকে লোন পাস নাকি?

ব্যবসা হেমাঙ্গর ধাতে নেই। তবে মধ্যে একবার ঝোঁক চেপেছিল কলকাতায় ডিম সাপ্লাই করবে। কাজে না নামতেই তাকে আণ্ডা-ওয়ালা বলে ঠাট্টা শুরু হল। হেমাঙ্গ অমনি ও লাইন এড়িয়ে তফাতে এলো। একবার পোলট্রি করার ঝোঁক চেপেছিল। ব্যাংক থেকে লোন পাওয়ার আশ্বাসও পেয়েছিল। কিন্তু মুনাপিসির আপত্তিতে হল না। পিসিমার বিধবার চালচলন নেই। সাহসী একগুঁয়ে মহিলা বরাবর। আমিষ খায়। ধর্মের বাতিক তত কিছু নেই। নেহাৎ মন গেল তো একাদশীটা মাঝে মাঝে করল। ব্যস, ওটুকুই। আসলে হেমাঙ্গ বোঝে, পিসেমশাই সতীশ মোক্তার কম্যুনিস্ট সমর্থক ছিলেন। কথায় কথায় মার্কস

লেনিন আওড়াতেন। মুনাপিসির স্বামী-ভক্তির প্রাবল্য হেমাঙ্গ দেখেছে। তাকে পিসেমশাই গিলে খেয়ে গেছেন!

না, মুনাপিসি রাজনীতির কিছু বোঝে না। খবরের কাগজ কদাচিৎ পড়ে। তবে সতীশ মোক্তার সম্ভবত স্ত্রীর সত্তার গভীরে কোথাও একটা স্বাভাবিক বিশ্বাসের ভিত নড়বড়ে করতে পেরেছিলেন হয়তো। হেমাঙ্গর তাই অবাক লাগছে, যে-মুনাপিসি ভগবান নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না, সে-ই আবার ভূতে কী গভীর ভাবে বিশ্বাস করে! সম্ভ্রমে 'ওনারা' বলে ভূতগুলোকে।

মুনাপিসির পোলট্রিতে আপত্তির কারণ, ওই গৃহপালিত পাখিগুলোর মাংস যত সুস্বাদুই হোক ওরা প্রচণ্ড নোংরা। নোংরা ঘাঁটা সইতে পারে না সে। ঘরবাড়ি জিনিসপত্র কী সাজানো-গোছানো ঝকঝকে করে রাখে সারাক্ষণ। নিজেও খুব পরিচ্ছন্ন থাকে।

মুনাপিসির আরেকটি কারবারে প্রবল আপত্তি। জুতোর কারবার। একবার হেমাঙ্গ একজনের পরামর্শে প্রখ্যাত একটা জুতো কোম্পানির রিজেক্টেড মাল এনে কারবার ফাঁদতে যাচ্ছিল। লাভ নাকি অঢেলই হত। গাঁ-গেরামের বিশাল এলাকায় এই একটা নতুন ক্রমবর্ধমান ও উন্নতিশীল রেলওয়ে টাউনশিপ। অসংখ্য খদ্দের দিনরাত মোহনপুর আনাগোনা করে। ব্যবসায়ীরা লাল হয়ে গেল। অনেকের রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হল।

কিন্তু মুনাপিসি নাক সিঁটকে বলেছিল—ছ্যাঃ! জুতো? লোকের পায়ে হাত দেওয়া কারবার? দোহাই বাবা হেমা, অন্য কিছু কর। এই তো পুজো আসছে, ছেলেমেয়েদের জামা প্যান্ট ফ্রক······

হেমাঙ্গ এই অব্দি শুনে বলেছিল, ধুর!

ভাগ্যিস মোক্তার পিসে সরকারী কাগজে টাকা জমিয়ে গিয়েছিলেন। মাসে মাসে সুদের টাকা আসছে। চলে যাচ্ছে মোটামুটি সচ্ছল ভাবেই। মুনাপিসি খরচে মানুষ নয়। কিন্তু রুচি এবং নজর উঁচুদরের, তাই বলে ডাঁট দেখাবারও পক্ষপাতী নয়। যতখানি ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব, তাই মেনে চলে। হেমাঙ্গকেও

সেইভাবে চালায়। হেমাঙ্গর তাই খাওয়া-পরার ভাবনা চিন্তাটা নেই। শুধু একটা কেমন-লাগার ব্যাপার আছে তার মধ্যে। এভাবে নিরোজগেরে হয়ে জীবন কাটানোর মানে হয়? পুরুষত্বে ছ্যাঁকা লাগে যেন।

তাই ভেতর ভেতর দরখাস্ত তাকে লিখতেই হয়। ইন্টারভিউ পায় শয়ে একটা বড় জোর। কলকাতায় গিয়ে যে ইন্টারভিউটা দিয়ে এলো, সেটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের। নেহাৎ কেরানীগিরির পরীক্ষা। কবে রেজাল্ট বেরুবে। তারপর পাস করলে প্যানেলে নাম উঠবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট যদি কোনদিন পায়, তো তখন হয়তো চুল পেকে সারা। বয়সসীমা পেরিয়ে গেছে

ধুর! হেমাঙ্গ তেতো হয়ে ভাবে এ সব কথা। কিন্তু এ যেন অভ্যাসের বাঁধা রাস্তায় চলা। রোজ খবরের কাগজের জন্যে হা-পিত্যেশ, প্রথমেই বিজ্ঞাপন খুঁটিয়ে পড়া, তারপর ফুলস্কেপ কাগজে দরখাস্ত লেখা, টাইপ করাতে সাবরেজেস্ট্রি অফিসের সেই আটচালায় ধর্ণা দেওয়া—যেখানে কোন কোন মুহুরীবাবু দলিল লেখার ফাঁকে ফাঁকে টাইপ রাইটারও চালায়···এ এক বদ অভ্যাসে পেয়ে বসেছে তাকে।

হ্যাঁ, তারপর পোস্টাপিসে লাইন দেওয়া? আজকাল যা ভিড়!

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলে কথা ছিল। দরখাস্ত পাঠিয়ে প্রতিদিন পিওনের অপেক্ষায় মুহূর্ত গোণো। প্রথমে এলো এ্যাক-নলেজমেন্ট রসিদটা। তারপর অস্থিরতা আর প্রতীক্ষা, কড়া নাড়লেই চমকে ওঠা, ওই বুঝি পিওন এলো!

এই কদর্য অভ্যাসের মধ্যে থেকেও অমির সঙ্গে কি একটা চলছিল কতদিন থেকে। প্রেম? হয়তো প্রেম। নিছক খেলা? হয়তো খেলা। সেক্সের টান? হেমাঙ্গ চমকায়। অমির গড়নে ভঙ্গিমায় হাসিতে, চোখে আর ঠোঁটে নিশ্চিত সেক্সের ঝিলিক আছে, যা মোহনপুরে কোন মেয়ের মধ্যে লক্ষ্য করেনি হেমাঙ্গ। কিন্তু অমি [illegible] নিজেই জানে না, ওর এত সব সেক্স-টেক্স আছে। হেমাঙ্গ তাকে
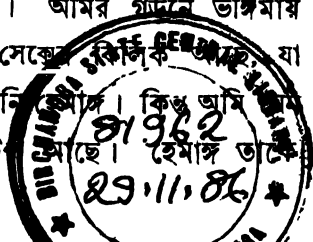
জানিয়ে দিতে পারত। হেমাঙ্গর অতটা সাহস হয়নি কোন দিন। ইচ্ছেও হয়নি।

আসলে যে মেয়েকে ছেলেবেলা থেকে দেখেছে যার সঙ্গে ক্রমাগত মিশছে তার অত সব মোহ ও সৌন্দর্য সত্ত্বেও একটা অদ্ভুত বাধা সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে সারাক্ষণ। অমি যখন তার সামনে নেই, তখন অমির শরীর নিয়ে হেমাঙ্গ খুঁটিয়ে ভেবেছে চাঞ্চল্যও জেগেছে, এবং লোভও চুপি চুপি পিছনে এসেছে। কিন্তু অমি যতক্ষণ সামনে আছে, ততক্ষণ কি এক নিস্পৃহতা তাকে পেয়ে বসেছে।

সেদিন সারা সকাল অমির কথা ভেবে হেমাঙ্গ সময় কাটাল।

ইদানিং অমিকে কেমন রুগ্ন দেখাচ্ছিল যেন। হাসলে এই রোগাটে ভাবটা স্পষ্ট হত। ওর লম্বাটে গালের মাংস কিছুটা টান টান মনে হচ্ছিল। কাপড়-চোপড়েও একটা অগোছালো ভাব যেন লক্ষ্য করছিল হেমাঙ্গ। কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে দূরের দিকে যেন তাকিয়ে থেকেছে অমি।

শেষ কথা খালের সেই পোলের কাছে। ওখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা হল। আজেবাজে কথা। তারপর অমি একটু ক্লান্তিভরা হাসি হেসে কপালের চুল সরিয়ে (প্রথমে চৈত্রের হাওয়া শুরু হয়েছিল সবে) বলল, চলি। ও বেলা থাকবে?

যাব কোথায়! কেন?

আসব। থেকো। কথা আছে জরুরী।

সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করেও অমি আসেনি। তখন হেমাঙ্গ মন খারাপ হয়ে স্টেশনের ওভারব্রীজে গিয়েছিল। তারপর ডনের আবির্ভাব এবং শাসিয়ে যাওয়া।

কী কথা ছিল অমির, এখন আঁচ করতে পারছে। বাড়িতে সম্ভবত তাকে নিয়েই কোন গোলমাল বেঁধেছিল। সেটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। দুজনের মেলামেশা নিয়ে মোহনপুরে কানাকানি হচ্ছিল অনেক দিন থেকে।

আসলে চেহারায় শহরের পোশাক ও ভাবভঙ্গী থাকলেও মোহন-

পুরের স্বভাবের আড়ালে সেকেলে গ্রাম্যতার বীজাণু থকথক করছে। এখনও আগের মতো লোকেরা কেলেঙ্কারি খুঁজে তোলপাড় করে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন ধর্মরাজার মন্দিরে গাজনের ধূম হয়। তখন সঙ সেজে ছড়াগান গেয়ে মোহনপুরের কেলেঙ্কারির হাঁড়ি ভাঙাভাঙি চলে। এখনও এ ব্যাপারটা মোহনপুর গাজন উৎসবের প্রধান অঙ্গ। আশ্চর্য, বাজারের মারোয়াড়ি, ইটখোলার উত্তরপ্রদেশবাসী মালিক, এমন কি রেলকলোনী-বাসী নানা জায়গার নানা ভাষার লোকেরাও চোখ নাচিয়ে আগাম সঙ বা গানের খবরাখবর নেয়। অর্থাৎ এবার কার হাঁড়ি ভাঙা হচ্ছে ?

এমন একটা জায়গায় সত্যিকার অর্থে আধুনিক প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারটা বিদঘুটে হতে বাধ্য। হেমাঙ্গ এবং বেচারী অমির বেলায় তাই হল। সামনে সংক্রান্তির গাজন আসছে। হেমাঙ্গ এই ভেবে শিউরে উঠছিল। তারপর মনে হল, ডনের দিদির নামে প্রকাশ্যে কেলেঙ্কারি করার সাধ্য কারও হবে না। সেই সুযোগে হেমাঙ্গও হয়তো রেহাই পাবে ।

এইসব নানান ভাবনায় হেমাঙ্গ অস্থির হয়ে কাটায় সারা সকাল। তারপর ডাবুর সাড়া পায়—এই ব্যাটা হেমা ! আছিস নাকি ?

হেমাঙ্গ বেরিয়ে বলে, আয়, আয়। এসেছিস শুনলাম। ডনকে বলে পাঠালাম, ও বলেনি ?

কোথায় ডন ? নাদুস-নুদুস মোটা ও বেঁটে ডাবু হাঁসফাস করে বারান্দায় ওঠে। তো এসেই শালা পড়ে গেছি ভূতের পাল্লায় ! কি তোদের দেশ মাইরি ! অমিকে এইমাত্র বলে এলাম, চল আমার সঙ্গে। ভূতের দেশে আর থেকো না। শুনে অমিও খুব হাসতে লাগল। বলল, যাঃ ! কিসের ভূত ?

বলল নাকি ? হেমাঙ্গ আগ্রহে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ ! এখন দিব্যি ভাল মেয়ের মতো ঠ্যাং নাচিয়ে চা খাচ্ছে। মাইরি, তোর দিব্যি !

ভেতরে আয় ডাবু ! কেমন আছিস বল ?

খুব মুটিয়ে গেছি রে! এই গরম আসছে, না মৃত্যু। জামসেদপুরের যা অবস্থা হবে। রুমাল বের করে ডাবু ঘাড় মোছে। তারপর সিলিঙের দিকে তাকিয়ে বলে, ফ্যান রাখিসনি ঘরে?

হেমাঙ্গ বলে দরকার হয় না। এখানে জানলার ধারে বস্। খুলে দিচ্ছি…

এই ডাবু ডনদের কে যেন হয়। কৈশোর থেকে হেমাঙ্গ ওকে ডনদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতে দেখেছে। কোন্ আমলে ওরা নাকি মোহনপুরেরই বাসিন্দা ছিল। চাকরি-বাকরির সূত্রে জামসেদপুরে যাওয়া। ডনের দাদা লালুর জামসেদপুরে চাকরি পাওয়ার কারণও ডাবুরা। এবং এই সব দেখে শুনে হেমাঙ্গর মনে হত, সেও ওইভাবে চাকরি করতে যাবে। এখন ভাবলে হাসি পায়।

ডাবু বরাবর মিশুকে ছেলে। মোহনপুরে এলে ওকে নিয়ে ছেলেদের মধ্যে সাড়া পড়ে যেত। মেয়েরাও টানাটানি কম করত না। বয়স্কা দিদি মাসি পিসি ঠাকুমারাও ডাবুকে দেখে খুশি হতেন। ডাবুর কি একটা গুণ ছিল সন্দেহ নেই। হেমাঙ্গর মনে পড়ে, বেঁটে হোঁৎকা মোটা ডাবু হাফপ্যাণ্ট পরে এই সেদিনও মোহনপুরে খেলার মাঠে ফুটবলের পিছনে দৌড়চ্ছে। রেলকলোনী বনাম তরুণ সংঘের ম্যাচ। সব বয়সের খেলোয়াড় নিয়ে খেলা। লোকোশেডের মাদ্রাজী ব্যাক বিশ্বনাথন, যাকে ছেলেরা বিশুদা বলে ডাকত, ডাবুর মতই হোঁৎকা মোটা ছিল। তাই বিশ্বানাথন রেলের দলে ব্যাক হলে ডাবু তরুণ সংঘের ব্যাক হবেই। আর দুজনকে লক্ষ্য করে মাঠের দর্শকরা এন্তার চেঁচাত। হাসাহাসি করত। কি যে সব দিন গেছে তখন! হেমাঙ্গ জীবনে ফুটবল ছোঁয়নি, আদপে কোন খেলা খেলেনি। কিন্তু খেলাধুলোর ব্যাপারে নীরব সমর্থকের মত ঘুরেছে। যেন ডাবুরই টানে। ডাবু মোহনপুর এলে তার মন খুশিতে নেচে উঠত। তখন দিনরাত ডাবুর সঙ্গে থাকা চাই তার।

ডাবুটা আবার একটু-আধটু গানও গাইতে পারত। বউদি এবং

সাধারণ মেয়ে মহলে এ একটা কোয়ালিফিকেশন। হারমোনিয়াম বাজিয়ে ডাবু গান গাইছে আর মেয়েরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, হেমাঙ্গর চোখে এই দৃশ্যটা স্পষ্ট ভাসে। সে ভাবত, কেন সে গান গাইতে পারে না?

জীবনে কিছু কিছু ছোটখাটো ব্যাপারে ব্যর্থতা তো থাকেই মানুষের। সেজন্য প্রচুর দুঃখও জোটে। এটা ডাবু টের পাইয়ে দিয়েছিল হেমাঙ্গকে। তাই বলে ডাবুকে সে ঈর্ষা করত না। করতে পারেনি কোনদিনও। আজও না। এই যে এতক্ষণ ধরে ডাবু শোনাল নিজের নানান্ কৃতিত্বের কথা, হেমাঙ্গ খুব মন দিয়ে শুনল, এবং নিজের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে খুব ব্যর্থ মানুষ বলে গণ্যও করল, তবু কত ভাল লাগল শুনে।

কৃতিত্ব নিশ্চয়। ডাবু চাকরি ছেড়ে কিছুদিন এক বড় কণ্ট্রাক্টার কোম্পানির অধীনে সাব-কণ্ট্রাক্টারি করেছে। (হেমাঙ্গ জানত, ডাবু বরাবর চাকরিই করছে)। ভাল কামিয়ে নিয়েছে। নানান্ জায়গার বড়লোক ফ্যামিলি ওকে মেয়ে অফার করতে সেধেছে। ডাবু ভেবে কিছু ঠিক করেনি। বাবা-মা খানিকটা চাপ দিচ্ছেন বৈকি। বুড়োবুড়ী হয়ে গেছেন এবং ডাবুর একটি সুন্দরী বৌ দেখে যেতে চান। ডাবু বলেছে শীগগির শেট্‌ল করে ফেলবে। আপাতত হঠাৎ মোহনপুর আসার কারণ স্বাধীনভাবে এখানে কণ্ট্রাক্টরির সুযোগ কতটা, তা এ্যাসেস করা। হেমাঙ্গর কি মনে হয়? আছে তেমন স্কোপ?

হেমাঙ্গ জানে, এটা ডাবুর নিছক প্রশ্ন তাকে। ডাবুর মত স্মার্ট চালাক চতুর যুবক ভালই বোঝে, বৈষয়িক ব্যাপারে হেমাঙ্গ ছাগলেরও অধম। হেমাঙ্গ বলল, আমায় জিগ্যেস করছিস! সেই শ্লোকটা জানিস তো, অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে…? আমি যথার্থ ছাগল। শিঙ তুলে….

ডাবু হেসে শুধরে দিল, খাসি বল? ছাগলের শিঙ থাকে না।

ওই হল। আমিও তো এ যাবৎ অসংখ্যবার পাঁয়তাড়া করে

বেড়ালুম। আসলে ও ধরণের ব্রেণই আমার নেই। তোর আছে।

ডাবু স্বীকার করে নিল।—তা আছে কিছুটা। ভাবতে পারিস, তিন দিদির বিয়ে আমিই দিয়েছি? জাস্ট এক বছরের মধ্যে।

ডাবুর দিদিদের দেখেছে হেমাঙ্গ। তবে স্পষ্ট মনে পড়ে না। বলল, তোর তো ভাই-টাই নেই?

ডাবু খিক খিক করে হাসল। বুকে টোকা মেরে বলল, ওনলি ওয়ান। তুইও তো তাই!

হুঁ। তবে ভাগ্যিস আমার দিদি বোন-টোন নেই। থাকলে কী বিপদে না পড়তুম!

ডাবু গলা চেপে বাড়ির ভেতর দিকটায় চোখের ইশারা করে বলল, ঘরে যখের ধন বাঁধা ইয়ার। কিছু ভাবনা ছিল না। হ্যাঁ রে, মুনাপিসি আমার গলা শুনে এলো না কেন বল তো! ঝগড়া করেছিস নাকি?

ভাগ! তুই এলি, মুনাপিসিও খিড়কির দরজায় বেরুল। মনে হচ্ছে কলোনী-পাড়ায় গেল রান্নার মাল যোগাড় করতে। কিংবা বাজারে।

কেন? তুই এত লাটসাহেব যে বৃদ্ধা মহিলাকে বাজার করতে হয়? হেমা, এবার একটু গা ঘামা তো বাবা। বয়স তো কম হল না। মানবজীবন আবাদ করে সোনা-টোনা কবে আর ফলাবি?

হেমাঙ্গ হো হো করে হেসে উঠল।—তুই পেরেছিস ফলাতে। আমার জমিটাই বাঁজা।

কপট গাম্ভীর্যে ডাবু চোখে একটা ভঙ্গী ফুটিয়ে বলল, না—ভুল বলছি। ফলিয়েছ বটে। একটা চালকুমড়ো!

তার মানে?

মানে আবার কি? অমি।

যাঃ! হেমাঙ্গর কানের পাশটা লাল হয়ে গেল।

ডাবুর এই উক্তি অপ্রত্যাশিত। অমির প্রসঙ্গে এ ধরণের ব্যাপার নিয়ে—তা যত সামান্য হোক, ডাবু কোনদিন তার সঙ্গে ঠিক এভাবে আলোচনা করেনি। অমির নায়িকা-অস্তিত্বই যেন ডাবুর কাছে

ছিল না। হঠাৎ এভাবে অমির কথা কেন বলে বসল? হেমাঙ্গ অবাক হয়। ব্যস্ত হয়ে সিগারেট খুঁজতে থাকে।

ডাবু পাঞ্জাবির পকেট থেকে কিং সাইজের দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলে, খা।

উঠে বোস। তুই যে দেখছি রাজা হয়ে গেছিস ডাবু!

না। এ মাল নিজের জন্যে নয়, পরার্থে। তবে তোমার মতো ক্ষুদে কাপ্তেনের জন্যে নিশ্চয় নয়। বিগ-বিগ ভদ্রলোকের জন্যে। বুঝলে? আমি সেই চারমিনারেই পড়ে আছি।

তাহলে দিচ্ছিস যে?

ডাবু ফিসফিস করে চোখে ঝিলিক তুলে বলে, একটা ব্যাপারে তুই আমাকে মেরে বেরিয়ে গেছিস, ভাই!

কিসে রে?

নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাবু জানলার বাইরে যেন আকাশ দেখতে দেখতে বলে, তুই লালুর বোনের সঙ্গে প্রেম করতে পেরেছিস। আমি পারিনি।

হেমাঙ্গ ধাঁধায় পড়ে যায়। অমির সঙ্গে প্রেম! ডাবু তো ওদের বাড়িরই আত্মীয় এবং কী সম্পর্কে অমিদের ভাইও যেন। তাছাড়া ডাবু অমির সঙ্গে প্রেম করতে চেষ্টা করেছিল, এ খবর হেমাঙ্গর কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, বলিস কি! অমি তোর কি রকম বোন হয় যেন?

তাতে কি? ডাবু কৌতুকের ভঙ্গীতে বলে।

ভাগ! বড্ড বেহায়া হয়ে গেছিস তুই! যত রাজ্যের খোট্টাদের সঙ্গে মিশে একেবারে গেছিস।

ডাবু মিটিমিটি হাসে। ওর চোখ দুটো এ সময় ভারি সুন্দর দেখায়। বলে, যদি রিলেশনের কথাই তুলিস, অমিদের সঙ্গে আমাদের কোন রকম ব্লাড কানেকশান নেই। মাসির পিসির পায়ের ঘায়ের ছেলের ডাক্তার না কি যেন বলে, সেই রকম।

অমির ঠাকুর্দা আর আমার ঠাকুর্দা দুজনেই পাটনায় রেলের কোয়ার্টারে পাশাপাশি থাকতেন। রিটায়ার করার কিছু আগে অমির ঠাকুর্দা মোহনপুরে বদলি হয়ে এসেছিলেন। রিটায়ার করার পর এখানেই জমিজায়গা কিনে বাড়ি করলেন। জায়গাটা পছন্দ হয়েছিল। আর আমার ঠাকুর্দা বদলি হয়েছিলেন জামসেদপুরে। সেখানে বাবা রেলে না ঢুকে টাটা কোম্পানির টেলকোতে অ্যাপ্রেন্টিস হলেন। বুড়ো ছেলের এই ব্যাপার-স্যাপার দেখে বিগড়ে গেলেন। মোহনপুরের বুড়ো ততদিনে তাঁকে এখানে এসে বাস করার জন্যে প্ররোচিত করে আসছেন। ব্যস! ঠাকুর্দা সত্যি একদিন মোহনপুরে একটা পুরনো বাড়ি কিনে বসলেন।

হেমাঙ্গ বলে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। জানতুম না তো! বল্!

ডাবু সিগারেট ধরায় এবং হেমাঙ্গরটা জ্বেলে দিয়ে বলে, কিন্তু পিছনে কবে যম এসে ওয়েট করছে ঠাকুর্দা টের পাননি। বাড়ি কেনার মাস তিনেকের মধ্যে অক্কা! বোঝ ব্যাপার।

তারপর? হেমাঙ্গ আগ্রহে প্রশ্ন করে।

বাবা শেষ পর্যন্ত ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মোহনপুরে। আমি তখন হাঁটি হাঁটি পা পা। যাই হোক, ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর বছর চার পাঁচ থাকল বাড়িটা। আমরা, অর্থাৎ তিন দিদি—এক ভাই মায়ের সঙ্গে এখানে থাকি। বাবা ছুটি-ছাটায় আসেন। কিন্তু দু' জায়গায় আর কাঁহাতক টানাটানি করা যায়। শেষ পর্যন্ত বাবা আমাদের জামসেদপুরে তুললেন। ভাল কোয়ার্টার পেয়েছিলেন ততদিনে। তার পরেও বছর পাঁচ-সাত এখানকার বাড়িটা ছিল। লালুর জ্যাঠামশাই দেখাশোনা করতেন। ভাড়া দেওয়া হয়েছিল এক মারোয়াড়িকে। তারপর বাবা ওকেই বেচে দিলেন শেষ পর্যন্ত। অ্যাণ্ড দিস ইজ দা হিস্ট্রি।

…ডাবু সিগারেটে একটা জোর টান মারে। তারপর প্রচুর ধুঁয়ো ছাড়তে ছাড়তে এবং রিঙ তৈরির ব্যর্থ চেষ্টা করে ফের বলে,

তাহলে বুঝতেই পারছ, অমির সঙ্গে প্রেম করতে মর‍্যাল কোন বাধা ছিল না। অ্যাণ্ড আই ভেরি ম্যচ ট্রায়েড!

প্রেম হল না কেন? হেমাঙ্গ হাসে একটু।

তুই শালার জন্যে! বলে ডাবু আবার প্রচণ্ড জোরে হেসে ওঠে। তারপর একটু ঝুঁকে এসে ফের বলে, নো, নেভার। তার জন্যে তোর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা বা রাগ-টাগ হচ্ছে না। কারণ আমি এতকাল টেরই পায়নি যে তোরা তলে তলে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস। এবার এসেই সব জানতে পারলুম।

কি জানলি, শুনি? হেমাঙ্গ একটু ক্ষোভের ভঙ্গীতে বলে কথাটা।

ডাবু গ্রাহ্য করে না। নির্বিকার বলে, কিছুটা আবছা ওদের বাড়িতেও বটে, কিছুটা বাইরের নানা সূত্রেও বটে, জানলুম যে অমির সঙ্গে তোর একটা জব্বর এ্যাফেয়ার চলছিল। ওদের ফ্যামিলি থেকে নাকি তোকে ইনসিস্ট করা হয়েছিল বিয়ে করে ফেলতে। তুই অমনি কেটে পড়েছিস। তারপর নাকি অমির মন ভেঙে যায় এবং আলটিমেট্‌লি এই ভূতের ব্যাপার। গভীর দুঃখ-টুঃখ পেলে নাকি মেয়েদের কোমল আত্মা দুর্বল হয়ে যায়। তখন প্রেতাত্মাদের পোয়াবারো মাইরি! জাস্ট এমনি একটা এ্যানালিসিস শুনলাম।

কোথায় শুনলি? কার কাছে?

হাত তুলে ডাবু বলে, চ্যাঁচাসনে বাবা! সব কিছু এত সিরিয়াসলি নিচ্ছিস কেন?

না। কে বলল ও সব কথা?

ডাবু হাসতে হাসতে বলে, আবার কে? অমির বিজ্ঞ জেঠিমা। তো আমি বললুম আচ্ছা জেঠিমা, তা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু সব থাকতে মুসহর বস্তীর বহরী বুড়ির মেয়েটা কেন ওকে ধরল বলুন তো? জেঠিমা বলল, আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, বেহায়া অমি চূড়ান্ত বেহায়াপনা করে গতকাল নাকি তোর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছিল।...

হেমাঙ্গ বাধা দিয়ে বলে, মিথ্যে। অমির সঙ্গে আমার একমাস দেখা হয়নি।

শোন না। তারপর তুই নাকি ওকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছিস। তখন অমি সুইসাইড করতে যায় ডিস্টাণ্ট সিগন্যালের কাছে। যেই যাওয়া, ব্যস। সৈকা না ফৈকার ভূত ওকে বাগে পেয়ে যায়। কেমন এ্যানালিসিস?

হেমাঙ্গ গম্ভীর হয়ে বলে, সবটাই বানানো। তবে একটা ব্যাপার কিন্তু সত্যি। অমি গতকাল সন্ধ্যায় বা তার আগে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। ঝেণ্টু নামে মুসহর ছেলেটা আছে—সে ওদের বস্তীতে শুনে ডনকে বলেছে। ডন কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলল।

ডাবু ওর একটা হাত চেপে ধরে বলল, তাহলে বাকিটাও সত্যি!

অসম্ভব। আমি মোহনপুরে ছিলুমই না ক'দিন। কলকাতায় ছিলুম। গত রাতে ফিরেছি।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। তুই অমিকে জিগ্যেস করলিনে কেন?

করলুম তো। উড়িয়ে দিল। মানে আমলই দিল না।…বলে ডন উঠে কয়েক পা পায়চারি করার পর ফের বলে, কলকাতা কেন রে?

পি এস সি-র একটা পরীক্ষা ছিল। সেক্রেটারিয়েট ক্লার্কশিপ।

ডাবু চেঁচিয়ে ওঠে, তুই কেরাণী হবি? তুই কি পাগল, না কি! তোর মত জুয়েল ছেলে! হেমা, মারব বলছি। মাইরি মেরে দেব। আমার খুব রাগ হচ্ছে।

হেমাঙ্গ হাসবার চেষ্টা করে। কিন্তু মুখটা শুকনো। বলে, তাছাড়া আর করবটা কি, বল? পরের ঘাড় ভেঙে আর কতকাল খাব? হিউমিলিয়েশন না? কী যে বিচ্ছিরি লাগে!

ডাবু এগিয়ে এসে ওর চোখে চোখ রেখে বলে, শোন। আমি এখানে এসে কণ্ট্রাক্টারি করব ভাবুছি। আফটার অল আমি আউটসাইডার।…

হেমাঙ্গ বাধা দিয়ে বলে মোহনপুরে প্রায় সবাই আউটসাইডার।

না। যা বলছি শোন। তুই লোকাল ম্যান। তোর মোটামুটি সুনাম আছে। অমির ব্যাপারে স্ক্যাণ্ডাল একটু রটেছে বা রটতে পারে। আসলে ওটা কি জানিস, এক ধরণের ব্ল্যাকমেলিং ওদের। ডনের জ্যাঠামশাই ভেবেছে, বামুনের ছেলের কাঁধে ভাইঝিটাকে চাপিয়ে দেওয়া যাক্। বিনি পয়সায় পার পাওয়া যাবে। তাছাড়া একটা কথা, ওরে ভাই, জাত-ফাতের নানান্ কমপ্লেক্স শালা মানুষের হাড়ে হাড়ে আছে, বুঝলি তো? এ জিনিস যাবার নয়।

তুই বিহারে থাকিস কি না? জাত-ফাতের ব্যাপারটা তাই তোর মাথায় ঢুকে গেছে।

শাট আপ! যা বলছি শোন্। লক্ষ্মী ছেলের মত শুনে যা।

বেশ, বল।

ওরে বাবা, আমিও তো কায়েত বাচ্চা। আমার বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখ। এবার আমি ক'দিন থাকছি। জাস্ট প্রিলিমিনারি সার্ভে এবং নানান্ জায়গায় কনট্যাক্টগুলো করে ফিরে যাব। তারপর আসছি সামনের মাসে, দ্যাট ইজ, ধর বাই দা থার্ড উইক অফ এপ্রিল। কেমন? ইতিমধ্যে তোকে কিছু কনট্যাক্টের দায়িত্ব দিয়ে যাব, অন মাই বিহাফ। তুই রেগুলার যোগাযোগ করবি চিঠিতে, কিংবা জরুরী বুঝলে বাই টেলিগ্রাম। এমন কি ট্রাঙ্ক-কলও করতে পারিস। এখানে তো দেখলুম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চালু হয়ে গেছে।

হয়েছে।

ডাবু খাটে বসে বলে, কাগজ বের কর। নোট করে নে।

হেমাঙ্গ এখনও ভাবছে, এটা নিছক একটা খেলা। সেই ভঙ্গীতেই সে কাগজ হাতড়ায়।

মুনাপিসির গলা শোনা গেল বাইরে।—ডাবু এসেছে শুনলুম! কই সে ছোঁড়া? পরশু এসে যে বলে গেল, পিসিমা তোমার সঙ্গে ছানার ডালনা দিয়ে ভাত খাব···

ভেতরের উঠোন থেকে মুনাপিসি কথা বলতে বলতে হাতের মুঠো পাকিয়ে ঘরে ঢুকলো।—কই সে বাঁদর? মারব? মারব মাথায় এক গাঁট্টা?

বলে ডাবুর রাশিকৃত চুলে হাতের মুঠোটা ঘষেও দিল। ডাবু মাথায় হাত দিয়ে বলে, উহুহু! খুব লেগেছে, খুব লেগেছে! তারপর জিভ কেটে হাত জোড় করে ঘোরে।

মুনাপিসির হাতে একটা থলে। থলেটা তুলে মারার ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে বলে, আমার অতটা ছানা নষ্ট করেছ। তোমাকে খুন করে ফেলব। প্রমথবাবুরা না হয় বড়লোক। আমরা গরীব। তাই বলে এত হেনস্তা!

ডাবু খপ করে থলেটা ধরে ফেলে। বলে, কি আনলে দেখি না পিসিমা!

দেখাব। বল্, এ বেলা খাবি নাকি?

তা আর বলতে? ডাবু হেমাঙ্গর বুকে আঙুলের খোঁচা মেরে বলে, এই হেমার মত আমার একটা মুনাপিসি থাকলে উঃ! আজ আমি কি যে হতুম!

খুব হয়েছে। বলে মুনাপিসি ভেতরে যায়। যেতে যেতে বলে, হেমা, জিতেন গয়লা এখনও দুধটা দিয়ে গেল না রে! আজও আবার নষ্ট বলবে নাকি। আর পারা যায় না বাবা। মোহনপুরে দুধের অমিল হবে কে ভাবতে পেরেছিল।

ডাবু বলে, সে কি! দুধ পাওয়া যাচ্ছে না?

ভেতরের বারান্দা থেকে মুনাপিসি বলে, যাবে কেমন করে? সব দুধ তো ড্রাম ভর্তি করে চালান দিচ্ছে। অল্প স্বল্প যেটুকু রাখে, জল মিশিয়ে ডবল দরে এখানে বেচে। সবাই কলকাতা চিনে ফেলেছে যে।

ডাবু হেমাঙ্গকে বলে, এ্যাদ্দিন তুই একটা ডেয়ারি করলে পারতিস। কিংবা ধর, ওদের মত দুধ কিনে কলকাতা চালান দিতিস। কত পুঁজি লাগে?

হেমাঙ্গ বলে, বাপস! ঘোষ কোম্পানি থাকতে?

সে আবার কে ?

তুই চিনবি। সেই যে রাইট ব্যাকে খেলত গয়লাদের ছেলেটা। মনে পড়ে ?

পোদো ?

এখন পোদো নয়, প্রদ্যোৎ কুমার ঘোষ। ঘোষ কোম্পানির মালিক। জিপ কিনেছে।

চিন্তান্বিত গম্ভীর ডাবু বলে, মোহনপুরের প্রচুর উন্নতি হয়েছে রে! নানান্ ব্যাপারে প্রসপেক্ট আছে।

হেমাঙ্গ বুঝতে পারে, ডাবু একটা কিছু করতেই এসেছে এবার। এবং পারবেও। ডাবু একটু বেশি কথা বলে, তা ঠিক। কিন্তু ওর মধ্যে একটা শক্তি আছে, মানুষকে প্রভাবিত করার শক্তি। অবস্থা বোঝার এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছবার শক্তি। এ সব হেমাঙ্গর নেই।

মুনাপিসি ভেতর থেকে বলে, ডাব ! ভেতরে আমার কাছে আয়। গল্প করি। হেমা একবার দেখে আসুক জিতেনকে। হেমা, যাচ্ছিস তো ?

যাচ্ছি। বলে হেমাঙ্গ ওঠে।—ডাবু, তাহলে পিসিমার কাছে যা। আমি এখুনি আসছি।···

হেমাঙ্গ সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিল। পথেই জিতেনের সঙ্গে দেখা। একগাল হেসে জানায়, একটু দেরী হয়ে গেল বাবু। ভোরবেলা গিয়েছিলুম সেই চাঁদপাড়া-হাঁড়িভাঙা মেয়েকে দেখতে। অসুখ হয়েছে। ফিরতে ফিরতে লোকাল পাস করে গেল। তারপর দুধ দুইয়ে দৌড়ে আসছি।

হেমাঙ্গ সিগারেট কিনতে লিচুতলা বাজারে ঢুকল। এটাই সাবেকী বাজার। বড় পোলের এপারে টাউনশিপের মাঝখানটিতে। হাটও বসে এখানে। তবে স্টেশন বাজারের মত ঠাসা ভিড় নেই।

সিগারেট কিনে একটা ধরিয়ে নিয়ে, ইচ্ছে করেই সে অমিদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবে ঠিক করল।

প্রচুর গাছপালার মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাড়ি এখানটায়। বেশ নির্জন ও শান্ত। এই বাড়িগুলোর বেশির ভাগই প্রাক্তন রেল অফিসারদের কিংবা যাঁদের বলা হয় রেলকর্মী, তাঁদেরও। রিটায়ার করার পর ওঁরা এখানে জায়গা কিনে বাড়ি করেছেন। মোহনপুরের কী একটা টানের ব্যাপার আছে। যে আসে, তারই ভাল লেগে যায়। আর নড়ার নাম করে না।

আস্তে আস্তে প্যাডেল ঠেলছিল হেমাঙ্গ। আকাশ কখন হাল্কা মেঘে ঢেকে ফেলেছে। বৃষ্টিমেঘ নয়। চৈত্রের ভীতু নিরীহ কোমল সেই মেঘ, মেষপালের মত। চৈত্রের এই মেঘলা আকাশ ভালই লাগে। বড় নিরুপদ্রব এবং রোদ থাকে না বলে। হাওয়া দিচ্ছে জোরালো। বাঁদিকে মোড় নিলে খাল বা সেই ক্যানেল। ওখানে বন নিমবন আছে। হেমাঙ্গর মনে পড়তেই নাক তুলে শোঁকে। নিমফুলের গন্ধ কী মিষ্টি। ছেলেবেলায় এমন মেঘলা দিনে ফুল ও নিমডাল ভেঙে পুজোপুজো খেলত ছেলেমেয়েরা। মুখে ঢাক বাজাত এবং ডালটা ঢাকের কেশর ভেবে দোলাত। হেমাঙ্গ তখন ঠিক বাচ্চা নয়, পুরোদস্তুর কিশোর। পায়ে নতুন বুট। বাবা দিয়ে গেছেন। অমি বলত, এই! তুমি জুতো পরে খেলছ কেন ভাই? খোল।...বলে ফ্রক পরা অমি নিঃসঙ্কোচে সামনে বসে তার জুতো খুলে দিত। ফিতে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে বলত, এসো, এবার খেলি! অমির সাদা ধবধবে সরু আঙুলগুলো চোখে ভাসছে।

হেমাঙ্গ অন্যমনস্ক হয়েছে। কখন অমিদের বাড়ি পেরিয়েছে, খেয়াল নেই। যখন টের পায়, সাইকেল থামিয়ে ঘাড় ঘোরায়। এবং দেখতে পায়, অমি দোতলার জানালা থেকে সরে গেল এইমাত্র।

একটু আগে কেন হেমাঙ্গ তাকায়নি? সাহসের অভাব! নিজের ওপর ক্ষোভে দুঃখে অস্থির হয় সে।...

॥ তিন ॥

ডনের জ্যাঠা প্রথম মোহনপুর ব্লক আপিসের ওভারশিয়ার ছিলেন। বছর তিনেক আগে রিটায়ার করেছেন। ওভারশিয়ার থাকার, বিশেষ করে পাঁচশালা যোজনার যুগে এবং ব্লক আপিসে, অনেক সুযোগ সুবিধে। বুদ্ধিমান যিনি, তিনি সেগুলো সোনার হাঁস করে ফেলতে পারেন যাদুকাঠির ছোঁয়ায়। প্রথম বোস পারেননি। তাঁর না পারার কারণ ধর্ম বা বিবেকবোধ নয়, অল্পে সুখ। একডজন মুরগির ডিম দিয়েই হাবুল মিয়া ঠিকেদার কত সাঁকো কিংবা ইরিগেশন স্লুইস তৈরির কমপ্লিশন সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়েছেন। প্রমথের মতে, এ কি লাখ লাখ টাকার প্রজেক্ট যে হাজার হাজার টাকা ফাঁকাবে হাবুল? বড় জোর দু-চারশোর এদিক ওদিক। আহা, ওটুকু যদি না করবে, তবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লম্ফঝম্ফের কারণ কি? হাবুলের চেহারার হাল দেখলেই বোঝা যায়।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল জানে প্রমথবাবুর মতটা ভুলে ভরা। হাবুল মিয়ার চারখানা ট্রাক, তিন রুটে তিনখানা বাস, একখানা পেট্রোল পাম্প ও গ্যারেজ এবং দোতলা প্রাসাদ বানিয়েছেন। এক ছেলে রাজনীতির পাণ্ডা, এক ছেলে ডাক্তারি পড়ে, এক ছেলে সদর কোর্টের জুনিয়ার উকিল, এর ওপর প্রচুর ধানী জমির তিনি জোতদার। স্বাধীনতার এই পঁচিশ বছরে এমন কীর্তি।

যাই হোক, প্রমথর ওই অল্পে সুখী হওয়ার মনোভাবই তার চরিত্রের মাপকাঠি। তার ফলে ভীরুতা আজন্ম তাঁর পিছনে ঘোরে। পৈতৃক একতলার মাথায় ভাইপো ডন, যাকে এখনও চোখ বুজে ন্যাংটা দেখতে পান, যখন দোতলা তোলার প্ল্যান নিয়েছিল, প্রমথবাবু কেঁপে সারা। তাঁর স্ত্রী সুলোচনা উল্টো প্রকৃতির

মহিলা। ডনের একান্ত সমঝদার। বরং দেওরের এই দুর্ধর্ষ পুত্রটি নাকি তাঁর লাই পেয়েই বখে গিয়েছিল।

কিন্তু বখে যাওয়ার মানে যদি একতলাকে দোতলা করার মর্মার্থ হয় এবং একে ওকে তাকে হুট করতেই পেটানোর ক্ষমতা হয়, সুলোচনা তা পুরুষত্বের ও বীর্যবত্তার প্রতীক বলে মাথায় ঠেকাতে রাজী। প্রমথ সব সময় 'এই এলো পুলিস—বাড়িসুদ্ধ ঠেঙাল' বলে চুপি চুপি স্ত্রীকে শাসালে এইসা ধমক খেতেন যে লেজ তুলে পালাতে হত। বিশেষ করে ভাইপো ডনকে যমের মত ভয় পান।

তবে শেষ অব্দি ডন দিব্যি মাথা বাঁচিয়ে চলেছে, পুলিস বোস-বাড়ির আনাচে-কানাচে কখনও আসেনি, এর ফলে প্রথম দোতালার প্ল্যান এষ্টিমেট নিজেই তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং নিজের ওভারশিয়ারী বিদ্যেবুদ্ধি প্রয়োগ করেছিলেন। প্রসাদজীর ইটখোলার ইট, চৌধুরী হার্ডওয়্যার স্টোর্সের লোহা লক্কড় সিমেণ্ট প্রমথ নিজে এনেছিলেন। সবাইকে শুনিয়ে বলতেন, টুলুর মা এ্যদ্দিনে বাপের পয়সাকড়ির হিস্যেটুকু পেল। তো কি আর করা। বরাবর দোতলার সাধ। মানে ছেলেবেলা থেকে ওপরতলায় মানুষ হয়েছে কি না।

কথাটা মিথ্যে না। সুলোচনার বাবা ছিলেন কলকাতার এক সওদাগরী কোম্পানির কর্মচারী। ভাল মাইনেকড়ি পেতেন। থাকতেন পাঁচতলার ফ্ল্যাটে। এই দূর মফস্বলে একতলায় আর গাছ-তলার মধ্যে সুলোচনার দম নাকি আটকে যেত প্রথম প্রথম। এখানকার শাকসব্জী আর ফুল ফলের বাগানে সুলোচনারই সাধ এবং হাতের ছাপ আছে। এর মধ্যে সুলোচনার চরিত্রের পরিচয় মিলবে। পরিবেশকে ইচ্ছেমত বদলে নিয়ে সুসহ করার ক্ষমতা ওঁর আছে। তাছাড়া তিনি ভূত ও ভগবানে গভীর ভাবে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস তাঁকে মনোবল, সাহস এবং পাপ খণ্ডনের পুণ্য যুগিয়েছে। ডনের টাকাকড়িকে তিনি লীলাময় ভগবানেরই দান বলে মনে করেন। নিজের এই লীলাবাদী ভগবান সংক্রান্ত ফিলজফির প্রচার করেন রাবণ ও কংসরাজার গল্পচ্ছলে।

সে রাতে আচমকা অমির ওই নাটুকে অসুস্থতা অর্থাৎ ভূতুড়ে ব্যাপার নিয়ে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে পুরনো চাপা পড়ে যাওয়া মতান্তর আবার চাগিয়ে উঠেছে।

প্রমথর মতে, অমির হিষ্টিরিয়া হয়েছে। সুলোচনার মতে, অমিকে বুধনী বহুরীর ছাগলচরানী ও অপঘাতে নিহত মেয়েটার আত্মা এসে ধরেছে।

দু'জনের পুত্রকন্যার সংখ্যা পাঁচ। চার মেয়ে এক ছেলে। বলার দরকার ছিল না যে ছেলেই বয়সে ছোট। বড় মেয়ে টুলু অমিরও দু'বছরের বড়। তার প্রায় পঁচিশ এখন। বিয়ে হয়েছিল বহরমপুরে। তিন বছর আগে বিধবা হয়ে ফিরেছে। ভাগ্যিস ছেলেপুলে হয়নি। মেজ বুলুর বিয়ে হয়েছে নলহাটিতে। জামাই রেলের অফিসার। কোয়ার্টারে থাকে। সেজ মিলু কলেজে পড়ছে এখানেই। পরের বোন ইলু স্কুলের ছাত্রী। ছোটর বয়েস এখন বছর সাতেক। ঢাকের মত মাথা, ধড়টা কাঠির মত। ডন তাই ঢাকু বলে ডাকে। বাবা মা ডাকেন জন বা জনি বলে। ডনের সঙ্গে মিলিয়েই যেন বা। ওইটুকু ছেলে এখনই মহা বিচ্ছু। বাগান ঢুঁড়ে কাঠিতে নোংরা নিয়ে এসে পাতে গুঁজে দেবে। তাই খেতে বসলে নজর রাখতে হয়।

ডাবু এসে বরাবর এ বাড়ির আরেক ছেলে হয়ে ওঠে। বোঝার উপায় নেই যে এদের সঙ্গে তার কোন রক্তের সম্পর্ক এতটুকু নেই। প্রমথ সুলোচনা ধরে নিয়েছেন ডাবু ওঁদের সেজ জামাই হবে। ডাবুর বাবা মায়ের সঙ্গে কবে থেকে বলা কওয়া আছে। ওঁরা রাজী হয়ে বসে আছেন। অপেক্ষা শুধু ডাবুর।

আর একটু অপেক্ষা মিলুর ফাইনাল পরীক্ষার। জামাই গ্রাজুয়েট। মেয়েরও গ্রাজুয়েট হওয়া ভাল না কি?

ডাবু বরাবর এসে বাড়ি জমিয়ে রাখে। বাড়ি নিজে থেকে জমে ওঠার জন্যে তৈরিও বটে। এবার ডাবু এসে যতটা জমিয়ে দিয়েছিল, অমির ভূত তাকে তুঙ্গে তুলে দিয়েছে। অন্য রকম অসুখ বিসুখ হলে

স্বভাবত সংসার ম্রিয়মান করে ফেলে। ভূতে ধরার বেলায় অন্যরকম; তাতে ডাবু এখন উপস্থিত।

এই অবস্থার সঙ্গে প্রমথ ও সুলোচনার জোর তর্কাতর্কি জমে উঠেছে। দিন পাঁচেক হল মেজ বুলুও সপুত্র এসে গেছে বাপের বাড়ি। জামাই আসব আসব হয়ে আছে। এসে নিয়ে যাবে ওদের।

কাজেই বাড়ি ভর্তি লোকজন। হইহল্লা ছু'বেলা। টুলুর গান বাজনার চর্চা আছে। তার ঘরে হারমোনিয়াম, তানপুরা, ডুগিতবলা আছে। অমির ভূতে পাওয়ার রাতে দশটা অব্দি তুমুল গান বাজনা হয়েছিল। অমিও একখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিল। ওর গলাটা একটু চাপা, ঈষৎ চিড় খাওয়া, কেমন ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতা এনে দেয়। 'যে রাতে মোর ছুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে' শুনে ডাবু অনবদ্য ভঙ্গীতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, ভাঙুক না! জ্যাঠামশাই আছেন, ভেবো না!

শুনে সবাই এত জোরে হেসে উঠল যে পাশের ঘরে বুলুর ছেলের ঘুম ভেঙে সে কি বিকট কান্না! তা নিয়েও খানিক রসিকতা হল ডাবুর।

এর পরে মধ্যরাতে অমির একক আসর। মুসহরবুলিতে তার ডিলিরিয়াম চলেছে অনর্গল, আর ডাবু প্রথম হকচকানি সামলে নিয়ে চাপা রসিকতার ফোড়ন দিচ্ছে। ডনের মত গম্ভীর ছেলেও হেসে ফেলছে। প্রমথর উদ্বিগ্ন গলার ধমকেও কাজ হচ্ছে না। সুলোচনাও নিজের ভূতবিশ্বাস থেকে আস্কারা দিয়ে বলেছেন, হাসুক, সবাই হাসুক! হারামদাজী অজাত কুজাত ছোটলোকের মেয়ের সাহস! ভদ্রলোকের বাড়ি এসে গলাবাজি করছে! এর পর চাবকাব না?

পরে অবিনাশ ডাক্তার এসে বলেছিলেন, না বোসদা, দিস ইজ দি রাইট কোর্স অফ এ্যাকশন। হিষ্টিরিয়ার সময় কক্ষনো ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্রয় দিতে নেই হাসি-তামাশা করে উড়িয়ে দিতে হয়,

যেন ও কিছু না। প্রশ্রয় পেলে আর ছাড়তে চাইবে না। জাস্ট নেগলেক্ট দি পেস্তান্ট।

কিন্তু মনে মনে ভয় পায়নি, এমন কেউ নেই এ বাড়িতে।

পরের দিন ভোরবেলা থেকে সুলোচনার তৎপরতা দেখার মত। প্রমথর সঙ্গে তর্কাতর্কির ফাঁকে হাড়িভাঙা নামক একটি গ্রামে লোক পাঠিয়েছেন। ওখানে এক ভূতের ওঝা আছে। তার নাম পরিমল হাড়ি অর্থাৎ হাড়ি বংশজাত পরিমল।

আর পাঠিয়েছেন তুলেপাড়ার পল্টু নামে ভৃত্যকে জটাবাবা নামে এক পীরের থানে। সে সেই লোকোশেডের ওদিকে একটা জঙ্গলে জায়গা। মাদুলি ও জলপড়া আনবে কাসেম ফকিরের কাছ থেকে। এই ফকির পীরস্থানের সেবায়েত। শিশিতে ভূত পুরে উদ্ধারণপুরের ভাগীরথীতে ফেলে আসে সে।

তারপর নিজে গেছেন সুলোচনা ধর্মরাজের মন্দিরে এবং সেখান থেকে সেই শ্মশান বটতলায় শংকরা সাধুর কাছে।

ওই শ্মশানের ধারে খাল চলেছে রেললাইনের সমান্তরালে। তার ঘুরে রেল পেরিয়ে মাঠে নেমেছে। এ আসলে ইরিগেশান ক্যানাল। এতে তাঁর স্বামীরও হাতের স্পর্শ আছে। খালের কাছে এলে সে কথাটা মনে পড়ে যায় এবং চুপিচুপি গর্ব জেগে ওঠে বইকি।

কিন্তু শংকরা ওঁকে দেখে চোখ পাকিয়ে বলেছিল যা, যা! এখন আমি মড়া পোড়াব না।

সুলোচনা হেসে বলেছিলেন, না রে বাবা, না। তোকে মড়া পোড়াতে বলিনি। ও বেলা একমুঠো খেয়ে আসিস। নেমন্তন্ন করতে এসেছি। বুঝলি?

শংকরা জটা দুলিয়ে হেসে বলেছে, যাব। মাছের মুড়ো খাব। পাঁঠার মুড়ো খাব। সব একসঙ্গে খাব। দেবে তো?

তাই দেব বাবা! যাস্ কিন্তু!

তা আর বলতে? শংকরা খায় না তো খায় না, অনেক সময়

দেখা যায় শুকনো মাটি কড়মড় করে চিবুচ্ছে। আবার কেউ খেতে ডাকলে দু'হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচে।

এ শ্মশান কিন্তু মুসহরদের। মাইল পাঁচেক দূরে ভাগীরথী বলে মোহনপুরের সব লাশ সেদিকেই যায়। মুসহররা এক সময় অন্য ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। গঙ্গা ভাগীরথী বুঝত না। তাই বটতলাতেই মড়া নিয়ে যেত। প্রথম প্রথম পুঁতে ফেলত। তারপর লোকের আপত্তিতে কাঠ-কুটো কুড়িয়ে পোড়াতে শুরু করেছিল। তারপর দিনে দিনে ওরা প্রায় হিন্দু হয়ে যাচ্ছে। সামর্থে কুলোলে ভাগীরথীতে নিয়ে যাচ্ছে মড়া। না পারলে অগত্যা এই শ্মশান তো আছেই। বুধনী বহরীর মেয়ে সৈকা এ শ্মশানেই পুড়েছিল। ভাল পোড়েনি। আধপোড়া কিছু হাড়-মাংস কুকুরেরা ছড়িয়ে দিয়েছিল এখানে ওখানে। রেললাইনে নিয়ে গিয়েছিল এক টুকরো পা, খাল পেরিয়ে। পরে সেটুকু বুধনী বহরী কুড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শ্মশানে পুঁতে আসে। তা নিয়ে গুজব ছড়ায়। শংকরা নাকি তুলে খেয়ে ফেলেছে।

খাবেই খাবে। ছেলেটা আগের জন্মে মহাতান্ত্রিক কোন সাধু ছিল, যে মড়া খেত এবং মড়ার বুকে বসে তপজপ করত। সুলোচনা মনে প্রাণে এটা বিশ্বাস করেন। তাঁর যুক্তি: তাই যদি না হবে, শংকর তো খাঁটি ভদ্রলোকের ছেলে, কুলীন বামুন ঘরে জন্ম, তার মাথায় জটা গজাবে কেন, কেনই বা ছেলেবেলা থেকে সাধুদের পিছনে লোটাকম্বল বয়ে ঘুরে বেড়াবে তীর্থে তীর্থে? শংকরা ডনের দাদা লালু আর হেমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল স্কুলে। সেই ছেলে ক্লাস নাইনে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ওর বাবা ছিলেন রেলের লোকোশেডের কর্মী। খাতাকলমের কাজ করতেন অর্থাৎ ক্লার্ক ছিলেন ভদ্রলোক। ছেলের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। পরে বদলী হয়ে যান নৈহাটিতে। আরও ভাইবোন ছিল শংকরার। মোহনপুরের কেউ ওঁদের আর খোঁজ রাখে না। এদিকে শংকরা জটা নিয়ে খাঁটি সাধুর বেশে ফিরে এসেছে মোহনপুরে, এত কাল

বাদে। প্রথম ক'দিন খুব ভক্তি সম্মান পেয়েছিল বাড়ি বাড়ি। তারপর হয়তো ঔদাসীন্য দেখা গেল। শংকরা মুসহরদের শ্মশানে গিয়ে মুসহরদের মতই এটা ওটা কুড়িয়ে ঝোপড়ি বানিয়েছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, রেলইয়ার্ড থেকে নীল ও কালি ঝুলি মাখা উর্দিপরা ড্রাইভার ফায়ারম্যান এবং গ্যাংয়ের লোকেরাও গিয়ে বসে থাকে ওর সামনে।

ইদানিং মোহনপুরের লোক 'শংকরা সাধু' আর বলে না। বলে—শংকরা ক্ষ্যাপা। আসলে অলৌকিক কিছু কীর্তি একটু আধটু না দেখাতে পারলে লোকে সাধু বলে মানবে কেন?

কিন্তু সুলোচনা যে তাকে মানলেন, তার একমাত্র কারণ অমির ভূতটা সৈকা ছুঁড়ির। মুসহর ছুঁড়ির ভূত তাড়ানোর ক্ষমতার সঙ্গে তিনি তার হাঁটুর মাংস খাওয়ার ব্যাপারটা জুড়ে দিয়েছিলেন। শংকরা সৈকার মাংস খেয়েছে যখন, তখন সে সৈকাকে অমির শরীর থেকে তাড়ালেও তাড়াতে পারে।

স্ত্রীর এত যোগাড় যাগাড়ে প্রমথ বিরক্ত হয়েছিলেন! ভেবেছিলেন, ডনকে বলে ওঁকে রোখা যাক। ডাক্তারি চিকিৎসা চলছে, এই তো যথেষ্ট। কিন্তু ডন আমল দেয়নি জ্যাঠাকে। কানে শুনেছে এইমাত্র। তারপর যথারীতি বেরিয়েছে তো বেরিয়েছে। বিকেলে প্রমথ বাজারে খবর পেয়েছেন, ডন আর ঝেণ্টু কাটোয়া না কোথায় গেছে। হুলোর খোঁজ নিলেন। হুলোও নেই। হুলোই সঠিক খবর দিতে পারত।

ওদিকে যাকে নিয়ে এত দুর্ভাবনা, সেই অমি দিব্যি আগের মত স্বাভাবিক। একটু দুর্বল দেখাচ্ছিল সকালের দিকে। বিকেলে সেটা কাটিয়ে উঠেছে। আগের মত হাসিখুশি মুখ। বুলুর ছেলেকে নিয়ে একশো আদর। বুলুর তো আতঙ্কে চোখ বড় হয়ে যাচ্ছিল। এই বুঝি আছাড় মেরে বসবে তার পুটুন সোনাকে।

এই দেখে আড়ালে সুলোচনা স্বামীকে বলেছিলেন, দেখছ তো? স্বচক্ষে দেখ এবার। কিছু যে মানো না—এবার হাতে-নাতে দেখ…

প্রমথ তেতো মুখে বলেন, দেখবটা কী? হিষ্টিরিয়ার ব্যাপারই এই। এই হাসছে, বেড়াচ্ছে আবার এই ফিট হচ্ছে, কাঁদছে, কত রকম করছে।

সুলোচনা বাঁকা হেসে বলেন, একবার তোমাকে পেত মুসহর-পাড়ার কেউ, দেখতুম!

না। আমাকে পাবে না। প্রমথ গরম মেজাজেই বলেন, তোমাকেই পাবে। পাবে কী, পেয়েছে!

গতিক বুঝে সুলোচনা যুক্তিবাদীর ভূমিকা নেন। বলেন, আচ্ছা, মাথা ঠাণ্ডা করে বিচার কর তো দেখি। সকাল অব্দি মেয়ে কী ছিল, আর যেই পল্টে জটাবাবার জলপড়া এনে দিল, খাওয়ালুম, তারপর চেঞ্জটা লক্ষ্য করনি?

কিন্তু তাই বলে যা খাওয়াবে খাইও, ওই ওঝা-টোজা দিয়ে কেলেংকারি কোর না। মুখ থাকবে না বাইরে। ছিঃ! ভদ্র-লোকের বাড়ি ওঝা ঢুকবে কী? তুমি এমন বেআক্কেলে উজবুকের মত কাণ্ড করবে? প্রমথ মোক্ষম যুক্তি দেখান এবার, এরপর ও মেয়ের ভবিষ্যত কী হবে বুঝতে পারছ না? আর ওর কোন সম্বন্ধ করা সম্ভব হবে? বরং নেহাৎ নার্ভের অসুখ হয়েছিল, এই বললে পার পাওয়া যাবে। দরকার হলে অবিনাশকে সামনে দাঁড় করাতে পারব।

এ যুক্তিটা সুলোচনাকে কিছু দমিয়ে দেয়। বলেন, না, মানে খুব প্রাইভেট্‌লি করা যায়।

ওঝার চিকিৎসা প্রাইভেট্‌লি? দেখেছ কখনও ওঝারা কি করে? কী কাণ্ড হয় দেখেছ?

না। তা অবশ্য দেখেননি সুলোচনা। তিনি কলকাতার মেয়ে। কিন্তু এখানে এসে অব্দি শুনেছেন। এক সময় মোহনপুরে অসংখ্য ভূতের উপদ্রব ছিল। পাশের বাড়ির বৌ-ঝিকেও ভূতে ধরত শুনেছেন। ভয়ে পারতপক্ষে দেখতে যেতেন না। শুনতেন রাতে পরিমল হাড়ি এসে নাকি সারিয়ে দিয়ে গেছে।

সুলোচনা বলেন, ধর অনেক রাতে ওপাশের ঘরে······

কথা থামিয়ে প্রমথ বলেন, তুমি জানো না! ওঝা ওকে আসন করিয়ে বসাবে! জোরে চেঁচিয়ে তন্তর-মন্তর আওড়াবে! ধুঁয়ো দেবে। খ্যাংরা ঝাঁটা দিয়ে বেদম পেটাবে। তারপর প্রাণের দায়ে হিষ্টিরিয়ার রুগী ভূতের নাম বলতে বাধ্য হবে। সব বানিয়ে বলবে। উপায় কি? আর কত অত্যাচার সইতে পারে? তখন ওঝা ব্যাটা বলবে, চেঁচিয়ে স্পষ্ট করে নাম বল। সবাইকে শুনিয়ে বল। তারপর বলবে, এই জলভরা ঘড়াটা দাঁতে কাঁমড়ে যেখানে ওকে ধরেছিলি, সেখান অব্দি নিয়ে যা!······

এই পর্যন্ত শুনেই মুসড়ে পড়েন সুলোচনা। আহা, কি সুন্দর দাঁতগুলো অমির! মুক্তোর মত দাঁত যাকে বলে।

তার চেয়ে সাংঘাতিক কথা, অমি রাত দুপুরে দাঁতে কলসী কামড়ে নিয়ে সেই ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল অব্দি দৌড়ুচ্ছে ভাবতেই হিম হয়ে ওঠেন সুলোচনা। ঠোঁট কামড়ে বলেন, যাক গে। অত সব না করে বরং এসে পরীক্ষা করে যাক না লোকটা। আসতে বলে পাঠিয়েছি যখন।

রাগে পেয়ে প্রমথ বলেন, খুব অন্যায় করেছ। অমি যদি নিজের মেয়ে হত, নিশ্চয় ও সব ছোটলোকমি করতে যেতে না!

অমনি জ্বলে ওঠেন সুলোচনা। মুখ ভেংচে বলেন, থাক, আর নিজের পরের বলে জাঁক দেখিও না! এত যদি আপন ভাবো, টুলু-বুলুর আগেই ওর একটা গতি করতে! লজ্জাহীন! হিপোক্রিট কোথাকার!

পাল্টা ঘায়ে প্রমথ পর্যুদস্ত। বলেন, আহা! অমি নিজেই তো জেদ করে আছে। যতবার এগিয়েছি, ও কি করেছে ভুলে গেলে? সতুমোক্তারের শ্যালক-পুত্র আসলে ওকে চাঁদ দেখিয়ে রেখেছে জানো না? এখন যত দোষ নন্দ ঘোষ। বাঃ! বাঃ রে! বাঃ! পর পর গোটাকতক বাঃ ধ্বনিতে প্রমথ নিজের বিস্ময়াভিভূত অবস্থা প্রকাশ করে আরও ফিসফিসিয়ে বলেন, কেন? তুমিও তো

মনে মনে বরাবর ধরে বসে আছ, হেমা তোমার বাড়ির জামাই হবে। মানে অমির কথাই বলছি। ধরে নেই তুমি?

সুলোচনা মুখ ফিরিয়ে রুষ্ট চোখে জানালার বাইরে বুগেনভিলিয়া দেখতে দেখতে বলেন, অমন ধরে সবাই থাকে। ডাবুকেও তো ধরে আছ তুমি। দেখো, শেষে কী হয়!

ঠিক এই সময় টুলুর ঘরে গানের আসর বসেছে শোনা গেল। অনেক দিন পরে টুলু গাইছে। 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে। বসন্তের এ মাতাল সমীরণে...'তারপর ডাবু কী একটা রসিকতা করেছে এবং খুব হাসছে ওরা।

তারপর কে বলে উঠল, আহা, ডিসটার্ব করো না। গাইতে দাও বড়দিকে।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে দ্রুত তাকাল। তারপর প্রমথ ঘুরে বসে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলেন, হেমা মনে হল—

সুলোচনা গম্ভীর মুখে বলেন, হেমা প্রায় দু' মাসের ওপর এ বাড়ি আসেনি। ডন নাকি শাসিয়েছিল। ডনকে নিয়ে আর পারা যায় না।

সুলোচনা বেরিয়ে যাচ্ছেন, প্রমথ ডেকে বলেন, শোন। ইয়ে— হেমার সঙ্গে আমরা তো কোন দিন কখনও খারাপ ব্যবহার করিনি! দেখ, যেন আগের মত ট্রিটমেণ্ট পায়—এসেছে যখন। আর...

সুলোচনা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিপাত করেন।

আর ইয়ে, ডন এলে দেখো, যেন হেমাকে কিছু বলে-টলে না। ডন অবশ্য ওদের আসরে ঢুকবে না। কখনও তো ঢোকে না। তুমি ওকে বরং আসামাত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। কথা আছে বলো। আমি ম্যানেজ করব ওকে।

সুলোচনা সায় দিয়ে বেরিয়ে যান। হেমাঙ্গকে পুনর্মিলনের আনন্দই জানাবেন।

যে বাড়ির কোন লোক গুণ্ডার খ্যাতি কুড়িয়েছে, সে বাড়ির

আণ্ডাবাচ্চাদেরও এক ধরণের সাহস গর্ব আর ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। মানুষ শিক্ষাদীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধির দোহাই দিয়ে আসুরিক শক্তির যত নিন্দামন্দই করুক, সে বাস্তবে অসুরেরই ভক্ত। মনে মনে অসুরের পরাক্রম কে না পেতে চায়! 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।' এই গ্রাম্য প্রবাদ নেহাৎ বিবেককে একটু সান্ত্বনা দেওয়া। হেমাঙ্গকে প্রায় গয়লাপাড়া যেতে হয় বলেই সে জানে, দুষ্ট গরুর মালিকের মনে কতটা গর্ব আছে ওই দুষ্টুমি নিয়ে। গরুটা শুধু বাঁজা না হলেই হল।

কথাটা ডন প্রসঙ্গে। বোসবাড়ির মেয়েগুলো ডনের জন্যে গর্বিত টের পেয়ে তার খারাপ লাগত। ডনের জ্যাঠা ও জেঠিমার তো কথাই নেই। বাইরের লোককে সমঝে না দিয়ে ছাড়েন না যে বাড়িতে অসুর বাঁধা, সাবধান।

শুধু অমি, যে ডনের সহোদর দিদি, একটু অন্য রকম। তার মধ্যেও ঔদ্ধত্য আছে। সাহস আছে মাত্রাছাড়া। কিন্তু হেমাঙ্গ জানে, এর কারণ ডন নয়। বরং ডনকে মনে মনে ঘৃণাই করে অমি। ডন সম্পর্কে হেমাঙ্গর সঙ্গে কত আলোচনা করেছে। হেমাঙ্গ বুঝতে পেরেছে, ডনের জন্য আসলে অমির সব সময় অস্বস্তি থাকে। বিশেষ করে ডনের মেয়েদের ব্যাপারে সেই অদ্ভুত নীতি-বোধ! বরাবর অমি বাইরে বাইরে ঘুরতে অভ্যস্ত। সারা মোহনপুরে ওর বন্ধু এবং আলাপের মানুষ। যদি ডনের অস্তিত্ব না থাকত, বোসবাড়িতে বিরাট ভিড় জমত। ডনের দিদি বলে প্রকাশ্য কৌতূহল দেখাতে অমির বন্ধু ও আলাপের মানুষরা ভয় পেয়েছে। তাছাড়া এমনিতেই বোসবাড়ির মেয়েরা কম আসে। টলু বুলুরা একটু দেমাকী ছিল ছেলেবেলা থেকে—পরে ডনের জন্যে যেন দেমাক একশোগুণ বেড়েছে।

দু'মাস পরে বোসবাড়ি ঢুকল হেমাঙ্গ। ডাবু টানতে টানতে নিয়ে এলো। সকালে ডনের কথায় হেমাঙ্গ ছাড়পত্রের আভাস

পেয়েছিল। কিন্তু তার সংশয় ছিল, অমি কী ভাবে নেবে তার আসাটাকে।

হেমাঙ্গ বুঝল না, টুলু বিলু মিলু ইলু কেন আজ তাকে দেখামাত্র খাতির জুড়ে দিল। ডাবুর খাতিরে খাতির? মনে হল না হেমাঙ্গর। উত্তর পশ্চিম কোণায় একতলাতে টুলুর ঘর। কোণে ঠাকুরের ছবি এবং পুজো-আচ্চার ব্যবস্থা আছে। সেটা টুলুর নিজের ভক্তিতে কিংবা তার মায়ের তাগিদে, হেমাঙ্গ জানে না। এ ঘরেই বরাবর গানের আসর বসে। পুরনো অসচ্ছল আমলের ছুটো বড় তক্তপোষ জুড়ে বিছানা পাতা। বিলু একা এলে এ ঘরে দিদির কাছে থাকে। কখনও সুলোচনা জনকে নিয়েও বিধবা মেয়ের পাশে শোন। তাছাড়া গানের আসরের সুবিধে আছে প্রকাণ্ড এই বিছানাটাতে। হেমাঙ্গ ভেবেছে, যে রাতে বেচারা টুলুদি একা এত বড় বিছানায় শোয়, সে রাতে তার মনের অবস্থা কেমন হতে পারে? এ যেন না জেনে ওকে শাস্তি দেওয়া। তার বদলে ছোট্ট একচিলতে বিছানায় টুলুদির শোওয়া কি ভাল ছিল না?

পরে ভেবেছে, হয়তো বুদ্ধিমতী সুলোচনা মেয়ের চির-একাকিত্ব নষ্ট করার জন্যেই অত বড় বিছানায় শুতে দেন। গড়িয়ে ছড়িয়ে শোবে। অন্তত কল্পনার অবকাশ পাবে যে, আরেকজন যেন একটু তফাতে শুয়ে আছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রাগারাগি হলে তো ছ'জনের মাঝখানে নদী বয়ে যায়।

ছোট্ট বিছানায় ঠাসাঠাসি শুয়েই বরং নিঃসঙ্গতার বোধ চেপে ধরার আশংকা আছে। নয় কি? কল্পনা বাধা পেতে বাধ্য, কারণ 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী'।

এ সব কথা নিছক মনে মনে নয়, হেমাঙ্গ অমির সঙ্গে আলোচনাও করেছে। তাই বলে, আমি প্রাণ গেলেও টুলুদির কাছে শোব না। বলেছিল—কী বিচ্ছিরি অভ্যেস জানো না। মুখে বলা যায় না। মেয়ে বলেই মনে হবে না তোমার। আস্ত পুরুষ মানুষ টুলুদি।

হেমাঙ্গ হাসি চেপে বলেছিল, তাই বল। লেসবিয়ান।

যাঃ! বলে অমি হেমাঙ্গর কান টেনে দিয়েছিল।

অমির সঙ্গে হেমাঙ্গ অবশ্য সেক্স নিয়ে কথা বলতে ভয় পেত। তাই যত তীব্র কৌতুহল জেগে উঠুক টুলুদি সম্পর্কে, হেমাঙ্গ আর এগোতে পারেনি।

বিকেলে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের ওখানে অমিকে ভূতে ধরার জায়গাটা ডাবু আর হেমাঙ্গ সকৌতুকে ঘোরাঘুরি করে তারপর এসেছে বোস বাড়ি। এসেই দেখল, গানের আসর। সেজেগুজে বসে গেল। টুলুদি মাকে খুঁজে না পেয়ে নিজেই কুকার জ্বেলে কেটলি বসিয়ে এলো। ঘণ্টার মা উনুনে কয়লা সাজাচ্ছে। জল ফুটলে খবর দিতে বলে এলো।

হেমাঙ্গ আড়চোখে অমিকে দেখছিল। এ কী চেহারা হয়েছে অমির। হলুদ রক্তশূন্য মুখ! চোখের তলায় কালি। গালটা চিমসে হয়ে গেছে। কত রোগা দেখাচ্ছে ওকে! হেমাঙ্গর মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু অমি তার উপস্থিতি গ্রাহ্য করেছে না যেন, কথা বলা তো দূরের কথা। তাই হেমাঙ্গ ওর সঙ্গে কথা বলল না। এদিকে গানের আসরের ঝোঁকে এই ছোটখাট ব্যাপার লক্ষ্য করার মন নেই কারও। ডাবু পা মুড়ে বসে ডুগিতবলায় পাউডার মাখাচ্ছে। ইলু হই হই করে বলল, দিলে তো কৌটো ফিনিশ করে। সেজদি রে, তুই কিছু বলছিস নে, তোরও শেয়ার আছে। মাইণ্ড ছাট।

হেমাঙ্গ বলল, শেয়ার আছে মানে?

ডনদা এনে দিয়েছে দু'জনকে। দিশী পাউডার ভেবেছ নাকি?

এই শুনে ডাবু কৌটোটা তুলে দেখে নিয়ে বলল, টরেব্বাস! মেড ইন প্যারিস। তাই এত রোয়াব ছোটাচ্ছে! বলে সে বাতাস শুঁকে নিল অদ্ভুত ভঙ্গীতে।

আবার হাসির ধুম পড়ল আসরে। টুলুদি বলল, ডনের কারবার ভাই। নামেও সায়েব, কাজেও তাই।

ডাবু ভবালায় চাঁটি দিতে দিতে অমির দিকে চোখের ঝিলিক মেরে বলল, অমি, সাবধান! দেখ বাবা সেন্টের লোভে ভূত-পেরেত নাকি হানা দ্যায়। তোমার ভূতটাকে সামলে রেখো।

অমি রুগ্ন হাসল শুধু। বিছানার কোণায় পা ঝুলিয়ে বসে উরুর ওপর বিলুর ছেলেকে রেখেছে। ছেলেটার রবারের রঙীন বল দু'হাতে ধরে কামড়াবার চেষ্টা করছে। ঘরে দিনের আলো কমে গেছে। সতর্ক বিলু সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর অমির পাশে বসল।

টুলুদি, জ্যোৎস্না রাতে গানটা! ডাবু ফরমাস করল।

টুলু সেকেলে প্রকাণ্ড হারমোনিয়ামের ফোল্ডিং বেলো খুলে ঝুঁকে পড়েছে খাতার দিকে। তারপর ঠোঁট খুলেছে।

ডাবু বলে উঠল, বনে নয়, ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালে যাব। অমি যেখানে গিয়েছিল।

আবার হাসির ঝড়। অমিও কেমন টেনে টেনে হাসছে, রুগ্ন, কষ্টের হাসি। তাই হেমাঙ্গ বলে উঠল, আহা, ডিসটার্ব কোরো না! গাইতে দাও বড়দিকে।

টুলু শুরু করার পর এতক্ষণে হন্তদন্ত সুলোচনা এলেন। সবাই তাকিয়েছে ওঁর দিকে, এই রে! দিলেন হয়তো আসরটা ভেঙে। কিন্তু সুলোচনার চোখে-মুখে সায় ছিল। ঠোঁটে সুন্দর হাসিও।

হেমাঙ্গর কাছে এসে চাপা গলায় বলেন, কী ছেলে রে বাবা! পথ ভুলে গেছ! তারপর এগিয়ে অমির কোল থেকে নাতিকে নিয়ে নাচাতে নাচাতে মেয়ের সুরে সুর মেলান। সবাই জানে সুলোচনা যৌবনে ভালই গাইতে-টাইতে পারতেন। সুরে সুর মেলাতে লজ্জাসংকোচ করেন না। তিনি যে কলকাতার মেয়ে, তাই এখানকার মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট, শিক্ষিতা, এবং রুচিবতী, তার প্রমাণ দেখাতে কসুর করেন না এই প্রৌঢ় বয়সেও।

গান জমে উঠেছে সুলোচনার লাই পেয়ে! টুলু থামলে তিনি বলেন, অমি, তুই গা তো মা! 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'। ওঠ।

অমি মাথা নাড়ে।—একা দমে কুলোবে না! বড়দি গাক্। সঙ্গে সবাই গাইছি।

বেশ তো, তাই।

সবাই গাইছে। সুলোচনা এবং ডাবুও। হেমাঙ্গ চুপ। ইলু বলে ওঠে, ও মা! হেমাদা গাইছে না।

সুলোচনা বলেন, হেমা! অনেক দিন থাপ্পড় খাওনি?

তখন হেমাঙ্গও গলা মেলায়।

বারান্দায় প্রথম এসে দাঁড়িয়েছেন। খুশি হয়ে ভাবেন, রাইট কোর্স অফ অ্যাকশন। অবিনাশ ডাক্তার ঠিক ঠিক এ রকমই বলেছে। তারপর বারান্দার আলোটা জ্বেলে দেন।

সেই আলোয় প্রকাণ্ড উঠোনের ওপাশে সদর দরজার কাছে কাকে আবছা নজরে পড়ে। কে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। সদর দরজা সব সময় খোলাই থাকে। ডনের বাড়ি এটা।

তক্ষুনি রেগে আগুন হয়ে প্রথম নেমে যান। গম্ভীর স্বরে বলেন, কে রে তুই? ভূতের মত এখানে চুপচাপ ঢুকে বসে আছিস, কে তুই? কোন্ সাহসে না ডেকে বাড়ি ঢুকেছিস?

লোকটা আবছা আলোয় দাঁত বের করে বলে, স্যার আমি পিরিমল ওস্তাদ। হাড়িভাঙা থেকে এসেছি। গিন্নিমা খবর পাঠিয়েছিলেন।

প্রথম বাঘের মত ঝাঁপিয়ে ওর জামার কলার খামচে দরজার বাইরে নিয়ে যান। তারপর চাপা গর্জে বলেন, মেরে তক্তা বানাব উল্লুককে! গেট আউট! আর কখনো যদি আসবি এদিকে ক্যানেলে চুবিয়ে মারব। আস্পর্ধা দেখেছ? দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে!

পরিমল ওস্তাদ ডনকে চেনে। বাইরে গাছপালা প্রচুর। অন্ধকার রাস্তায় তার কালো মূর্তি পলকে মিলিয়ে যায়।

প্রমথর এখন ভাবনা, বাড়ির কেউ টের পেল নাকি! ঢুকে

বরজা এঁটে ঘণ্টার মাকে ডাকেন, ওরে বুড়ি! কল টেপ দিকিনি। হাত ধোব।

ঘণ্টার মা টিউবওয়েলের কাছে এসে ফিক করে হেসে ফিস-ফিসিয়ে বলে, তাইড়ে দিলেন ওস্তাদকে?

দিলুম। খবর্দার, জনের মাকে বলবিনে, এসেছিল।

না গো না। বলব না। আপনি হাত ধোন তো।

তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে বারান্দায় ওঠেন প্রমথ। ঘণ্টার মা নির-বিলি জল টিপে দিয়েছে জানলেও বিপদ। ঝি মেয়েটিকে চোখে চোখে রাখেন। প্রমথর নিজেকে পঁয়ষট্টি বছরের কামক্ষমতাহীন বুড়ো মানুষ বলাটাই নাকি চালাকি। চাকরি জীবনে কতবার নাক নাড়া না খেতে হয়েছে—ব্লক আপিসের ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়েগুলোকে ছেড়ে আসতে কি মন চায়? রোজ বাবুর সন্ধ্যে সাতটা বাজবে না কেন? সুলোচনাকে বোঝানো কঠিন, ওভারশিয়ারের কাজ দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টার। কদমপুর রোডের কালভার্ট মেরামত হচ্ছে। হাবুল মিয়া কমপ্লিশন সার্টিফিকেট না নিয়ে ছাড়বেন না। তাই মুখ চেয়ে অপেক্ষা করতে হল।···

ডাবু ততক্ষণে বিরক্ত। ঢিমেতালে বাজিয়ে হাতের সুখ মিটছে না। এক সময় বলে ওঠে, বাঙালী মেয়ে মানেই রবিঠাকুর! হ্যাত্তেরি! ঠুংরি-ফুংরি, নয়তো হিন্দি ফিল্ম চালাও না বাবা!

সে কাহারবা দ্রুততালে যেন হাতের খেল্ দেখাতে থাকে। তখন ছোট ইলুর কাঁধে দায়টা পড়ে। সে হিন্দি ফিল্ম আর পপ গানের ভক্ত। হিট গানগুলো মুখস্থ। এবার ডাবু বলে, বহুত আচ্ছা ইয়ার!

অমি বাইরে যায়। টুলু সাবধানী গলায় একবার জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছিস রে?

জবাব দেয় না অমি। টুলু ঠোঁট বাঁকা করে একটা ভঙ্গী করে। তবলা বাজাতে বাজাতে ডাবু মুসহরভাষার ঢঙে অমির উদ্দেশ্যে বলে, ছাগলঠো কা গেইলে দেখ গে ছোকড়িয়া।

গানের মধ্যে হাসি ছড়ায়। হেমাঙ্গ সিগারেট বের করে এ্যাসট্রে দেওয়ার ইশারা করে মিলুকে। মিলু একটা কাপ এগিয়ে দেয়। তখন বিলু বলে, ওপরের ঘর থেকে ডনের এ্যাসট্রেটা এনে দে না। কাপটা নোংরা করে কী লাভ?

অগত্যা মিলু বেরিয়ে যায়। কিন্তু গিয়েই ফিরে এসে কাঁচুমাচু মুখে বলে, আমি একা ওপরে যেতে পারব না। কেউ আসুক আমার সঙ্গে।

বাড়িতে ভূতের ভয় কাল রাত থেকে জাঁকিয়ে বসেছে বোঝা যায়। ডাবু ফের অমির উদ্দেশে বলে, আগে সৈকা! এ্যাসট্রেঠো লাকে দে না গে উপ্পরসে!

হেমাঙ্গ উঠে দাঁড়ায়। বলে, দরকার নেই বাবা। বাইরে গিয়ে খেয়ে আসছি।

ডাবু বলে, সৈকা পাকড় লেগা বে! মাৎ যা।

বারান্দায় গিয়ে থামের পাশে দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গ সিগারেট ধরায়। টুলুর ঘরে আবার একটা হিট গান গাইছে ইলু! ডাবুও গলা মিলিয়ে বাজাচ্ছে। ওপাশে রান্নাঘর থেকে সুলোচনা ডাকছিলেন, মিলু ইলু! এদিকে আয় তো!

হেমাঙ্গ দরজার কাছে গিয়ে মিলুকে জানিয়ে দেয় খবর। মিলু চলে যায় রান্নাঘরে। লুচিভাজার গন্ধ ছুটছে বাড়িতে। প্রমথর সাড়া নেই। হয়তো বাইরের বারান্দায় বসে আছেন। হেমাঙ্গ অমিকে খোঁজে। বারান্দার আলোটা উঠোনের আদ্ধেকটা পর্যন্ত ছড়িয়েছে।

অমি উঠোনে টিউবওয়েলের ওপাশে শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখ পড়তেই বুক ছ্যাৎ করে ওঠে হেমাঙ্গর। ওখানে একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি করছে? বাড়ির পূবদিকে গাছপালার মাথায় চাঁদ উঠেছে। বিকেল থেকে আকাশ ফাঁকা হয়ে গেছে। দোতলা ডিঙিয়ে এক খাবলা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শিউলি গাছটায়। হেমাঙ্গ ডাকে অমি, ওখানে কি করছ?

অমির জবাব এলো আস্তে।—মাথা ধরেছে!

ট্যাবলেট খেয়ে নাও তাহলে। ওখানে…

এই! শোন।

হেমাঙ্গ চমকায়। কিন্তু দ্বিধা ও ভয় মাড়িয়ে ওখানেই লাফ দিয়ে নেমে কাছে যেতে দেরী করে না। কাছে গিয়ে সে বলে, কি হয়েছে তোমার অমি?

অমি চাপা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, ভোঁসড়িবালে কাঁহেকা! তারপর জোরে চড় মাড়ে হেমাঙ্গর গালে। তারপর হাসতে থাকে হি হি হি হি…এবং হেমাঙ্গ ছিটকে সরে এসে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে, ডাবু! ডাবু! টুলুদি!

।। চার ।।

সেই সন্ধ্যার ব্যাপারটা হেমাঙ্গর মাথার মধ্যিখানে ঢুকে গেছে। ভূত-প্রেতে বিশ্বাস তার এতটুকু ছিল না। তবে অন্ধকারে একলা হলে কল্পিত অশরীরীর স্বাভাবিক আতঙ্ক তাকে চেপে ধরত বটে। কিন্তু সেই কল্পিত অশরীরী যেন বোসবাড়ির শিউলিতলায় শরীরী হয়ে তার গালে চড় মেরেছিল। চোয়ালের ব্যথা যেতে দেরী হয়েছিল। আর বাঁ কান তো ঝিম ধরে থেকেছে পরদিন অব্দি। কিছু শুনতে পাচ্ছিল না।

খাবলা-খাবলা জ্যোৎস্নায় এলিয়ে পড়া চুল আর চোখের নীলচে জ্যোতি, তার সঙ্গে হি হি হি হি হাসি! অলৌকিকের সঙ্গে হেমাঙ্গর সত্যি সত্যি পরিচয় হয়ে গেছে। যখনই দৃশ্যটা মনে পড়ে, গা ছমছম করে হেমাঙ্গর। সূর্য ডুবলে কয়েকটা দিন আর বেরুতেই পারেনি ঘর থেকে।

সেদিন অমিকে বুধনী বহরীর মেয়ে শিগগির রেহাই দিয়েছিল শঙ্করার ভয়ে। দুপুরে নাকি শঙ্করার খাওয়ার কথা ছিল বোসবাড়ি। কাজকর্ম ছিল, তাই যেতে পারেনি। ভাবু অমিকে ধরতে গেছে, অমি টিউবওয়েলের পাশে পড়ে গিয়েছিল। দাঁতে দাঁত। বারান্দায় তোলা হল। বাড়ি চুপ হঠাৎ। হেমাঙ্গ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় শঙ্করার হাঁকডাক শোনা গিয়েছিল সদর দরজায়। প্রথমে বিকট নাদ—ওঁং তারাত্তারাত্তারাত্তারা··· ওঁং ওঁং ওঁং! সুলোচনার ধমক খেয়ে ঘণ্টার মা দরজা খুলে ছিটকে পাশে দাঁড়িয়েছে আর গুলবাঘের মত বেঁটে জটাজুটধারী লাল কৌপিন পরা শঙ্করা ক্ষ্যাপা ঝাঁপিয়ে পড়েছে উঠোনে। সুলোচনা ব্যস্তসমস্ত হয়ে দেখাচ্ছেন, এলি তো, ঠিক সময়েই এলি বাবা! ওই ছাখ মেয়েটার কী অবস্থা হচ্ছে!

শঙ্করা সেজেগুজেই এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে। কৌপিন, গলায় ইয়ামোটা রুদ্রাক্ষের মালা, দড়ির মত মোটা পৈতে, কপালে কয়লা ঘষে আঁকা ত্রিপুণ্ডক ইত্যাদি। আর এক হাতে ওর ছোট্ট ত্রিশূলটাও ছিল। সেটা অমির মাথায় ঠেকিয়ে দাঁত কড়মড় করে আবার বার তিনেক ওঁং হাঁকার পর একটা তাক লাগানো কাজ করল। কেউ লক্ষ্য করেনি, ওর কোমরের কাছে এক টুকরো হাড় লাল সুতোর বাঁধা ছিল। পট্ করে সুতো ছিঁড়ে হাড়টা যেই অমির মুখের কাছে নিয়ে গেছে, অমি নড়ে উঠল এবং তাকাল। জোরে ফোঁস করে নিশ্বাস পড়ল তার। হেমাঙ্গ দেখছিল, পেটটা ফুলে উঠেছিল, এতক্ষণ কাঁপছিল। যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। হাড়ের ম্যাজিকে ফুসফুস স্বাভাবিক হয়ে গেল। তখন শঙ্করা ফের বারতিনেক ওঁং নাদে বাড়ি কাঁপিয়ে এবং বাড়িশুদ্ধ লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে জল চাইল এক ঘটি।

ঘটির জলে কী মন্ত্র পড়ে যেই অমির মুখে ছিটিয়েছে, অমনি অমি ধুড়মুড় করে উঠে বসল। শংকরা হা হা হা হা করে হাসতে লাগল।—অল ক্লিয়ার!

ডাবুরও মুখ বন্ধ, চোখ নিষ্পলক। সুলোচনা তার কানে কানে বলছিলেন, হাড়টা কিসের বুঝলে তো? তখন ডাবু ঘাড় নেড়েছিল। বুঝেছে। সৈকার সেই হাঁটুর হাড়।

সমস্ত দৃশ্যটা হেমাঙ্গর চোখে যত ভয় জাগানো, তত অশালীন। প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার-স্যাপার কী ভাবে যে এখনও এসে ঢুকে পড়ছে, ভাবতেও অবাক লাগে। কিন্তু যা চোখে দেখল, তা উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা হেমাঙ্গর তখন ছিল না। মনে হয়েছিল, তাহলে সত্যি সত্যি ভূত আছে!

ডাবুর থাকার কথা ছিল দু-তিনটে দিন। পরের দিনটা কোন রকমে কাটিয়ে সে জামসেদপুরে চলে গেছে। ভূতের ভয়ে নয়, ব্যাপারটা খারাপ লেগেছে। হেমাঙ্গকে বলে গেছে সে কথা। অমি যেন এতকালের হাসিখুশি গর্বিত উদ্ধত এবং বেপরোয়া বাড়িটাকে

মিইয়ে দিয়েছে হঠাৎ। মুখগুলো গম্ভীর। চলাফেরা আড়ষ্ট। ওদিকে প্রমথরা স্বামী স্ত্রী মিলে সারাক্ষণ ফিসফিস কী দুর্বোধ্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর ডন যেন নির্লিপ্ত। আগেও নির্লিপ্ততা দেখা গেছে তার, কিন্তু এতখানি নয়। হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলে যায়। বাইরেই খায় বেশি সময়। অনেক রাতে ফিরলে ওপরে তার ঘরে বসে খায়। খাবার ঢাকা থাকে।

অমি যদিও বা হাসিখুশি থাকতে চাইছিল, আবহাওয়া গুমোট দেখে সে ঝিম মেরে গেছে। চুপচাপ ডনের ঘরে শুয়ে থাকে। ডন ফিরলে ইলু-মিলুর ঘরে যায়। ডাবুর সবচেয়ে খারাপ লেগেছে, অমিকে তার জেঠিমা আর ইলুদের খাটে শুতে দেননি। বিলু নাকি শোবে।

দেননি, মানে মুখে বলার ক্ষমতা নেই। প্রকারান্তরে অমির আলাদা শোওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ওপরে ডনের ঘরের পাশে একটা ছোট্ট ঘর আছে, যেটা পরে সাজিয়ে গুজিয়ে সুলোচনার ঠাকুর ঘর করার কথা। সেই ঘরে আপাতত কয়েকটা বাক্স-প্যাঁটরা আছে। ডাবু বলে গেছে, আন্দাজ আট ফুট বাই দশ ফুট। মেঝেয় শুচ্ছে অমি। একা। খুব খারাপ লাগল রে ভাই! আফটার অল মা-বাবা হারা মেয়ে। ভাইটা তো মহা মস্তান। মনের অবস্থা কী হচ্ছে বুঝে ছ্যাখ তো। জিগ্যেস করছিলুম, ভয় করে নাকি? ওকে তো জানিস. কী গোঁ ধরা মেয়ে। বলল, কিসের ভয়?…

ডাবু চলে যাওয়ার আগে নিজের কণ্ট্রাক্টারির প্ল্যানটা আবার শুনিয়ে ছেড়েছে হেমাঙ্গকে। জুনের মধ্যে এসে পড়বে সে। কয়েকটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে গেছে হেমাঙ্গকে। হেমাঙ্গ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে যেন। দিনের আলো ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গে একটা গা ছম ছম ভাব তাকে পেয়ে বসে। দিনের আলো ফিরে না আসা অব্দি সেটা কাটতে চায় না। রাতে জৈব তাগিদে বেরুনোর সাহস থাকে না তার। ভাবে, মুনাপিসিকে আগের মত ডেকে ওঠাবে। কিন্তু লজ্জায় পারে না। এখন সে রীতিমত আটাশ বছরের যুবক।

তিন চার দিন পরে অবশ্য এই ছমছমানিটা কেটে যায়। হেমাঙ্গ আগের মত সন্ধ্যায় স্টেশনের ওভারব্রিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। খালের ছোট পোল পেরিয়ে পোড়ো জমি আর আগাছর জঙ্গল পেরিয়ে বাড়ি ফেরে। বার বার পিছু ফিরে এদিক ওদিক দেখে নিতে ভোলে না যদিও। একটু শব্দেই চমকে ওঠে। কিন্তু এ তার একটা লড়াই। ভয়ের সঙ্গে মরীয়া হয়ে লড়াই। ভূত থাকা সম্ভব কি না যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের সূত্র নিয়ে মাথা ঘামায়। অবিনাশ ডাক্তারের হিস্টিরিয়া সংক্রান্ত মতামত নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে ব্যস্ত হয়। কিন্তু যেমনি শ্মশানতলার ওদিকের মাঠে সূর্যাস্ত হয়, অমনি আস্তে আস্তে ছড়িয়ে আসা অন্ধকারের সঙ্গে সেই প্রাগৈতিহাসিক অলৌকিক পা বাড়ায় তার দিকে। তখন মনে হয়, বিজ্ঞান কতটুকুই বা জেনেছে এখন অব্দি? থাকলেও তো থাকতে পারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন সত্তা!

এই সময় একদিন মাথায় ঝোঁক চাপে। দুপুরবেলা খাওয়ার পর কিছুক্ষণ ঘুমোবার চেষ্টা করার পর হেমাঙ্গ হঠাৎ ঝোঁকের বশে সোজা খালের ছোট পোল পেরিয়ে মুসহর বস্তীতে গেল।

বিশাল ঘোড়ানিমের গাছ আছে একটা। তার নীচে বসে এক মুসহর যুবতী কয়লাগুঁড়ো আর গোবর মিশিয়ে গুল বানাচ্ছে। হেমাঙ্গ একটু ইতস্তত করে। এ পাড়ার বদনাম আছে। তাকে এখানে কেউ দেখলে লজ্জায় পড়ে যাবে।

যুবতীটি হেসে বলে, বাবু, আপনি মোক্তারবাবুর ভাতিজা আছেন তো?

ঠিক চিনেছে। হেমাঙ্গ বলে, হ্যাঁ। ইয়ে—বুধনী কোথায় থাকে?

বহরী। উ তো ভিখ মাঙতে গেসলে!...বলে সে মুখ ঘুরিয়ে কিছু দেখে নেয়। ঠারিয়ে বাবু! এ কিসমতিয়া রী! কিসমতিয়া!

একটি ঝোপড়ি থেকে এক কিশোরী উঁকি মেরে সাড়া দেয়—ক্যা গে!

বহরীমোসি আলে রী ?

হ্যাঁ আভি আলে।

মোক্তারবাবুকা ভাতিজা পুছে। বোল রী জেরা, হাঁ!

ছায়ায় দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গ দরদর করে ঘামে। জোরালো হাওয়া আছে। আকাশে গনগনে রোদ আছে। সে রুমাল বের করে ঘাম মোছে। সামনে রেলইয়ার্ডে আজ অনেকগুলো ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে। একটা এঞ্জিন কোথায় ফুঁসছে, দেখা যায় না। হেমাঙ্গ সিগারেট ধরায়। যুবতীটি কেন কে জানে মুখ টিপে হাসছে আর গুল বানাচ্ছে আপন মনে। হাতের প্রচুর চুড়ি ঝমঝম করে বাজছে সারাক্ষণ। খালের দিকে একপাল শূওর ঘুরে বেড়াচ্ছে। গায়ে পাঁক। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করছে ওদের। ওটা খেলা।

তারপর বুধনী বহরীকে লাঠি হাতে আসতে দেখল সে।

কাছে এসে বুড়ি বলে, কৌন্ গে ?

এ দেখ্ না! মোক্তারব'বুর ভাতিজা।

হেমাঙ্গ বলে, এসো মাসি। তোমার কাছে এলাম। কথা আছে।

বুড়ি একটু সোজা হবার চেষ্টা করে ওর মাথা থেকে পা অব্দি দেখে নেয়। তারপর হাসে।—অ, হেমাংবাবু। বামুনদিদির ভাতিজা। মোখতাংবাবু বহুত্ ভদ্দরলোক ছিল। তেরা পিসা।

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে কথা আছে। হেমাঙ্গ চেঁচিয়ে একটু ঝুঁকে বলে।

বুড়ি কানে শোনে না, এই এক জ্বালা। যুবতীটি হাসতে হাসতে বলে, বাবু খুব আস্তেসে বাত বলুন, শুনবে।

হেমাঙ্গ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আস্তে বলে, তোমার সঙ্গে কথা আছে মাসি।

কোথা আছে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

হামার সাথে ?

হ্যাঁ। ওখানে চল, বলছি।...বলে হেমাঙ্গ পা বাড়ায়।

বুধনী বহরী তাকে অনুসরণ করে। পিছনে যুবতীটি হাঁ করে তাকিয়ে আছে। বুধনী নির্বিকার। কিছুটা এগিয়ে খালের ধারে উঁচু গাছের জটলা। রেল লাইন অব্দি ছায়া পড়েছে। কয়লাগুঁড়ো পাথরকুচি ভরা মাটির ওপর ঘাস গজিয়েছে। সেই ছায়ায় রেল-লাইনের ওপর হেমাঙ্গ বসতে গেলে বুড়ি হাত নেড়ে বারণ করে। তাই হেমাঙ্গ সরে এসে ঘাসেই বসে। বুড়ি হাঁটু দুমড়ে সামনে বসে—দু'পায়ের ফাঁকে লাঠিটা।

হেমাঙ্গ বুঝতে পেরেছে, গলার স্বর কতটা খাদে নামালে বুড়ি শুনতে পাবে। সে বলে, তোমার মেয়ের কথা শুনতে চাই, মাসি।

ক্যা?

তোমার মেয়ে সৈকার কথা।

সৈকিয়া?

হ্যাঁ মাসি।

কাহে? কেন?

হেমাঙ্গ একটু অপ্রস্তুত হয়। বুড়ি ঘোলাটে চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। গলার হাড়টা নড়ছে। হেমাঙ্গ পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা এক টাকার নোট বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে। বুড়ি টাকার দিকে তাকায়। তারপর ফের হেমাঙ্গর দিকে তাকিয়ে থাকে। হেমাঙ্গ বলে, নাও মাসি। তুমি আমাকে তোমার সৈকার কথা বল।

এবার বুড়ি টাকাটা কাঁপা কাঁপা হাতে নেয়। দুমড়ে ধরে থাকে এবং কেঁদে ফেলে। তারপর চোখ মুছে অসহায় দৃষ্টিতে তাকায় হেমাঙ্গর দিকে। হেমাঙ্গ বলে, বল মাসি!

বুড়ি ধরা গলায় এবার সৈকার কথা শুরু করে। ওর কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা না গেলেও হেমাঙ্গর অসুবিধে হয় না বুঝতে। ক্রমশ বুড়ি অনর্গল ও দ্রুত কথা বলে চলে। মুহুর্মুহু ওর মুখের ভঙ্গী

বদলে যায়, কখনও উত্তেজিত, কখনও করুণ, কখনও মৃদু হাসি ফোটে এবং কখনও রাগে ক্ষেপে অশ্লীল গাল দিয়ে বসে।

হ্যাঁ, হেমাঙ্গ শুনেছিল, বুধনী বহরী সৈকার কাহিনী বলতে ঠিক এ রকমই নাকি করে। সে নিজে কখনও শোনেনি। কিন্তু অনেকে বলেছে বুধনী কী শোনায় ইনিয়ে বিনিয়ে। সৈকার মৃত্যুর পর নাকি যাকে পেত, ধরে ধরে শুনিয়ে ছাড়ত। এখনও ভিক্ষেয় গিয়ে লোককে শোনাতে চায়। প্রথম প্রথম সবাই শোনার চেষ্টা করত। এখন নাকি বিরক্ত হয়। বুধনী বিরস মুখে উঠে আসে। রাস্তায় যেতে যেতে গাছকে শুনিয়েও সৈকার কাহিনী বলা অভ্যেস। এ সবই হেমাঙ্গ নানাজনের কাছে শুনেছে। সে নিজের কানে এবং মুখোমুখি এই প্রথম শুনছে।

সৈকার কাহিনী মানে এক লম্বা চওড়া জীবনবৃত্তান্ত। তার জন্ম, জন্মের সময় কী সব খারাপ-খারাপ নৈসর্গিক ইশারা পাওয়া গিয়েছিল, সৈকার বাবার কীর্তি, এ সব থেকে শুরু করে সৈকার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মস্ত একটা আখ্যায়িকা। অন্য সময় হলে হেমাঙ্গর কান ব্যথা হয়ে যেত। এখন সে খুঁটিয়ে শুনছে এবং প্রশ্নও করছে। বুধনীর অবাক ভাবটা আর নেই। প্রচণ্ড উৎসাহে মহাভারত খুলে ধরেছে।···

···একটা ভুল হয়েছিল বুধনীর, বিষম ভুল। মেয়েকে ঠিক ঠিক বয়সে জামাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু টাকার লোভ বড় লোভ। ওই লোভই খেল বধুনীকে। সে তার সুন্দর মেয়ের দাম বছর বছর হেঁকে বাড়াতে থাকল। মুসহর বস্তীতে তাকে কিনবে কোন্ বাপের বেটা? ঝেন্টুর বাবা এসেছিল। ঝেন্টু ভি নিজে একদিন এসেছিল। বধুনী বলেছিল, দোশো টাকা ঔর উনিশ ভরি চাঁদি দে। দিয়ে সৈকিয়াকে লিয়ে যা। ঝেন্টু তাতে খুব রাগ দেখাল। বলল, বেটিকে তাহলে দিবি না বুঢ়িয়া? মালুম হচ্ছে কি, কেরায়া খাটাবি! সেই টাকায় মহল বানাবি? আচ্ছা, আচ্ছা। দেখব, কোন্ হারামী সৈকার সঙ্গে পীরিত করতে আসে।

চাকু চালিয়ে কল্‌জে ফেড়ে ফেলব।…তো হেমাংবাবু, মরা বেটির নামে কিরিয়া করে বলছি, সে মতলব মাথায় আদপে ছিল না। আরে হারামী লেড়কা! আমি কি তাদের ঝাড় বংশে আছি? তোর বহিনটা রোজ রাতে ওই রেলের কামরার মধ্যে গিয়ে অফসরদের সঙ্গে পীরিত করে। টাকা কামায়। সাজপোশাক করে কত রকম ছো ছো! আরে ছোকড়া! তোর মা কি ছিল? হরি ড্রাইভারজীর সাথে ভেগে ভি গিয়েছিল। তো হামি বুধনী আছি। হামার ধরম আলাদা। মিলিটারি পল্টনলোক বহত ঝামেলা করেছে। লোভ দেখিয়েছে। বুধনী তখন প্রচণ্ড যুবতী। পালিয়ে গিয়ে কাটোয়ায় মাগঙ্গার ধারে এক বছর বাস করে এসেছে। টৌনের সাফাই কাম করেছে সৈকার বাবা! বুধনী ভি করেছে। জাত খোয়াইনি অন্যদের মত।

…তো সৈকা জওয়ানী হল। কত ছোকড়া পিছনে লাগল। সৈকা সব সময় হাতে ঘাস কাটা কাটারি নিয়ে ঘুরেছে। একদিন খরার মাসে দুপুর বেলা ওই খালে নেমে গা ধুচ্ছে। স্টেশনের এক খালাসী রামধন গিয়ে হামলা করেছিল। রামধনের হাত জখম করেছিল সৈকা। সৈকা ধরম জানত। তার কোন লোভ ছিল না। কত সাদাসিধে থাকত।

…একবার বাজারে কোন্‌ বাবু সৈকাকে খারাপ কথা বলেছিল। সৈকা চেঁচিয়ে হুলুস্থুল করে ফেলেছিল। সৈকাকে মনোহারি দোকানের কত বাবু সাবুন হিমানী পাওডারভি দিয়েছে। বলেছে, এমনি দিলুম। লিয়ে যা না রী! সৈকা ঘাড় বাঁকা করে ভুরু কুঁচকে বলেছে, কাহে গে! হ্যাঁ, সৈকা ধরমবাজ ছোকড়ি ছিল।

…তো হেমাংবাবু, তুমি মোক্তার বাবুর ভাতিজা আছ। তোমার পিসিভি খুব ভাল। তুমি ভি ভাল। বহৎ ধরমবাজ। তোমাকে কখনও দেখিনি এ তল্লাটে। সৈকা তোমার খুব নাম করত। আজ তুমি সৈকার বাত পুছ করতে এসেছ, হামার কত ভাল লাগছে বেটা!

বুধনী হু হু করে কাঁদে। সূর্য চলেছে ততক্ষণে। ছায়া কয়েক জোড়া লাইন পেরিয়ে গেছে। হেমাঙ্গ বলে, হুঁ, তারপর ?

বুড়ি চোখ মুছে ফের শুরু করে। কিন্তু গলার স্বর চাপা হয়ে যায়।

…ঝেন্টুয়ার সাথে ওবোসবাবুর ভাইপো ডন মুসহর বস্তীতে হামেসা আসে। খারাপ ছোকড়া সব। মালগাড়ির মাল লুঠত ওরা। রেলের কোন কোন লোকেরও সাট ছিল ওদের সঙ্গে। কোন কোন রাতে হাঙ্গামা ভি হত। বোমা বন্দুক হাল্লাবাজি। সব কিন্তু ভড়ং। পাহারাদাররা খামোকা গুলি ছুড়ত। হল্লা করত। তো ডনের চোখ পড়েছিল সৈকার দিকে।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, ডনের ? বল কী !

তেরা কিরিয়া বেটা ! বুড়ি হাত বাড়িয়ে ওর হাঁটু ছোঁয়।

হেমাঙ্গ বলে, তোমার এই কথাটা বিশ্বাস করতে পারছি না মাসি। ডনকে আমি চিনি।

বুড়ি প্রায় গর্জন করে ওঠে, তোরা বাবুরা একজাত আছিস। ও তো বলবি, হ মি জানি। লেকিন, ওই হারামী কুত্তা হামার সৈকার পিছে লেগেছিল।

বল কি !

হামি আপনা আঁখসে দেখেছে, আলগা টেরেনের কামরার কাছে ডন খাড়া আছে, ঔর সৈকাকে ডাকছে। বুদ্ধু ছোকড়া আনাড়ি বোকা। হাসছে। হাত ভি নেড়ে দিচ্ছে।

তাহলে বল, সৈকারও মত ছিল।

ক্যা ?

মানে, সৈকার ডনের সঙ্গে ভাব ছিল।

বুধনী জোরে মাথা দোলায়। তারপর অশ্লীল গাল দেয় ডনকে। তারপর বলে, ওবোসবাবুর কাছে নালিশ করতুম। সৈকা মানা করল। বলল, বস্তীমে আগ জ্বালা দেগা! চুপ থাক মা। তো একরোজ ডনের দিদি এলো। তখন ওকে সব বাত বললুম। বলল, ঠিক আছে।

হেমাঙ্গ চমকে ওঠে।—ডনের দিদি? কোথায় এলো?

এর জবাবে বুড়ি ফিসফিসিয়ে যা জানাল, হেমাঙ্গ শুনে থ। সে ভাবতেও পারে নি। অমির সঙ্গে সৈকার নাকি খুবই ভাব ছিল। অমি প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে এই বস্তীতে আসত ডনকে খোঁজার নাম করে। তারপর সৈকাকে ডেকে নিয়ে যেত তফাতে। কী সব বাত বলত। পরে বুধনীর চাপে সৈকা ব্যাপারটা জানিয়েছিল।

তো ভাতিজাবাবু, তুই জোগদিশবাবুকে পছানিস কি? হাঁ, বড়া টিশনবাবুর সাড়ু জোগদিশবাবু। জগা গে, জগা। মালুম পড়ছে না?

পড়ছে। মোহনপুর স্টেশনের প্রাক্তন এস এম নীলাম্বরবাবুর শ্যালক জগদীশকে হেমাঙ্গ বেশি রকম চিনত। কলেজ অব্দি একসঙ্গে পড়েছে। ফিজিকাল কালচারের আখড়া খুলছিল নীলাম্বরবাবুর কোয়ার্টারের পিছনে। পরে নীলাম্বরবাবু রিটায়ার করে এখানেই বাড়ি করেন। জগদীশ কেন কে জানে, ওঁর কাছে থেকে গেল। আখড়াও করল। মুগুর বৈঠক ডন, বারের এক্সারসাইজ, তার সঙ্গে পুরোদমে বক্সিং চলত। ডন ওকে গুরু বলত। ডনের সত্যিকার গুরু জগদীশ। পরে পুলিশের চাপেই নাকি আখড়া ভেঙে যায়। ওয়াগন ব্রেকিং আর ছোটখাটো রেল ডাকাতির পিছনে জগদীশেরই হাত ছিল। এর পর দেখা গেল জগদীশের নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। সে বেপাত্তা হয়ে গেল। নীলাম্বরবাবুর ফ্যামিলির ওপর জুলুম হল অকথ্য। কিন্তু আশ্চর্য, ডন এবং আরও কয়েকজনের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগল না। দেখা গেল, ডনরা জুটেছে, রাজনীতির এলাকায়। তখন বিধানসভার নির্বাচনী প্রচার চলছিল। হেমাঙ্গর মনে আছে, ডন নেতাদের জিপে ঘুরত সারাদিন। ভোটে তার মুরুব্বি জিতে গিয়েছিল। তারপর ডনের গায়ে হাত দেয় কে! সে নিজেই ওই বয়সে গুরু হয়ে উঠেছিল।

জগদীশের নাম পরে জগা মস্তান হয়ে যায়। মোটামুটি পাস করতে পারার মত মুখস্তশক্তি ছিল। সেই জগা নাকি স্টেনগান নিয়ে পুলিশের সঙ্গে লড়ত। একবার ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে তাকে স্টেশনে

হামলা করতে দেখেছিল হেমাঙ্গ। দৃশ্যটা এত অবাস্তব লেগেছিল। সেই জগদীশের এ কী চেহারা! গুজব শোনা যেত, অজস্র বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র নাকি জগার কাছে আছে। বাঙলাদেশ স্বাধীন হবার সময় কী ভাবে এনেছে। হেমাঙ্গদের সঙ্গে আর তার দেখা হত না বললেই চলে। দেখতে পেলেও হেমাঙ্গ এড়িয়ে যেত। তার জানতে ইচ্ছে করত, সত্যি বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জগদীশ কি যোগ দিয়েছিল? না সবটাই হিরো বনবার ফিকির? অবশ্য কথায় কথায় অমি একদিন বলেছিল, জগাদারা কুষ্টিয়ার ওদিকে ফাইট করতে গেছে। ডনকে ডেকেছিল। যায়নি। আমিই যেতে দিইনি।

হেমাঙ্গ জানত, অমির এটা স্রেফ মিথ্যে। ডন তার কথা শোনার পাত্র নয়। কিন্তু অমির মুখে জগাদা শুনে কী যে খারাপ লেগেছিল!···

তো জোগদিশবাবুর নামে হুলিয়া হয়েছিল। ই ভি মালুম পড়বে, বেটা?

হেমাঙ্গ মাথা নাড়ে। ভেতরে তীব্র কৌতূহল চনমন করছে। জগদীশের আজ তিন বছর কোন পাত্তা নেই। তার কথা লোকে ভুলে বসেছে।

বুধনী বহরী এদিক ওদিক দেখে ফিসফিস করে বলে, জোগদিশ-বাবু হামাদের বস্তীমে কভি কভি আনাযানা করত। সাঁঝমে, কভি রাতমে। সৈকার মালুম ছিল। বলত, আ রী মা! আভি জোগদিশবাবু আস্‌লো। ঝোণ্টুয়ার সাথে হুঁয়া পর শ্মশানমে বাত করলো। হামি বলত, সাচ বেটি!···হাঁ রী মা! তেরা কিরিয়া। ঠাকুরবাবা কী কিরিয়া।

তারপর একরাতে সৈকা তার মাকে জানায়, ডনবাবুর দিদির সঙ্গে জোগদিশবাবু এইখানে, ঠিক এই খালের ধারে এই জঙ্গলের মধ্যে বসে বাত করছিল। সৈকা পাহারা দিচ্ছিল। তারপর···

বলে বুধনী বহরী হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। অই, অই করে ওঠে! তার মানে, কী কাজ বাকি রেখে এসেছিল। এতক্ষণে মনে পড়ে

গেছে। নড়বড় করে সে প্রায় দৌড়য়। চিলচ্যাঁচানি চেঁচিয়ে বলে, আ রী কিসমতিয়া-আ-আ! কিসমতিয়া রী-ই-ই-ই।

বিকেলের রঙ ঘন হয়েছে। হেমাঙ্গ ওঠে! মাথার ভিতরটা ভোঁ ভোঁ করে। বুধনী বহরী তার আধচেনা এবং এড়িয়ে থাকা মোহনপুরের অন্য একটা জীবন টের পাইয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে অমির যেন সম্পর্ক ছিল। অমিকে নতুন এবং একটু কুশ্রী লাগছে। অমিকে কি সে দেবী ভেবেছিল এতকাল? তাও তো নয়! কিন্তু অমি ডনেরই দিদি। হেমাঙ্গ এই সত্যি কথাটা এমন করে ভুলে ছিল কী ভাবে?

হেমাঙ্গ সিগারেট ধরায়। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের দিকে চলে। তারপর সৈকার দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে অমিকে তার ভূতে পাওয়ার কথা। অদ্ভুত ভয়ে কেমন একটা অস্বস্তি জেগে ওঠে। বেলা পড়ে আসছে। আলো যত কমছে, অশরীরী সৈকার যেন আসার সময় হচ্ছে। হেমাঙ্গ সিগন্যাল পোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের ভয়ের সঙ্গে লড়াই করে। মনে মনে বলে, ও কিছু না। কিছু না। সব মনের ভুল। অন্ধ বিশ্বাস। ভূত-টুত কিচ্ছু নেই। সায়েন্স যা বলছে, তাই ঠিক। এই রেললাইন বানাবার শক্তিকে বিশ্বাস করব, না সৈকার অপশক্তিকে? সামনের সত্যিটাকে, না আড়ালের অনুমানটাকে?

তারপর হেমাঙ্গ নিজের যুক্তিহীন ছেলেমানুষী টের পেয়ে মনে মনে হাসে।

হেমা রে! এ্যাই হেমা—আ—আ!

বাজখাঁই গলার ডাক শুনে চমকে ডানদিকে, পশ্চিমে ঘোরে হেমাঙ্গ। খালের এ ধারে উঁচু গাছ নেই। শুধু ঝোপঝাড়। তার পারে বটতলার শ্মশান। একটা ঢিবিমত জায়গায় দাঁড়িয়ে শংকরা তাকে ডাকছে। দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। খুব হেসে হেসে ডাকছে ছেলেবেলার মত।

তাকে ঘুরতে দেখে শংকরা হাত নেড়ে হেসে হেসে ডাকে এখানে আয় রে হেমা! পালিয়ে আয় না শালা! সৈকা ঘাড় মটকে দেবে— হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা...

জটাজুটধারী শংকরা দু'হাতে তালি দিয়ে নেচে নেচে অট্টহাসি হাসে। হেমাঙ্গর মনে হয়, এই হাসিটা শিখতে শংকরাকে নিশ্চয় অনেক তান্ত্রিকের পিছনে ঘুরতে হয়েছে।

হেমাঙ্গ হন হন করে যে পথে এসেছিল, সেই পথে এগোয়। মুসহর বস্তীর ঘোড়ানিমের গাছের পাশটা ঘুরে কাঠের সাঁকো পেরোয়। তারপর খালের ধারে ধারে দক্ষিণে শ্মশানের দিকে হাটতে থাকে।

মানুষ কী ভাবে নানান্ ব্যাপার রপ্ত করে ফেলে ভাবা যায় না। দীনেশ নামে তার এক বন্ধু তুখোড় ফাজিল ছেলে ছিল। এখন হাই স্কুলে শিক্ষক। শিক্ষকের যা সব হাবভাব ভঙ্গী, প্রাণতা, চালচলন, সব কত দ্রুত আয়ত্ত করে নিয়েছে। নানান্ পেশা, নানা রকম জীবন। প্রত্যেকটার নিজস্ব আলাদা ব্যাপার আছে। আলাদা চরিত্র আছে। ফলওয়ালার ভাবভঙ্গী কথা বলা এক রকম, মুদীর অন্য রকম। হেমাঙ্গ মুদী হলে তাকে মুদীর ওই বৈশিষ্ট্যগুলো ভূতে পাওয়ার মতই পেয়ে বসবে। দীনেশ যদি ব্যাঙ্কের কাউণ্টার ক্লার্ক হয়ে যায়, তার ভাবভঙ্গী বদলে তো যাবেই। ঠিক একই নিয়মে শংকরা এক রকম ছিল, এখন অন্য রকম। সাধু সন্ন্যাসীদের পৃথক বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁটিয়ে রপ্ত করে নিয়েছে, কিংবা ওই ভূতে পাওয়ার মত সেগুলো পেয়ে বসেছে তাকে!

হয়তো এ সব চেষ্ট করে শিখতে হয় না। হেমাঙ্গ সন্ন্যাসী হয়ে গেলে আপনা-আপনি শেখা হয়ে যেত সন্ন্যাসীর হাবভাব, বাকভঙ্গী, হাঁটাচলা। কিংবা চিরকালের বাঁধা-ধরা সন্ন্যাসী-আদল ভূতের মত তাকে পেয়ে বসত।

যেমন করে অমিকে পেয়েছে সৈকা। অমি যখনই সৈকা হয়ে যাচ্ছে, আর এতটুকু অমি থাকছে না। হেমাঙ্গর মন খারাপ হয়ে গেল। তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত নিজস্বতা বলতে কিচ্ছু নেই!

জলের মত নিরাকার সে? যে পাত্রে ঢালা হয় তাকে সেই পাত্রের আকার ধারণ করে।

দক্ষিণ পশ্চিমে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া মাঠের ওপর অবেলায় ঘূর্ণি চলেছে আপন মনে। এতদূর থেকে দেখা যায় খড়কুটো উড়ছে, ঘুরছে অনেকটা উঁচুতে। শ্মশানতলার আশপাশটায় ক্ষয়া-খর্‌টে ঝোপঝাড় অজস্র। এখনও চাষবাসের সাহস করেনি কেউ এদিকের পোড়ো জমিগুলোতে। একবার নন্দীবাবুরা কোন মিলের জন্যে কালেক্টারি থেকে লিজ নেবে বলে ব্যস্ত হয়েছিল। পরে ভেস্তে যায়। স্বপ্নে শাসিয়েছিল দেবতারা। তাছাড়া এই বটগাছে নাকি অনেক ব্রহ্মদৈত্যের বাস। রাতদুপুরে তুমুল ঝগড়া বাধালে কোন এক ভৈরববাবাজী নাকি ওঁং হাঁক মেরে চুপ করিয়ে দেন। মুনাপিসি হেসে বলেছিল ওরে, এঞ্জিন। ওটা এঞ্জিনের হুইশেল। যুদ্ধের সময় ইউ এস এ মার্কা ইঞ্জিনগুলো যাতায়াত শুরু করল। রাত-বিরেতে ওই রকম স্টিমারের মত ভোঁ শুনে লোকে ওসব রটিয়েছিল।

শংকরা রিসিভ করার ভঙ্গীতে এসে হেমাঙ্গকে বলে, আগচ্ছ, আগচ্ছ বৎস। তারপর হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা!

তেমনি বেটে হয়ে আছে। তবে গায়ে অতি অল্পমাত্রায় মাংস লেগেছে। গা তেমনি নোংরা। দাড়িতে কখন খাওয়ার এঁটো লেগে আছে। পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি পরেছে এখন। হেমাঙ্গ আগে কোমরে ঝুলন্ত সৈকার হাঁটুর হাড়টা খোঁজে। দেখতে পায় না। হাতে ছোট্ট ত্রিশূলটাও নেই। হেমাঙ্গ বলে, সেদিন ওই গোলমালে তোর সঙ্গে কথা বলা হল না। যা কাণ্ড!

শংকরা বলে, আয় বে শালা। তোকে একটা চুমো খাই!

হেমাঙ্গ আঁতকে উঠে পিছিয়ে যায়।—থাক বাবা। মুখে বললে এই যথেষ্ট।

ভয় পেয়ে গেছে! হেমা ভয় পেয়ে গেছে!… বলে হাসতে হাসতে শংকরা বটতলায় তার ঝোপড়ির দিকে পা বাড়ায়। ঘুরে দেখেও একবার, হেমাঙ্গ আসছে নাকি। আসছে।

এখনই বটতলায় ছমছম করছে অন্ধকারবর্ণ ছায়া। আজকাল আর তত বেশী পাখি নেই। ঘন সবুজ চিকন কচি পাতা ঝকমক করছে বিশাল গাছটা জুড়ে। বসন্ত শেষ হয়ে এলো। দূরে কোথাও ক্ষীণ ও নাকিস্বরে যেন একবার কোকিল ডাকল। হেমাঙ্গ ঝোপড়ির দিকে তাকায়। ছেঁড়া তেরপল, চট, কোঙা-পাতা, এ সব দিয়ে চাল বানিয়েছে শংকরা। গাছের ডাল আড়াআড়ি পুঁতে চমৎকার দেয়ালের ফ্রেম করেছে, কোঙাপাতা আর ছেঁড়া লেপ তোষকের দেয়াল। ভেতরটা অন্ধকার ঘুপটি। এর মধ্যে থাকে কী ভাবে শংকরা? সে ভেবেই পায় না।

ফোঁকরের সামনে একটা অগ্নিকুণ্ড। নিভে আছে হয়তো। একটা মাটির ঢিবির ওপর ত্রিশূলটা পোঁতা। এবং যথারীতি একটা মড়ার মাথা। সিঁদুর চবচব করছে কপালে। ফোঁকরের মধ্যে একটা পেতলের সরা আর কমণ্ডলু।

শংকরা আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে বলে, বস্ বে হেমা, বস্। সিগ্রেট দে, টানি।

হেমাঙ্গ একটু তফাতে শুকনো ঘাসে বসে পড়ে। সিগ্রেট দেয়। শংকরা সিগ্রেট নিয়ে হাত বাড়িয়ে ঝোপড়ির দেয়ালে গোঁজা চিমটে তোলে। অগ্নিকুণ্ডে ফুঁ দিয়ে অঙ্গার বের করে এবং চিমটের সাহায্যে সিগ্রেটটা ধরায়। তারপর একটা প্রচণ্ড টান টেনে ধুঁয়ো ছাড়ে। একটুও কাসে না! চোখ নাচিয়ে বলে, পারবি?

হেমাঙ্গ মাথা দোলায়!—না রে! তুই নিশ্চয় ছিলিম টানিস?

হুঁ, হুঁ বাবা। থাম না। তোকেও টানাচ্ছি। আজ লাল্লু মিয়া দারুণ জিনিস দিয়ে গেছে মাইরি!

লাল্লু মিয়া? সে কে রে?

ইঞ্জিনে থাকে। সিটি মারে, উ-উ-উ উক্! ভক্ ভক্ ভক্ ভক্···

শংকরা!

কী বে শালা?

বাড়ির কথা মনে পড়ে না? বাবা মা'র কথা?

শংকরা ওপরে চোখ তুলে বলে ঔং তারাত্তারাত্তারাত্তারা…ঔং ঔং ঔং! তারপর মাথা কাত করে হেমাঙ্গর দিকে তাকিয়ে কেমন হাসে।—শুনতে পেলি কিছু?

কী শুনব?

ব্রহ্মাণ্ডের নাভিস্থলে প্রকম্পন উঠল টের পেলিনে? ভূমিকম্প রে, ভূমিকম্প!

অগত্যা হেমাঙ্গ হেসে বলে, হ্যাঁ, মাটি কাঁপছিল বটে।

অমনি শংকরা খুশী।—তোকে ডাকলুম যখন, একটা জিনিস দেখাই।…বলে সিগ্রেটটা ব্যস্ত ভাবে ঘষে নেভায় সে। জটায় গুঁজে রাখে। তারপর চোখ নাচিয়ে বলে, কাকেও বলিসনে। বললে মারা পড়বি, সাবধান। সে এদিক ওদিক দেখে নেয়। তারপর ফের চাপা গলায় বলে, এই মুণ্ডুটা। দেখছিস?

হ্যাঁ। কোথায় পেলি?

পেয়েছি। মুণ্ডুটা কার জানিস?

কেমন করে জানব? সৈকার নাকি?

হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা হেসে শংকরা চোখে ঝিলিক তুলে বলে, শালা নাবালক রে! মাগী না মিন্‌সে, তাও বোঝে না। কত প্রকাণ্ড দেখছিস না? ব্রহ্মাণ্ডের এক অণ্ড, সহজ কথা নয়।

হেমাঙ্গ কৌতূহলী হয়ে পড়ে। বলে, পুরুষ মানুষের মুণ্ডু? কোথায় পেলি?

তুই আমার পীরিতের নাগর রে! অত বলব না। ইস্! এক্ষুনি আমাকে হাতকড়া পরাক!

হেমাঙ্গ চমকে ওঠে তক্ষুণি। বলে, কেন শংকরা? কে তোকে হাতকড়া পরাবে? আহা, বল না বাবা খুলে। এই নে, তোকে ছিলিমের দাম দিচ্ছি।

এক টাকার নোটটার দিকে তাকিয়ে শংকরা বলে, দিলি তো আরেকটা দে। সাগরেদরা আসবে। সবাইকে খাওয়াতে হবে তো? একভরি হবে।

হেমাঙ্গ পকেট হাতড়ে দু'টাকাই দেয়। সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। দম আটকে যায়, এমন উত্তেজনা কাঁপতে থাকে। সে বলে, বল্ এবার ?

শংকরা ঝুঁকে পড়ে তার দিকে। চাপা গলায় বলে, জগার। বুঝলি, জগা শালার মুণ্ডু।

হেমাঙ্গ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, ভ্যাট্! অসম্ভব !

চো-ওপ্ শালা! গলা ফেড়ে দেব ! শংকরা গর্জায়। তারপর চাপা গলায় বলে, ওখানটার মাটি দেখছিস ? ওখানে পুঁতেছিল জগাকে। বুঝলি ? ডনরা জগাকে মেরে পুঁতে রেখেছিল। সাতদিন পরে আমি মুণ্ডুটা তুলে আনলুম। জাগালুম। একটু বোস্ না, এলি যখন। আঁধার হলেই জগার মুণ্ডু জাগবে দেখবি। জাগ জাগ জাগ জাগর ঘিনা···জাগ জাগ জাগ জাগর ঘিনা···

॥ পাঁচ ॥

মোটমাট তিনটে টাকা খরচ করে হেমাঙ্গ যেন রহস্য সিরিজের একটা বই কিনে ফেলেছে। পড়েছে এবং নেশা ধরে গেছে। মনের মধ্যে সারাক্ষণ ওই রহস্যের ছমছমানি। কিন্তু আতঙ্কও কম নয়।

সকালে বাজারে দেখা হল প্রমথবাবুর সঙ্গে। কাঁধে হাত রেখে বলেন, কি হে! একদিন দেখা দিয়েই ডুমুরের ফুল হয়ে গেলে যে? আসছ না কেন? তারপর গলা একটু চেপে জিজ্ঞেস করেন, ডন কিছু বলে-টলেনি তো?

হেমাঙ্গ অপ্রস্তুত হেসে বলে, না না। ডনের সঙ্গে আমার আর দেখাই হয়নি। অমি কেমন আছে জ্যাঠামশাই?

প্রমথ কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে দু'হাত সামনে চিতিয়ে বলেন, ওর আর কি! হিস্টিরিয়া পেসেন্ট যেমন থাকে! এই ভাল, এই ফিট। ইদানিং আবার ফিট ভাঙছে তো জিভ ওপরের তালুতে সেঁটে থাকছিল। খাওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অবিনাশ একটা ওষুধ দিল। জিভে দিলে চট করে শব্দ হয়। ছেড়ে যায়। তার সঙ্গে আরেক উপসর্গ শুনলুম আজ। মাথার ভেতর জ্বালা করছে বলল।

ভিড় থেকে একটু তফাতে নিয়ে যান হেমাঙ্গকে, ফের বলেন, আমি এক সময় একটু আধটু হোমিওপ্যাথির চর্চা করতুম, বুঝলে? জাস্ট সখ। ফের বইপত্তর বের করে পড়া শুরু করেছি। দেখলুম প্রথম অবস্থায় ইগ্নেশিয়া মোক্ষম। এইমাত্র একডোজ থাউজেণ্ড এক্স দিয়ে এসেছি। দেখা যাক। তবে কি জানো, হিষ্টিরিয়া স্রেফ মানসিক ব্যাধি।

হেমাঙ্গ বলে, মনে হয়।

মনে হয় না, ছাটস দা ট্রুথ। প্রমথ জোর দিয়ে বলেন, অনেক দিন ধরে দুঃখ কষ্ট চেপে রাখলে এই রোগটা হয়। নিছক মেয়েলি

রোগ। অমিকে অবশ্য আমরা বাবা-মার দুঃখ জানতে দিইনি। কিন্তু আফটার অল তাতে কি মন ভরে হে? ভরে না। প্রমথ মাথা দোলান।

হেমাঙ্গ বলে, কিন্তু সৈকার মত কথা বলছে কেন?

প্রমথ একটু হাসেন। এটা তলিয়ে ভাবলেই বুঝবে। সম্ভবত সৈকার ডেড বডি দেখেছিল। খুব আতঙ্ক হয়েছিল। আতঙ্কটাও চাপা থেকে থেকে এতদিনে এক্সপ্লোড করেছে। তুমি তো ভালই জানো, ইয়ে মানে দেখেছ তো বটে! ভীষণ চাপা মেয়ে বরাবর। তাই না?

হেমাঙ্গ মাটির দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ। তবে কথাও তো বলে প্রচুর। একেবারে চাপা বলা যায় না অমিকে।

প্রমথ মাথা দুলিয়ে বলেন, উঁহু। আমি ডিফার করব। আজ অব্দি মন খুলে কথা বলেছে অমি, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। জাস্ট মিনু-ইলুদের সঙ্গে কম্পেয়ার কর। তাহলেই বুঝবে। তাছাড়া তুমি হয়তো জানো না, ও প্রায় লুকিয়ে-লুকিয়ে কান্নাকাটি করত ইদানিং। ইলু দেখেছে। ওর জেঠিমা সাধাসাধি করত। ডন বকেছে নাকি! বলত, কাঁদিনি তো। ইলু মিথ্যে বলেছে। অথচ আমি নিজে……

প্রমথ হঠাৎ থেমে যান। তুমি ও বেলা এসো। বলব সব কথা। এসো কিন্তু!

হেমাঙ্গ ঘাড় নাড়ে। প্রমথ ভিড়ে কেনাকাটায় ব্যস্ত হন। হেমাঙ্গও কিনতে ঢোকে। মুনাপিসি পোস্ত আনতে বলেছে। নিবারণ মুদির দোকানে যায় সে।

আমি লুকিয়ে কাঁদত কেন? জগদীশের জন্যেই তো! হেমাঙ্গর মনে একটা অসহায় ক্ষোভ গরগর করে উঠেই চাপা পড়ে। অমি তাহলে হেমাঙ্গর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে এসেছে এতকাল। অমিকে তার ঘৃণা করা উচিত।

অথচ ঘৃণা করারও যে শক্তি থাকা দরকার, তা তার নেই। বাড়ি ফেরার পথে মন শেষ অব্দি নরম সুরে বাজে। বেচারা বোকা মেয়ে!

লেখাপড়া শিখলেও অনেকে যেন কিছু প্রিমিটিভ ব্যাপার মন থেকে নষ্ট করতে পারে না। যেমন পারেনি জগদীশ। অমিও পারেনি। মনের মধ্যে যেন একটা অন্ধ বুনো ঘোড়া নিয়ে ঘুরছে। শিক্ষা সহবত সভ্যতার ওপর লাথি মারতে মারতে সেই ঘোড়া তাকে বিদিশ করে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। খাদে গিয়ে পড়ে কোন এক সময়। পড়বেই।...

বাড়ি ফিরে হেমাঙ্গ অবাক হয়। হুলো এসে মুনাপিসির সঙ্গে জাঁকিয়ে গল্প করছে। হুলোকে মুনাপিসি ভয়ে একটু বেশি বেশি খাতির করে ফেলে। হুলো একটা কিছু খেয়েছে মনে হচ্ছে। পাশে বাটি পড়ে আছে। মুনাপিসির মুখে হাসি, কিন্তু চাহনিতে অস্বস্তি স্পষ্ট। হেমাঙ্গ বলে, কী রে?

হুলো তাকে দেখে একগাল হেসে বলে, বাজারে ছিলে হেমাদা! আমি কত খুঁজলুম। তারপর চলে এলুম।

হেমাঙ্গ বাজারের থলে মুনাপিসিকে দিয়ে বলে, পোস্ত আমি খাব না কিন্তু।

দেখা যাবে। লাল ঝরলে দেব মুখে জল ছড়িয়ে। বলে মুনাপিসি রান্নাঘরের দিকে যায়। সেখান থেকে ফের বলে, হুলো কি বলছে শোন না বাবা। কতক্ষণ এসে বসে আছে।

কি বলছিস রে হুলো?

হুলো বলে, সৈকার ভূতের গল্প শোনাচ্ছিলুম হেমাদা। পিসিমা মাইরি ঠকঠক করে কাঁপছিল। দেখবে আজ সন্ধ্যেবেলা আর ঘর থেকে বেরুতে পারবে না। মুনাপিসি রান্নাঘর থেকে নোড়া তুলে বলে, দাঁত ভেঙে দেব, হুলো।

হেমাঙ্গ ডাকে, আয়। কি বলছিস শুনি।

হেমাঙ্গ বাইরের ঘরেই নিয়ে যায় ওকে। মনে তীব্র কৌতূহল। হুলো কী বলতে এসেছে কে জানে। ছেলেটার এই এক ব্যাপার, দূতের কাজও করতে ওস্তাদ। শুধু ছিঁচকেমি এবং হাতসাফাইটা না থাকত ওর! এবং যদি ডনদের সংসর্গ ছেড়ে দিত! এমনিতে

খুব বাধ্য অনুগত ছেলে। কাজের ভার দিলে তা না করে ছাড়বে না।

ঘরে ঢুকে হুলো পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে বলে, অমিদি দিল। বলল, চুপি চুপি দিবি। আমি চুপি চুপি দিলুম। এবার চলি। টা টা করে দাও।

কাগজটা নিয়ে ভাঁজ খুলতে খুলতে হেমাঙ্গ বলে, না। একটু দাঁড়া।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয় হেমাঙ্গ। তার হাত কাঁপে চিঠিটা পড়তে। উরু অবশ হয়ে যায়। অমি জীবনে তাকে একবারও চিঠি লেখেনি। লেখার দরকারই বা কি ছিল! এই তার প্রথম চিঠি। হেমাঙ্গ টের পায়, সে আসলে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

'...হেমাদা, আজ বিকেলে একবার আসবে দয়া করে? আমি আমার ঘরে শুয়ে থাকব। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। তুমি বাড়ি ঢুকে বলবে, অমি কেমন আছে এবং সোজা ওপরে চলে আসবে। অসুবিধে হবে না। এসো কিন্তু। প্রণাম নিও।—অমি।'

প্রণাম শব্দটার দিকে হেমাঙ্গ তাকিয়ে থাকে। তারপর হুলো তাকে লক্ষ্য করছে টের পেয়ে চিঠিটা দ্রুত ভাজ করে বলে, অমি দিল?

আবার কে দেবে? অমিদির চিঠি না?

হুঁ। ডন কোথায় রে?

ডনদা নেই। রাতের ট্রেনে কলকাতা গেছে।

সত্যি কলকাতা, না অন্য কোথাও?

না গো, কলকাতা! এক শালা পার্টি এসেছিল। নিয়ে গেছে।

একা গেছে?

তাই যায়? ঝেন্টু গেছে। ইদ্রিস গেছে। মনু গেছে। আরও কে কে যেন গেছে।

কী ব্যাপার রে? খুব জমজমাট কারবার মনে হচ্ছে।

ছুলো নির্বিকার মুখে বলে, হুঁউ। কাজ খুব বড়।

তুই গেলিনে যে?

বাইরে আমাকে নিয়ে যায়? আমি যাবই বা কেন?

হুঁ, যাসনে। তা কবে ফিরবে ওরা?

আজ রাতে দশটা ছত্রিশে ফিরতে পারে নয়তো কাল রাত একটার আগে। আমাকে থাকতে বলেছে। থাকব। আমার কি?...হঠাৎ ছুলো দেয়ালের তাকে একটা ছোট্ট হাতুড়ি দেখিয়ে বলে, তখন থেকে দেখছি, আর ভাবছি হেমাদা টিপস্ পেলে কোথায়। পেলে যদি, ওখানে অমন করে রাখলেই বা কেন?

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, বলিস কি! টিপ্‌স মানে?

হাতের আঙুলে রিভলবাবের নল বানিয়ে ট্রিগার টেপার ভঙ্গী করে ছুলো। এসব সময় সে একেবারে বাচ্চা। হি হি করে হাসে। তারপর বলে, ডনদারটা সাদা চকচকে। এত্তো বড়। ছ'টা গুলি থাকে। চীনে টিপস্ নাকি। হেমাদা, তুমি একটা টিপ্‌স্ রাখ না কেন গো?

ধুর বোকা! আমি ও সব কী করব?

আজকাল কতজনের কাছে আছে।...ছুলো গলা চেপে ফের বলে, ভেল্টুবাবুর বাড়িতে পাইপগান আছে একগাদা। কাউকে বললে আমার গলা কেটে দেবে। যাই!

হেমাঙ্গ ওর কাঁধে হাত রেখে বলে, শোন্ একটা কথা। তুই এমন করে যার তার সামনে এ সব কথা বলে বেড়াসনে কিন্তু। তোকে ওরা বিশ্বাস করে। যদি টের পায় যে তুই কাকেও বলেছিস এবং তাতে ওরা বিপদে পড়েছে, তোর প্রাণ যাবে। বুঝলি তো?

ছুলো হাসে।—মাথা খারাপ হেমাদা? তুমি আর অমিদির কথা আলাদা। তোমরা সাপোর্টার। তোমাদের বললে ক্ষতি নেই। চলি গো হেমাদা!

ছুলো ঠিক ছুলো বেড়ালের মত লাফ দিয়ে চলে যায়। হেমাঙ্গর

মাথায় ওর সাপোর্টার শব্দটা কতক্ষণ খোঁচা মারে। হুলো আসলে ধুরন্ধর। সে হেমাঙ্গকে বুঝতে পেরেছে, কিংবা অমির সঙ্গে হেমাদার সম্পর্ক আছে দেখেই তাকে ডনদের সাপোর্টার ভাবে।

হেমাঙ্গ আনমনে চিঠিটা আবার খোলে। বিছানায় শুয়ে আবার পড়ে। বার বার পড়ে। 'দুর্জনের ছলের অভাব হয় না,' কিন্তু দুর্জন কে? নিশ্চয় অমি তাকে দুর্জন বলেনি, বলেছে হয়তো নিজেকেই। তাহলেও দুর্জন শব্দটা ওর মাথায় এলো কেন? চিঠির মধ্যে এই লাইনটা আচমকা কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে যেন। অমির স্নায়ুকেন্দ্রে কিছু একটা ঘটেছে। তারই প্রমাণ।

প্রায় আধঘণ্টার বেশি কাটিয়ে দেয় হেমাঙ্গ। এলোমেলো ভেবে মন খারাপের একশেষ করে। তারপর অমির 'প্রণাম' তাকে শান্ত করে দেয়। ঘুমপাড়ানি গানের মত। অমি তাকে কোন দিন প্রণাম করেনি। অমির মত মেয়েকে সে প্রণত ভাবতে গিয়ে দৃশ্যটা অবিকল দেখতে পায় এবং গভীর তৃপ্তিতে একটা নিশ্বাস ফেলে। ঝড় থেমে যায়।

বিকেলে হেমাঙ্গ যখন বেরুবে বলে তৈরি হচ্ছে, বাইরে শংকরার গর্জন শোনা গেল। জানালার পর্দা একটু ফাঁক করে হেমাঙ্গ দেখল, শংকরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে কটমট করে। ঠোঁট কাঁপছে। বিড়বিড় করে কিছু বলছে। এ সময় এক আপদ বটে।

হেমাঙ্গ চুপচাপ ভেতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মুনাপিসিকে ওঠায়। সে তার ঘরে শুয়ে পুরনো বাঁধানো পত্রিকা পড়ছিল। শংকরার নাম শুনে বিরক্ত হলেও শেষ অব্দি পত্রিকা রেখে বেরুল আর হেমাঙ্গ কেটে পড়ল খিড়কি দিয়ে।

ঝোপঝাড় ভেঙে অনেকটা ঘুরে হেমাঙ্গ রাস্তায় পৌঁছয়। তারপর আস্তেসুস্থে হাঁটতে থাকে। অমি তাকে কি বলবে না বলবে তাই নিয়ে আর এতটুকু ভাবে না। উদ্বেগ বোধ করে না। শুধু

হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, কথা বলতে বলতে যদি হুট করে সৈকা জেগে উঠে তাকে আবার চড় মারে, তাহলে কী করবে। হুঁ, তৈরি থাকবে সারাক্ষণ। নজর রাখবে অমির চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটেছে কি না। এবং কাছাকাছি বসবে না।

একটু দূর থেকে বোসবাড়ির রোয়াকে প্রমথকে দেখামাত্র তার মনে পড়ে, সকালে বাজারে প্রমথও তাকে আসতে বলেছিলেন। এ একটা মুশকিলের কথা বটে!

প্রমথ গাছপালার ফাঁকে হেমাঙ্গকে দেখতে পেয়ে নড়েচড়ে বসেছেন। হেমাঙ্গ বাগানের গেট খুলে দেখল ইলু আর মিলু ফুলগাছে জল দিচ্ছে। ওদের বাড়ির ঝি মেয়েটি বালতি করে জল আনছে। হেমাঙ্গকে দেখে দুই বোন হেসে অস্থির। ইলু ইশারায় ওপরের দিকে দেখিয়ে চাপা গলায় বলে, সাবধান হেমাদা, সৈকা ইজ রেডি। মিলু বলে, ভেবো না আমরা তোমাকে গার্ড দেব।

প্রমথ নিঃশব্দে হাসছিলেন। একটু সরে বসে রোয়াকে থাপ্পড় মেরে বলেন, এসো হে, বসো।

হেমাঙ্গ প্রায় চোখ বুজে বলে, আসছি জ্যাঠামশাই। অমিকে একবার দেখে আসি আগে।

হ্যাঁ। তাই দেখে এসো বরং। প্রমথ তখুনি অনুমতি দেওয়ার ভঙ্গীতে বলেন। আজ অমি আগের চেয়ে অনেকটা ভাল। ইগ্নেশিয়া থাউজেণ্ডে কাজ হয়েছে, বুঝলে? তবে মাথা ঘোরা আর মাথার মধ্যে জ্বালা করাটা যাচ্ছে না। দেরী হবে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা লংটার্ম প্রসেস তো। হুঁ, যাও। ঘুরে এসো। ও ওপরে শুয়ে আছে। চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলেছি। তুমি যাও। ফিরে এলে দুজনে এখানে বসে চা খাব।

হেমাঙ্গ ড্রয়িংরুম দিয়ে বাড়ির ভেতরে যায়। টুলুর ঘরের দরজা বন্ধ। বাড়ি ফাঁকা। সুলোচনা নেই মনে হচ্ছে। হেমাঙ্গ ঝটপট সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে। ডন আর ইলুদের ঘরের মাঝের সেই ছোট্ট ঘরের দরজায় অমি তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে হাসি নেই।

হেমাঙ্গ হাসলেও সে হাসে না। দরজা ছেড়ে ভেতরে যায়। হেমাঙ্গ ঢুকতে গিয়ে টের পায় সে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

বস। বলে অমি জানালার কাছে যায়। মেঝেয় বিছানা পাতা। কোণার দিকে জানালার কপাটে হেলান দিয়ে হাঁটু দুটো ভাঁজ করে সে বসে। দুটো হাত হাঁটু বেড় দিয়ে আঙুলে আঙুল আটকে বলে, সিগ্রেট খেতে পারো। ওই যে এ্যাসট্রে।

এ বাড়ির কর্ত্রী সিগারেটের ছাই দেখলে চটে যান হেমাঙ্গ জানে। কিন্তু সে খুশি হয়, অমি তার জন্যে ডনের সুদৃশ্য এ্যাসট্রেটা এনে রেখেছে দেখে। সে বলে, বুলু চলে গেছে নাকি? কাকেও দেখলাম না নীচে।

অমি জবাব দেয়, জামাইবাবু এসেছিল কাল। নিয়ে গেছে।

তোমার জেঠিমাও তো নেই। টুলুদির ঘর বন্ধ।

মা-মেয়ে মাণিকজোড়ের মত বেরিয়েছে। রিক্‌শোয় গেল বলে মনে হচ্ছিল। শুয়ে ছিলুম। কানে এলো।

খুব দুর্বল বোধ করছ মনে হচ্ছে?

অমি মাথা একটু দোলায়।—বিশ্রী মাথা ঘোরে হঠাৎ। এখন ঘুরছে না।

আমার কথা থাক। তুমি কেমন আছ?

হেমাঙ্গ সিগারেট ধরায়। একটু হেসে বলে, ভীষণ ভাল। তারপর মুখ নামিয়ে খুব যত্নে ছাই ফেলার চেষ্টা করে এ্যাসট্রেতে।

এই, শোন।

হেমাঙ্গ প্রচণ্ড চমকায় সঙ্গে সঙ্গে। সে রাতে ঠিক এমনি করে ডেকেছিল অমি। তারপর সৈকার আবির্ভাব ঘটেছিল। সে মনে মনে আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হয়ে তাকায়। দেখে অমি কেমন ছলছল নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটোর দৃষ্টিতে কারুণ্য আছে।

অমি বলে, তোমাকে নাকি চড় মেরেছিলুম?

হেমাঙ্গ বলে যাঃ! ও কিছু না।

জেদের ভঙ্গীতে অমি বলে, না। সবাই বলেছে, আমি তোমাকে চড় মেরেছিলুম। আর তুমি পড়ে গিয়েছিলে। তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না হেমাদা? আমি তো কিছু জানিনে। আমার··· আমার কিচ্ছু···

তাকে হাঁফাতে দেখে হেমাঙ্গ বলে, কেন ও নিয়ে তুমি ভাবছ? খামোকা এক্সাইটেড হচ্ছই বা কেন?

বল, তুমি ক্ষমা করছ আমাকে?

অমি তার পা ছুঁতে হাত বাড়িয়ে একটু সরে আসে। হেমাঙ্গ তার হাতটা ধরে ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলে, বৎস, সব ক্ষমা করে দিলুম। তারপর সে দেরী না করে হাত ছেড়ে দেয়। হাসে।

অমি হাত সরিয়ে নিয়ে আগের ভঙ্গীতে বসে থাকে। কিছুক্ষণ কথা বলে না। ভুরু কুঁচকে কিছু ভাবে। হেমাঙ্গ এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝতে পারে, অমির শরীর সত্যি ভীষণ দুর্বল এবং ওর চেহারায় তার ছাপ পড়েছে প্রচণ্ড রকমের। মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। হেমাঙ্গ আস্তে বলে, কেন ডেকেছিলে?

ক্ষমা চাইতে। আমি তো জানি না যে তোমাকে চড় মেরেছিলুম।

হেমাঙ্গ একটু দমে যায়, মনে মনে বলে, ধুর! ও সব কোন ব্যাপারই না। এর জন্যে নিশ্চয় তুমি প্রচুর মন খারাপ করেছ। একটা কথা বলি, শোন অমি। আমার ধারণা এখন তোমার মনে স্ফূর্তি থাকা দরকার। এ সব অসুখে···

কথা কেড়ে অমি বলে, কী সব অসুখে?

মানে এই হিস্টিরিয়া না কি। জ্যাঠামশাই বলছিলেন। ডাক্তারবাবু বলেছেন।

এবার অমি একটু হাসে।—আমাকে নাকি সৈকার ভূতে ধরেছে! শুনেছ তো?

হুঁ, শুনেছি। ওটা জাস্ট তোমার অসুখের একটা সিম্পটম। সাবকনসাসে সৈকার ব্যাপারটা ঢুকে বসে আছে। তারই কমপ্লেক্স।··· হেমাঙ্গ বিজ্ঞের ভঙ্গীতে এ সব কথা বলে।

অমি একটু নড়ে বসে। ঘোরে এদিকে।—আচ্ছা, শোন। আমি নাকি সৈকাদের ভাষায় কথা বলি। তুমি শুনেছ?

হেমাঙ্গ সমস্যায় পড়ে যায়। ভাবে, অমি অন্যের কাছে এটা শুনে নিশ্চয় বিশ্বাস করেনি। সে বললে বিশ্বাস করবে। তার ফলটা আরও খারাপ হতে পারে। তাই ভেবেচিন্তে সে মাথাটা জোরে দোলায়। বলে, নাঃ! তোমাকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা-তামাশা করে। তুমি ওদের ভাষা তো জানো না।

অমি জেদ ধরে বলে, আমি ওদের ভাষা জানি। তোমাকে বলিনি কখনো?

না তো। কোনদিন বলনি।

আমি সৈকার কাছে শুনে শুনে শিখে নিয়েছিলুম।

তাই বুঝি?...হেমাঙ্গ সৈকার সঙ্গে তুমি খুব মেলামেশা করতে বুঝি?

অমি মাথা দুলিয়ে বলে, ভীষণ।

বল কী!

ওকে আমার খুব ভাল লাগত, জানো? খুব সরল মনের মেয়ে, অথচ ইন্টেলিজেন্ট। শার্প। ও যদি মুসহর বস্তীতে না জন্মাত, দেখতে কী হত!

হেমাঙ্গ তামাশা করে বলে, ফিল্মস্টার তো নিশ্চয় হত। দেখতে খুব সুন্দর ছিল মনে পড়ছে।

অমি চোখ বুজে যেন শারীরিক কিছু অবস্থা সামলে নেয় কয়েক সেকেণ্ড। হেমাঙ্গ উদ্বিগ্ন হয়ে তাকায়। কিন্তু আবার চোখ খোলে অমি। তাকে স্বাভাবিক দেখায়। হেমাঙ্গ বলে, কী? অসুস্থ বোধ করছ নাকি? তাহলে শুয়ে পড়।

নাঃ। হঠাৎ-হঠাৎ মাথাটা ঘুরে ওঠে।

তাহলে শোও।

মাথা নাড়ে অমি।—ভ্যাট্। সারাদিন শুয়ে থাকা! ভাল্লাগে না। অথচ হাঁটাচলা করতে গেলেই মাথা ঘোরে। তাছাড়া জানো,

মাথার ভেতরটা একেক সময় মনে হয় ফুটবল গ্রাউণ্ড হয়ে গেছে।... আবার ম্লান হাসে সে। খালি মনে হয় একটা ফুটবল কিক করে নিয়ে বেড়াচ্ছে কে।

হেমাঙ্গ হেসে বলে, তাও রক্ষে। বাইশ জনের ত্বটো টিম নয়। রীতিমত ম্যাচ খেললে কী হত, ভেবেছ?

তুমি ভাবছ মিথ্যে বলছি?

হেমাঙ্গ দ্রুত অবস্থা সামলানোর ভঙ্গীতে বলে, নাঃ জাস্ট এ জোক করলুম।

সত্যি, আমার মাথার মধ্যে একটা গোল জিনিস, অবিকল ফুটবল ছোটাছুটি করে। তার পিছন পিছন ঠিক কোন প্লেয়ার দৌড়নোর শব্দ। অমি শান্ত হুঃখিত স্বরে বলতে থাকে।... কখনও মনে হয় কী জানো? বলটা মাথা থেকে নেমে গলার কাছে আটকে গেছে। কী বিশ্রী লাগে তখন। তারপর বলটা বুকে নেমে যায়। তখন নিশ্বাস আটকে যায়। পেট ফুলে ওঠে।

তুমি ডাক্তারকে বলেছ এসব কথা?

না। বলে কী হবে? আমি জানি, আর বাঁচব না।

অমি!

অমির চোখ ছলছল করছে। হেমাঙ্গর ইচ্ছে করে মুছিয়ে দেয়। সাহস হয় না। যদি হঠাৎ...। হেমাঙ্গ ফের বলে, কেন বাঁচবে না ভাবছ তুমি? হিস্টিরিয়া একটা সামান্য অসুখ। জ্যাঠামশাই বলছিলেন। এ অসুখ নাকি শতকরা পঁচাত্তরটি মেয়ের আছে। নিছক মানসিক কমপ্লেক্স! এক সময় তো আরও বেশি ছিল। মোহনপুরে নাকি ঘরে ঘরে ছিল। লোকেরা ভাবত ভূত-প্রেত। খুব অত্যাচার করা হত পেসেন্টদের ওপর।

হেমাঙ্গ একটু হেসে চাপা গলায় ফের বলে, জানো? বেশির ভাগ কেসের পিছনে থাকে সাপ্রেস্‌ড সেক্স, কিংবা ডিসকন্‌টেন্টেড সেক্স। তোমার কেসটা নিশ্চয় তাই নয়।

সে খিকখিক করে হাসে। হাসতে হাসতে সিগারেট এ্যাসট্রেতে

ঘষটে নেভায়। তারপর মুখ তুলে দেখে অমির ঠোঁটের কোণায় হাসি। ওর রুগ্ন ফ্যাকাসে গালে একটু রক্তের ছোপও এসেছে। মুখ অন্য দিকে ঘোরানো। এই ভঙ্গীটা খুব চেনা হেমাঙ্গর।

তারপর অমি বলে, ভ্যাট! তুমি কি সাইকোলজি পড়তে শুরু করেছ?

এখন না। এক সময় খুব পড়তুম। সেক্স সাইকোলজি দারুণ ইন্টারেস্টিং, জানো?

অমি কপট রাগ দেখিয়ে বলে, আমাকে একা পেয়ে খুব সেক্স শোনাচ্ছ!

হেমাঙ্গ দ্রুত বলে, তোমাকে অসংখ্যবার একা পেয়েছি। শোনাইনি।

অমি স্বাভাবিক হাসে।—এই! একবার বড়দিকে শুনিও না? দেখবে কী হয়।

টুলুদিকে! ওরে বাবা! হেমাঙ্গ আঁতকে ওঠার ভঙ্গী করে।

অমি ফিসফিস করে বলে, বড়দি আজকাল কী করছে জানো? পোস্টমাস্টারের মেয়ে রুবিকে চেনো তো?

অল্প চিনি।

রুবির সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছে। আজকাল প্রায়ই দেখি…

কথায় বাধা পড়ল। সিঁড়িতে শব্দ হচ্ছে। দুজনে ঘুরে তাকায়। ইলু দরজায় উঁকি মেরে বলে, হেমাদা! বাবা বললেন, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। এসো।

অমি চোখ পাকিয়ে বলে, বাবাকে বলগে, হেমাদা এখানে বসে চা খাবে।

হেমাঙ্গ জিভ কেটে বলে, এই! না, না। ছিঃ! ইলু, চল্ রে। যাচ্ছি।

ইলু চলে গেলে অমি বলে, তুমি বুড়োদের সঙ্গে অত মেশো কেন? এড়িয়ে থাকতে পারো না?

আমি বুড়োদের সঙ্গে মিশি?

হ্যাঁ। বরাবর দেখেছি, যত রাজ্যের বুড়োবুড়ির সঙ্গে তোমার

ভাব। আমার ধারণা, তোমার মধ্যে একজন ওল্ডম্যান আছে।

তাই নাকি? হেমাঙ্গ অবাক হবার ভান করে। ফের বলে, মধ্যে কেন, বাইরে অলরেডি চলে এসেছে সে। সেদিন দেখলুম, একটা চুল পেকে আছে।

অমি নিজের চুলে হাত রেখে বলে, সে আমার বেলায়। চিরুণীর ফাঁকে সাদা চুল দেখতে পাই। আমি জানি, আমি খুব শিগগির বুড়ি হয়ে যাচ্ছি। মেয়েরা তো কুড়িতেই বুড়ি। আর আমি এখন পঞ্চাশের কোঠায়। জবুথবু অবস্থা।

হেমাঙ্গ হাসে।—বয়স দ্বিগুণ করাও একটা মারাত্মক রোগ, জানো তো?

ভ্যাট! আমাকে তুমি বরাবর খুকী ভাবো, দেখেছি। কত উপদেশ যে দাও, মাঝে মাঝে মনে পড়ে আর রাগ হয়। হাসি।

সত্যি, আমি ভেবেই পাইনে, কোন কোন মেয়ে যৌবনে যোগিনী হয় কেন?

আবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। তারপর মিলু এসে ঢোকে। হাতে চায়ের কাপ প্লেট। মেঝেয় হেমাঙ্গর সামনে রেখে বলে, ছোড়দি, তোর দুধটা ঠাণ্ডা করতে দিয়েছে। এনে দেবে ঘণ্টার মা।

হেমাঙ্গ বলে অমি চা ছেড়ে দিয়েছ নাকি?

অমি বলে, কবে ধরলুম যে ছেড়ে দেব! তুমি খালি আমার সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা করতে পারো। বরাবর। কখনও চা খেতে দেখেছ আমাকে?

হেমাঙ্গ ঘাড় চুলকে কাঁচুমাচু মুখে বলে, ঠিক ঠিক। দেখিনি। তবে একদিন আমাদের বাড়িতে···

সে তোমার মুনাপিসির রিকোয়েস্টে। সত্যি, ভদ্রমহিলা কী যে মানুষ, ভাবা যায় না। হেমাদা, তুমি ভাগ্যবান। মিলু, আজ আমি একটু চা খাব রে।

আর নেই যে! দাঁড়াও, করে আনি।

হেমাঙ্গ বলে, থাক্। আর কষ্ট করতে হবে না। এটাই ভাগ করে খাই। একটা কাপ আনো। আমিও তেমন চা ভক্ত নই। জাস্ট খাই এইমাত্র।

অমি বলে, ঠিক আছে! হেমাদারটাই কেড়ে খাই। মিলু, কাপ আন রে। ডনের ঘরে আছে নাকি ছাখ।

মিলু ডনের ঘর থেকে কাপ এনে দেয়। খুব দামী কাপ। হেমাঙ্গ কাপটা দেখছে দেখে অমি বলে, ডন আজকাল আরও সৌখিন হয়েছে, জানো হেমাদা? ঘরখানা কী সাজিয়েছে, দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে। ভেতর ভেতর প্রেম-ট্রেম করছে কি না কে জানে!

মিলু বলে, দাঁড়াও ছোড়দি! ডনদা এলে বলে দিচ্ছি।

বলিস না। তোর ডনদা আমাকে কত ভয় পায়, মনে রেখে বলিস।

মিলু চলে যায় হাসতে হাসতে। হেমাঙ্গ আদ্ধেক চা ঢেলে অমিকে দেয়! অমি সত্যি বলেছে, ডন তার দিদিকে ভয় পায়। সামনা-সামনি কোন কথার প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারে না। এটাই অদ্ভুত যে, যে-মানুষ পরাক্রান্ত খুনী গুণ্ডা, সে তার কোন কোন আপনজনের কাছে স্নেহ প্রত্যাশী এবং ভীতু। অতি বড় খুনীও হাতের রক্ত মুছে সন্তানকে কোলে তুলে নেয়, কিংবা প্রেমিককে আলিঙ্গন করে। মানুষ এত জটিল খেই পাওয়া কঠিন।

হেমাদা! কী ভাবছ?

নাঃ। তোমাদের বাড়িতে কে চা করে বল তো? বরাবর একই টেস্ট। একই চা।

ডন তোমাকে শাসিয়েছিল। আমিও পাল্টা তাকে শাসিয়েছিলুম।

হঠাৎ কী কথা! হেমাঙ্গ বিব্রত বোধ করে। বলে, ও সব কথা থাক্ অমি। অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি। নষ্ট কর না ক্লাইমেটটা।

অমি গ্রাহ্য করে না। চাপা হেসে বলে, তোমাকেও শাসিয়ে-

ছিলুম। তারপর শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা জানালার একপাশে রাখে। জানালার তলাটা মেঝে থেকে মোটে ইঞ্চি তিনেক উঁচু। জোর হাওয়া আসছে। বাইরে বিকেল কখন ফুরিয়ে গেছে। ধূসরতা ঘনিয়েছে। ঘরে অবশ্য দিনের আলোর রেশ রয়েছে। কারণ পশ্চিমে বারান্দার দিকে আকাশটা খোলা। সেদিকে সূর্যাস্তের নীলচে রঙ সারা আকাশ জুড়ে। অমি ফের বলে, আমি দেখতে রোগা কিন্তু আমাকে সবাই ভয় পায়। এখন তো আরও বেশি করে পাচ্ছে। সৈকার ভূতের জন্যে।

হেমাঙ্গ হাসে।—হ্যাঁ, ভূতের কথা বল বরং। জমবে। তবে দোহাই তোমার, আচমকা ভূতটাকে এ আসরে হাজির করে দিও না?

হঠাৎ অমি দু' হাঁটুর ফাঁকে মাথা নামিয়ে দেয়। তারপর ওর পিঠটা কাঁপতে থাকে। চুলগুলো পিঠে ঝুপ করে খুলে পড়ে। বিশাল চুল অমির। হেমাঙ্গর বুক কেঁপে ওঠে। এই রে! সে ডাকে, অমি! অমি!

অমি মুখ তোলে। না, ভূত আসেনি। ভীষণ কান্নার চাপ এসেছে। গাল ভেসে যাচ্ছে। হেমাঙ্গ সাবধানে কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত রেখে বলে, হঠাৎ কী হল অমি? ছেলে মানুষের মত কান্নাকাটি কেন বল তো?

অমি চাপা কান্নাজড়ানো স্বরে বলে, কেন আমার এমন অসুখ হল হেমাদা? কেন ওরা আমাকে ও সব কথা বলছে?

কী বলছে? বলুক না। তুমি মনে জোর আনো। ঠিক হয়ে যাবে।

আমি কেন সৈকার মত কথা বলি? কেন?···অমি আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা দু' হাঁটুর ফাঁকে নামায়।

হেমাঙ্গ পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, প্লীজ অমি, কাঁদে না। দুর্বল হয়ে পড়বে।

পিঠটা ভীষণ কাঁপতে থাকে। তারপর হেমাঙ্গ লক্ষ্য করে অমি

পড়ে যাচ্ছে তার গায়ে। সে কয়েকবার ডাকাডাকি করে। নীচে প্রমথর গলা শোনা যায়, কী হল হেমা? আবার ফিট হয়েছে নাকি?

অমির শরীরটা একটু কুঁকড়ে এবং সিঁটিয়ে গেছে। দু'হাতে তাকে সাহসে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেয় হেমাঙ্গ। পা দুটো টেনে সোজা করে দেয়। পায়ের আঙুল বেঁকে আছে। সোজা করা যায় না। হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে রয়েছে। বুকটা কাঁপছে। চোখ বন্ধ। হেমাঙ্গ ডাকে, মিলু! মিলু!

আজ সৈকা বিশেষ জ্বালাল না। জলের ঝাপটা দিলেই হাত পা এবং শরীর বেঁকে যাচ্ছে। মিলু স্মেলিং সল্ট শোঁকাল। ফিট ছাড়ল না। প্রমথ বললেন, থাক্। আর শোঁকাসনে। ওকে ছেড়ে আয় সব। হেমা, নীচে যাই চল। যত ইন্টারেস্ট দেখাবে, আরও বাড়বে।

প্রমথর টানে হেমাঙ্গকে চলে যেতে হল। ও একা ও ভাবে পড়ে থাকবে? বুকের ভেতর কান্নার ভাব ঠেলে ওঠে হেমাঙ্গর।

সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। ফেরার পথে বাজার হয়ে এলো হেমাঙ্গ। তখন রাত প্রায় আটটা। অমির ফিট ছাড়ার পর এসেছে। আর ওপরে যায়নি। ইলুর মা এবং টুলুকে ফিরতে দেখেছে। রক্ষাকালীর মন্দির থেকে ফুল বেলপাতা এনেছেন। তাই ছোঁয়াতেই নাকি ফিট ছেড়েছে।

স্টেশনবাজারের চৌমাথায় হরির দোকানে সিগারেট কেনে হেমাঙ্গ। বাকিতে কেনে। তারপর কী ভেবে হরসুন্দরের চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে আসে। ভিতরে হুলো বসে ছিল। তাকে দেখে সে চেঁচিয়ে ডাকে, হেমাদা! হেমাদা!

হেমাঙ্গ দাঁড়ায়। হুলো বেরিয়ে এসে বলে, কোথায় যাচ্ছ?

হুলোর চেহারায় একটা হুলুস্থুল ভাব। ঝড় খাওয়া গাছের মত। হেমাঙ্গ বলে, কোথাও না। বাড়ি ফিরছি। তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন রে?

হুলো চাপা স্বরে বলে, চল, যেতে যেতে বলছি। এক্ষুনি ভাবছিলুম তোমার কথা। দেখা না হলে যেতুম।

কেন, কী ব্যাপার ?

চল তো, বলছি।

দুজনে বড়পোল পেরিয়ে যায়। কিছুটা যাওয়ার পর বাঁ দিকে সরু রাস্তায় মোড় নেয়। দু'ধারে গাছপালা আর টুকরো সব্জীক্ষেত, ফুলবাগিচার মধ্যে একটা করে একেলে গড়নের বাড়ি। এ রাস্তায় আলোর থামগুলো খুব দূরে দূরে। আবছা অন্ধকার সারারাস্তা।

হুলো বলে, ডনদাদের ধরেছে। ঝেণ্টু একা পালিয়ে এসেছে। আমাকে বলে গেল, বোসবাড়িতে খবর দিতে। সার্চ-ফার্চ হতেও পারে। তা আমি ভেবেই পাচ্ছিলুম না, কী করব।

হেমাঙ্গ হকচকিয়ে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে পড়েছিল সঙ্গে সঙ্গে।—বলিস কি !

হ্যাঁ। আমিও ভাবছি, গা ঢাকা দেব। তুমি বোসবাড়িতে খবরটা দাও না গো ! আমার ভীষণ ভয় করছে।

হেমাঙ্গ কাঁপা গলায় বলে, তুই একটা বুদ্ধু ! ঝেণ্টু কখন খবর দিল তোকে ?

এই তো খানিক আগে। ট্রাকে করে এলো।

কোথায় ধরেছে ডনকে ?

কলকাতায়। পায়ে একটি গুলি করেছিল পুলিস। তা নৈলে ওকে ধরতে পারত না।

আমি যাই হেমাদা। আমার কেমন করছে !

বলেই হুলো প্রায় দৌড়ে যায়। ছেলেটা ছিটগ্রস্ত, তাতে কোন ভুল নেই। হয়তো ওর জন্যে গুলাই হোটেলওয়ালাও বিপদে পড়বে। হেমাঙ্গ ফের বোস বাড়ির দিকে চলতে থাকে। বোঝা যায়, ডন এবার এতদিনে ক্ষমতার বাইরে গিয়েই বিপদে পড়েছে। এভাবেই তো গুণ্ডাদের পতন ঘটে।

কিন্তু অমির কোন বিপদ হবে না তো ? সে ডনের দিদি।

প্রমথ বারান্দায় আলো নিভিয়ে বসে আছেন। ভারি বলেন, কে রে?

হেমাঙ্গ বলে, আমি জ্যাঠামশাই।

কী ব্যাপার হে?

হেমাঙ্গ হাঁফাতে-হাঁফাতে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়।

।। ছয় ।।

তারপর ক'দিন ধরে মোহনপুরে ডনের ব্যাপারটা নিয়ে চাপা তুলকালাম চলতে থাকে। অসংখ্য গুজব ছড়ায়। প্রয়াত দেশনেতা নলিনাক্ষের ভাইপো এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, যিনি ইদানীং সুগার মিল স্থাপনের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন—তিনিই নাকি ডনকে পুলিসের হাত থেকে ছাড়িয়ে কলকাতার নার্সিংহোমে রেখেছেন। এর সত্যি মিথ্যে জানা কঠিন। বোসবাড়ি মুখে কুলুপ এঁটেছে। প্রমথ অভ্যাসমতো বাজারে আসেন। কিন্তু হাঁড়িপানা মুখ দেখে কেউ কথা তোলার ভরসা পায় না।

বোসবাড়ি সার্চ করার ব্যাপারটাও হয়তো গুজব। মোহনপুরে পুলিসের তেমন কোনো সন্দেহজনক গতিবিধি কারও চোখে পড়ছে না।

তারপর দেখা গেল মুসহরদের ঝেণ্টু তার প্রচুর আয়না ও বাতি-বসানো সুদৃশ্য সাইকেল চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হরসুন্দরের চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে। ইদ্রিসও এল কয়েকটা দিন পরে। নলিনাক্ষের আবক্ষ মূর্তির গোল রেলিংঘেরা দ্বীপে বিকেলের তাসের আসর ফের জমিয়ে তুলল।

শুধু হুলো ছোঁড়াটার পাত্তা নেই।

গুলাই হোটেলওয়ালা মাঝে মাঝে একে-ওকে জিজ্ঞেস করে মাত্র। কেউ জানে না। ঝেণ্টু বা ইদ্রিসরাও না। ওরা রসিকতা করে বলে—বাপমাকে খুঁজতে বেড়িয়েছে।

এদিকে হেমাঙ্গ একে ভীতু, তার মুনাপিসির হঠাৎ পরাক্রম বেড়ে গিয়েছিল। সে আঙুল তুলে শাসিয়ে বলেছিল—ঘর ছেড়ে বেরুলে তোর একদিন কী আমার। ফিরে এসে আমার মরামুখ দেখবি।

ডাবু ফিরে গিয়েই চিঠি দিয়েছে। যেখানে-যেখানে যেতে বলে

গিয়েছিল, হেমাঙ্গ ইতিমধ্যে গেছে কিনা তারই তাগিদ। হেমাঙ্গকে বেরুতে দিলে তো? বেশির ভাগ সময় তার শুয়ে কাটছে। বেরুলে বড় জোর খালের ধার ও রেল ইয়ার্ডের সীমানা অব্দি, তারপর শংকরার আখড়া। অদ্ভুত ব্যাপার, শংকরাও কয়েকটা দিন বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে মুনাপিসিকে পটিয়ে ভাত খেয়ে গেছে। যেই না ডনের কথা তুলেছে, মুনাপিসি বঁটি দেখিয়ে বলল—সাবধান! শংকরা কী বুঝল কে জানে। হাসতে হাসতে বলল—আচ্ছা, আচ্ছা!

বেশ কয়েকটা দিন হেমাঙ্গ এভাবেই আইন-মানা নিরীহ মানুষের মতো কাটাল। তারপর এক বিকেলে অভ্যাস মতো খালের ধার ও রেলইয়ার্ডের পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে শংকরার আখড়ায় গেল। শংকরা নেই। হেমাঙ্গ চুপচাপ আনমনে দাঁড়িয়ে আছে। বেদীর ওপর মড়ার খুলিটা দেখছে। ওটা কি সত্যি জগদীশের—নাকি শংকরা গুল দিয়েছে? রোদ কমতে কমতে বেলাটা ধূসর হয়ে উঠেছিল। সেই ধূসরতার মধ্যে হেমাঙ্গ খুলিটার দিকে তাকিয়ে জগদীশকে কল্পনা করছিল।

তারপর সে টের পায়, রাগে দুঃখে তার ভেতরটা গরম হয়ে গেছে। একটা নচ্ছার গুণ্ডা ডাকুর প্রেমে পড়েছিল অমির মতো মেয়ে—এ কথা ভাবতেও অবাক লাগে। বুধনী বহুরী কি সত্যি কথা বলছিল? এই খুলিটা জগার না হতেও পারে। শংকরাকে অবিশ্বাস করা সোজা। কিন্তু বুধনীকে কোন্ যুক্তিতে অবিশ্বাস করবে সে?

হেমাঙ্গ সিদ্ধান্ত নেয়, সোজা অমিকে চার্জ করবে। ব্যাপারটা ফোঁড়ার মতো গজিয়ে গেছে মগজে। ফোঁড়াটা টনটন করছে। সে নিজেকে খুব অসহায় টের পায়। নিজের অস্তিত্বেরই অপরাংশ নিজের বেবশে হয়ে থাকে, সে কোনো দিন ভাবতেও পারে নি। অমি তার সেই অপরাংশকে গ্রাস করে আছে। এর একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। অমির হাত থেকে মুক্তি না পেলে জীবনে কিছু করতে পারবে না সে।

অমির কাছে সে শুধু জানতে চাইবে—ব্যাপারটা সত্যি, না মিথ্যে। অমি যদি বলে—সত্যি তাহলে তো ভালই বরং। মিথ্যে বললেই মুশকিল। অনেক জিনিস মাথায় একবার ঢুকে গেলে বের করে দেওয়া যায় না। সারাজীবন মাংসের ভেতর চোট খেয়ে ফাটল ধরা হাড়ের মতো ব্যথা থেকে যায়। কেন বুধনীর কাছে হট-কারিতায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে গিয়েছিল সে?

তবে একটা বিশ্বাস তার আছে—অমি সম্ভবত মিথ্যা বলবে না। অমি একরোখা মরীয়া স্বভাবের মেয়ে। সে কাকেও ভয় করে চলে না। অতি স্পষ্টভাষিণী, দুর্বিনীতা। ডনের জোরে তার জোর নয়, তার নিজের অনেক জোর আছে। হেমাঙ্গ দেখে আসছে আজীবন।

মনের ছন্নছাড়া তিতিবিরক্ত অবস্থার ঘোরে হঠাৎ হেমাঙ্গ এগিয়ে গিয়ে খুলিটাকে লাথি মেরে বেদী থেকে ফেলে দেয়। তারপরও তার ঝোঁক থামে না। ফুটবল খেলার মতো কিক করে-করে শ্মশানবটের তলার আগাছার মধ্যে দিয়ে খালের ধারে নিয়ে যায়। তারপর শেষ অন্তিমে কিকে গোলে বল ঢোকানোর ভঙ্গীতে জলে ফেলে দেয়। টবাং করে শব্দ হয় খালের জলে। তারপর খুলির ফুটোয় জল ঢুকে বজবজ করে বুজকুড়ি তুলতে তুলতে ওটা ডুবে যায়।

কতক্ষণ বুজকুড়ি ওঠে তার পরও। হেমাঙ্গ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে। তারপর ঘোরে। টের পায় চৈত্রের দিন শেষের জোরালো হাওয়া তার গায়ের ঘাম শুকোতে পারছে না। গেঞ্জি চবচব করছে। সে কাঁপা হাতে সিগারেট বের করে ধরায়। তারপর হনহন করে এগিয়ে যায় সামনের বাঁজা-ভাঙ্গাটার দিকে। ওখানেই নন্দীরা বোনমিল করতে চেয়েছিলেন। কালেকটারির সেরেস্তায় ওটা খাস জমি। কেয়া ফণিমনসা শেয়াকুল কাঁটার ঝোপঝাড়ে ঢাকা কচ্ছপের খোলের মতো কয়েক একর মাটি। একটা বাজপড়া ন্যাড়া তালগাছ মধ্যিখানে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে এখন শেষবেলার লালচে জ্যোতি ফুটেছে। ওপাশটায় রুক্ষ চটান জুড়ে একচিলতে

ঘাসও গজায় না। বৃষ্টির দিনে গয়লাদের গরুর পাল ওখানে দাঁড়িয়ে মুখ নীচু করে ভেজে। হেমাঙ্গ দেখেছে।

এখন সেখানটায় জন মানুষ নেই। কিন্তু অনেক সময় হাড়-কুড়োনো কোনো মুসহর বা সাঁওতাল কাঁধে ভার এবং দুধারে ঝুলন্ত ঝুড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হাতে থাকে একটা ছড়ির মতো জিনিস। ওই দিয়ে অদ্ভুত কৌশলে হাড় কুড়িয়ে ঝুড়িতে রাখে। কোঙা ঝোপের ওপর সাপের খোলস দেখা যায়। কারণ ওপাশের আবাদী মাঠ থেকে শীতের ধান কুড়িয়ে এনে রাজ্যের ইঁদুর এখানে গর্তে সঞ্চয় করে। ঝোপের গোড়ায় ঝুরোঝুরো মাটির স্তূপ। সাপের উৎপাত স্বাভাবিক। আবার ইঁদুরের ধান লুঠতে মানুষও কম তৎপর নয়। গর্তের আশেপাশে কুপিয়ে রেখেছে। ঢ্যামনা সাপ পেলে মজাই। ভাত এবং মাংসের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

হেমাঙ্গ সাবধানে পা ফেলে হাঁটছিল। চটানে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে পশ্চিমের দিগন্ত দেখতে তার ভালই লাগে। প্রসারিত মাঠে গোধূলিও দেখার মতো জিনিস।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ে। চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারে না।

চটানের শেষ দিকটায় পাতলা খয়েরি ঘাসের আস্তর, সেখানে অমি বসে আছে একা। মুখটা পশ্চিমে ঘুরে আছে। মুহূর্তে হেমাঙ্গের মনে ঝড় উঠল। জগদীশের ব্যাপারটা একেবারে ভুলে গেল। তার মাথার ভেতর দিকে একটা নড়াচড়া চলতে থাকল। সে উত্তেজনায় আবেগে চঞ্চল হয়ে ডাকে অমি!

অমির চমকে ওঠার কথা। কিন্তু চমকায় না। ঘুরে দেখে একটু হাসে। কেমন পাগলাটে হাসি যেন। হেমাঙ্গ একটু অস্বস্তিতে পড়ে। মাথার গোলমাল হয়ে যায় নি তো অমির? এভাবে এমন জায়গায় সন্ধ্যাবেলা একা এসে বসে আছে কেন ও? রেলইয়ার্ডে তার ঘোরাঘুরি দেখলে অবাক্ লাগত না। কিন্তু এখানে সে কেন?

বিচলিত হেমাঙ্গ লম্বা পায়ে ওর কাছে এগিয়ে যায় এবং চঞ্চল

চোখে চারদিকটা দেখে নিতেও ভোলে না। গিয়ে সামনে ধুপ করে বসে সে বলে, কী ব্যাপার? তুমি এখানে কী করছ?

অমির যে হাসিটা পাগলাটে মনে হয়েছিল, কাছে বসে হেমাঙ্গ দেখল, সেটা অমির স্বাভাবিক হাসি। তাতে রুগ্নতার ছাপ আছে।

এমনি! এখানে?

বাড়িতে ভাল লাগে না। তাই চলে এলুম।

হেমাঙ্গ কী বলবে ভেবে পায় না। একটু পরে বলে, তোমার শরীর কেমন এখন?

এই তো দেখছ! দারুণ ভাল আছি!

এভাবে আসাটা উচিত হয় নি কিন্তু। হঠাৎ মাথা ঘুরে…

অমি বাধা দিয়ে বলে, উঁহু, ঘুরবে না।

হেমাঙ্গ হাসে। তুমি বরাবর একগুঁয়ে! যাক্ গে, অনেক জিজ্ঞাসা আছে। কদিন থেকে তোমাদের বাড়ি যাবার কথা ভাবছি। সময়ই পাচ্ছি না। ডাব্লুটা রাজ্যের কাজ চাপিয়ে গেছে, জানো তো?

অমি মাথা দোলায়। উঁহু! ভয়ে যাও নি। কাজেই থাক, আর অজুহাত দেখিও না।

হেমাঙ্গ ধাক্কা খেয়ে অগত্যা শুকনো এবং জোরালো হাসি দিয়ে সামলাবার চেষ্টা করে। তারপর বলে, আমার কিসের ভয়? যাক্ গে। ডনের খবর বলো!

একথায় অমির মুখের ভাব বদলে যায়। তাকে গম্ভীর দেখায়। সে মুখ নীচু করে শুকনো ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে—ডনের খবর কেউ আমাকে দেখায় নি। খবর আমি জানতেও চাই নি কারুর কাছে। ও মরুক। তুমি অন্য কথা বলো হেমাদা।

হেমাঙ্গ পা দুটো কিছু ছড়িয়ে বাঁহাত ঘাসে ভর করে একটু চিতিয়ে বসে। অমির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। আলোর ধূসর রঙটা ক্রমশ কালচে হয়ে উঠেছে। ওর মুখের খাঁজে অন্ধকার জমেছে। ঠোঁট দুটো শুকনো দেখাচ্ছে। চুলটা আলগোছে

বাঁধা, বিস্রস্ত খোঁপা ডান কাঁধে ভর দিয়ে আছে। অমি এবার মুখ সামান্য ঘোরালেই খোঁপাটা ভেঙে ঝরঝর করে চুলের ধারা গড়িয়ে পড়বে শুকনো ঘাসে। হেমাঙ্গের দৃষ্টি পড়ল তার গলার নীচে বুকের ওপর অংশে। কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে। অসাবধানে বুকের একপাশ থেকে শাড়ি সরে গেছে এবং হেমাঙ্গের মনে হল, অমি তার শরীরের তুলনায় স্তনবতী, এটা তার অনেক আগে লক্ষ্য করা উচিত ছিল।

অমি চোখের কোনা দিয়ে নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে হেমাঙ্গর দৃষ্টিটা কোথায় আটকে আছে। কিন্তু সে শাড়িটা ঠিকঠাক করে নেয় না। বলে, কিছু বলছ না যে ?

কী বলব ? বরং তুমি বলো।

যাঃ! আমার কথা বলতে ইচ্ছেই করে না আজকাল। শুনতে ইচ্ছে করে।

তাই বুঝি ? হেমাঙ্গ হাসে। কিন্তু কী শোনাতে পারি আমি ? নিশ্চয় রূপকথা শুনতে চাইছ না!

যা কিছু। রূপকথা, ভূতের গল্প, কিংবা……কিংবা ন্যাকামি।

ন্যাকামি ? তার মানে ?

হ্যাঁ। সেই যে একসময় ন্যাকা-ন্যাকা গলায় বলার চেষ্টা করতে। ভালবাসা-টাসা কী সব যেন ?

হেমাঙ্গের গলা একটু কেঁপে যায়। আমার মুখে ভালবাসা-টাসা শুনলে তো তোমার খারাপ লাগবে অমি। লাগবে না ? কারণ, তুমি তো জানোই ন্যাকা-ন্যাকা কথায় ভালবাসা-টাসা না বলে কেউ কেউ জোরালো ভাবে বলতেও পারে।

পারে বৈকি।

হেমাঙ্গ হুম করে বলে ওঠে, যেমন জগদীশ।

অমি দ্রুত মুখ তোলে। তার দিকে তীব্রদৃষ্টে তাকায়। নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়। সে বলে, জগদীশ ?

হ্যাঁ। জগদীশ। বলেই প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে ব্যস্ত হয় হেমাঙ্গ।

কারণ সঙ্গে সঙ্গে তার নিজেরই খারাপ লেগেছে। এই সুন্দর অবস্থাটা ঘুলিয়ে দেওয়ার কোন মানে হয় না। অমিকে অনেকদিন পরে এমন একটা জায়গায় এমন একটা উল্লেখযোগ্য সময়ে মুখোমুখি পাওয়া এক বহুমূল্য জিনিস। সাপ না মরে এবং লাঠিও না ভাঙে, এমন কৌশলে সে চলতে চায়। ফের বলে, সিরিয়াসলি নিও না। তাই বলে। জাস্ট এ জোক।

অমি হিসহিস করে বলে, জগদীশের কথা কে তোমাকে বলল ?

অগত্যা হেমাঙ্গ বলে দেয়, বুধনী বহরীর ব্যাপার তো জানো! যখনই বাগে পাবে, ওর মেয়ে সৈকার কথা শুনিয়ে ছাড়বে। বুড়ীই সেদিন বলছিল, কবে যেন জগদীশের সঙ্গে তুমি ওই রেলইয়ার্ডে ঘোরাঘুরি করতে! সৈকার কাছে শোনা কথা অবশ্য। থাক্। ওকথা ছাড়ো।

অমি ভারি একটা নিশ্বাস ফেলে। যেন নিজের উত্তেজনা সামলে নেয়। তারপর একটু হাসে। আমি ভূতে পাওয়া রুগী। সাবধান কিন্তু। হঠাৎ ভূতটা এসে গেলেই মুশকিলে পড়ে যাবে।

হেমাঙ্গ অবস্থা আরও হাল্কা করতে চেয়ে বলে কিছু মুশকিল নয়। আমি বরং তোমার ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ দেখে খুব আনন্দ পাব।

যদি গলা টিপে ধরি ?

অমি সত্যি সত্যি হাত দুটো বাড়ালে হেমাঙ্গের গা শিরশির করে ওঠে। কিন্তু সে মাথাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলে, বেশ তো। ধরবে! এখনই ধরতে পারো!

অমির বাড়ানো দুটো হাত সে নিজের গলার কাছে টেনেও নেয়। অমি আগে বালা পরত। আজকাল পরে না। শূন্য হাত দুটো রুগ্ন এবং ক্ষীণ মনে হয় হেমাঙ্গের। অথচ রোমাঞ্চ লাগে। অমি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বলে, তোমার ভীষণ সাহস হয়েছে আজকাল। দেখে ভাল লাগছে। নাও, এখন কী গল্প শোনাবে, শোনাও। আমাকে তুমি খালি বকাচ্ছ। কথা বললে হাঁফ ধরে যায়!

হেমাঙ্গ হাত দুটো ছাড়ে না। দুই উরুর মধ্যিখানে রেখে খেলা করতে থাকে হাত দুটো নিয়ে। এবং তার মধ্যে হঠকারী আবেগের জোয়ার আবার ফিরে এসেছে বুঝতে পারে! সে প্রেমিকের গলায় বলে, তোমার জন্যে সত্যি আমার বড্ড কষ্ট হয় অমি। বিশ্বাস করো! না—তোমার এই অসুখের জন্যেই শুধু নয়, অন্য কারণে। ধরো, স্মৃতি কিংবা সংসর্গ। কতকাল···কতকাল এভাবে কাটাচ্ছি আমরা! কতকাল খালি আত্মনিগ্রহ! নিজের বোকামি আর ভীরুতার সঙ্গে রাতের পর রাত লড়াই! তোমাকে যদি বুকের ভেতরটা দেখাতে পারতুম, অবাক হয়ে যেতে।

অমি অস্ফুটস্বরে বলে, যাঃ! এসব কী কথা?

মুশকিল হয়েছে কী জানো? তোমার ওপর যেন আমার একটা প্রচণ্ড অধিকারবোধ জন্মে গেছে কবে। কিছুতেই ভাবতে পারিনে তুমি আমার কেউ নও। এ যেন প্রপার্টির অধিকার। কিংবা··· কিংবা···হেমাঙ্গ কথা হাতড়িয়ে ফের বলতে থাকে, তুমি আমার একটা নিজস্ব ঘরের মতো। তোমার মধ্যে আমার বসতে শুতে বিশ্রাম নিতে ঘুমোতে ইচ্ছে করে। তুমি কেন এসব বোঝো না, ভেবে দুঃখ হয়। রাগ হয়! নাকি ইচ্ছে করেই তুমি আমাকে আঘাত দিতে চাও!

এবার হঠকারিতায় হেমাঙ্গ তাকে আকর্ষণ করে। সন্ধ্যার আব-ছায়ায় অমির মুখের ভাব স্পষ্ট নয়। কিন্তু সে অবশ যেন। হেমাঙ্গ তাকে নিজের দুই উরুর ওপর স্থাপন করে। অমি মুখ চিতিয়ে চুপ-চাপ আধশোয়া ভঙ্গীতে বসে থাকে। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাস জড়ানো স্বরে বলে—আমাকে তুমি বাঁচাতে পারবে?

হেমাঙ্গ মুখ নামিয়ে তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলে—কেন? কী হয়েছে তোমার অমি?

কে জানে! বোঝাতে পারব না। খালি মনে হয়, কেউ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হেমাঙ্গ আদর করতে থাকে তাকে। তার গলার নীচে, গ্রীবায়,

বুকের মাংসে হেমাঙ্গের আবেগপ্রবণ ঠোঁট ঘুরে ঘুরে খুনসুটি করে। অমির শরীর চুপচাপ আদর খায়। প্রথম নক্ষত্রের আলোয় তার চোখ দুটো বুজে থাকতে দেখে হেমাঙ্গ। তারপর আস্তে আস্তে অমির শরীরে কী এক জাগরণ শুরু হয়। সে হেমাঙ্গের ঠোঁট কামড়ে ধরে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বলে, হয় তুমি আমায় বাঁচাও, নয়তো মেরে ফেলো। আমার অসহ্য লাগছে।

তারপর হেমাঙ্গ টের পায় অমির শরীর জুড়ে ছট-ফটানি চলেছে। সৈকার ভূতটা এসে পড়ল ভেবে সে ঈষৎ আতঙ্কে ও দ্বিধায় অমিকে দুহাতে ধরে রাখে এবং গাবছা অন্ধকারে তার চোখের দৃষ্টির সেই অলৌকিকতা খোঁজে। আর অমির দুই হাত ততক্ষণে তার পিঠে চলে গেছে এবং হিংস্রতায় জামা ছিঁড়ে ফেলার মতো নখের আঁচড় কাটছে সে। প্রচণ্ড শারীরিক উদ্দীপনার মধ্যে হেমাঙ্গের যেন মনে হয়, এ অমি কিছুতেই আজীবন দেখা সেই অমি নয়। এ বুঝি মুসহর যুবতী সৈকাই! সৈকা তাকে নখের আঁচড়ে ফালা ফালা করে দিচ্ছে। তার ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে চেটে নিচ্ছে। হাঁফাতে হাঁফাতে ফিস-ফিস করে জড়ানো কীসব এলোমেলো কথাও বলছে।

হেমাঙ্গ ইতস্তত করছিল। হয়তো শেষ মুহূর্তে কী করে বসত বলা যায় না। সে স্বভাবভীরু। কিন্তু অমির শরীর থেকে অশরীরী সৈকা তার দুটো হাত টেনে নিজের দিকে নিয়ে গেল। এরপর য কিছু ঘটল, তা শরীরে-শরীর উত্তর-প্রত্যুত্তর। অজস্র শারীরিক ক উচ্চারিত হল শরীরেরই স্পন্দনে। অমির শরীরবাসিনী সশরীর সৈকার প্রচণ্ড কামনার ঝড়ে অসহায় হেমাঙ্গ উড়ে চলল ছেঁড়া পাতার মতো।

কিছুক্ষণ পরে অমি নিস্পন্দ হয়ে যায়। হেমাঙ্গ ডাকে, অমি! অমি!

উঁ?

ওঠ।

উঁহু। আর একটু থাকো।

এই সময় খালের দিকে শেয়াল ডাকল। দৈবাৎ [illegible]
কোনো নিঃসঙ্গ শেয়ালই বা। আজকাল মোহনপুরে শেয়ালের ডাক শোনাই যায় না। এ যেন অলীক কোনো ডাক—প্রকৃতিতে কতকাল আগের প্রতিধ্বনি! হেমাঙ্গ বলে, এই অমি! প্লীজ, ওঠ। কে এসে পড়তে পারে!

এখানে কেউ আসবে না।

হেমাঙ্গ দুহাতে ওকে ওঠায়। অমি কি হাসছে? অন্ধকারে সে বিশৃংখল শাড়ি ও জামা ঠিকঠাক করে নেয়। চুল বাঁধে। হেমাঙ্গ সতর্ক চোখে চারপাশটা দেখছিল। বলে, চলো। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

অমির ওঠার ইচ্ছে নেই। সে হেমাঙ্গের উঁচু হয়ে থাকা উরুতে হেলান দিয়ে চাপা স্বরে বলে, শেয়াল ডাকল শুনলে? ভারি অদ্ভুত, তাই না?

হ্যাঁ। কেন?

ওটা শেয়াল নয়। শংকরা। আমি জানি।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, বলো কী!

শংকরা তোমাকে বলে নি কিছু?

না তো। কী বলবে?

ডন জগদীশদাকে মেরে পুঁতে রেখেছিল বলে নি?

হেমাঙ্গ একটু দেরিতে জবাব দেয়, বলেছিল। বিশ্বাস করি নি।

আমাকেও বলেছিল। কিন্তু আমি সবই জানতুম।

জানতে? সত্যি নাকি? বলে হেমাঙ্গ চুপ করে থাকে। অমিও।

এই সময় শ্মশানতলার দিক থেকে শংকরার চেরা গলার গর্জন ভেসে এল—ওং তারাত্তারাত্তারাত্তারাত্তা! ওং ওং!

যেন বাঘ ডাকল। হেমাঙ্গ বলে, এই! আর নয়। আজ ওঠা যাক্।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমি ওঠার চেষ্টা করে বলে, আমাকে ওঠাও!

তারপর সে দুষ্টুমি করে হেমাঙ্গের দুই কাঁধে হাত রেখে বলে, আমাকে বয়ে নিয়ে চলো!

অগত্যা হেমাঙ্গ তাকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে হাঁফাতে হাঁফাতে পা বাড়ায়। অমি হাল্কা। কিন্তু অনভ্যাস হেমাঙ্গের। চটানের শেষপ্রান্তে তাকে নামিয়ে দিয়ে বলে, বাপ্‌স!

শংকরা আবার ওঁং নাদ হাঁকছে। অমি হনহন করে চলতে থাকে হঠাৎ। হেমাঙ্গ তার নাগাল পায় না। কাঁচা-রাস্তায় গিয়ে অমির কাঁধ আঁকড়ে সে বলে—আস্তে চলো! তারপর দুজনে ল্যাম্পপোস্টের আলোর সীমানাঅব্দি এভাবেই ঘনিষ্ঠ হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যায়। এখন দুজনেই খুব অন্যমনস্ক।

জীবনে এই প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতা হেমাঙ্গকে কিন্তু একটু ধাক্কাও দেয় নি। অথচ এতকাল ভেবেছে, সেক্স না জানি কী ভয়াবহ ব্যাপারই হবে, কী হৃদয়বিদারক বিস্ফোরণ এবং আলোড়নকারী ঘটনা হবে!

আর তার চেয়ে সাংঘাতিক কিছু অমির সঙ্গে শারীরিক এধরনের সম্পর্ক স্থাপন। হেমাঙ্গের তো গায়ে ত্রাসের শিহরণ ঘটে যেত ভাবতে। তার কল্পনা চিড় খেত খানিকটা এগিয়েই।

তবু তো ওর শরীরটা যেন দীর্ঘ সংসর্গে অসচেতন অভ্যাসে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সে তো জানতই, অমির বুকে বা উরুতে কোথায় তিল আছে। ওর জন্মদাগ। পাঁচড়া বা ফোঁড়ার স্থায়ী ক্ষতচিহ্নও। চোখ বুজে সে বলতে পারত কোথায় কী আছে।

অবশ্য সত্যি সত্যি সে তত কিছু খুঁটিয়ে দেখে নি অমির বালিকা শরীরকে। অনেকটাই তার ধারণা এবং আরোপিত সিদ্ধান্ত। কেমন করে দেখবে? সে ছিল লাজুক ধরনের ছেলে। কিছুটা অন্তর্মুখী বরাবরই। অথচ ভেতরে-ভেতরে যেন হ্যাংলা। অনেকখানি লোভী।

এসবের ফলেই হয়তো দীর্ঘ সময়—জ্বালা ধরানো, বিরক্তিকর,

পিণ্ডিচটকানো, তেতো অজস্র বছর কাটাতে হয়েছে তাকে। এই হুট করে এসে পড়া আকস্মিকতা তবু কেন যেন তাকে খুব জোরে নাড়া দিতে পারল না। বরং নিজের প্রীত যৌনতার বশে অভিভূত হয়ে রইল স্বাভাবিক ওমে।

সে রাতে তার কোন পরিবর্তন ধরা পড়ার উপায় ছিল না। শুধু খাওয়ার পরিমাণ কম হল এই যা। মুনাপিসির তীক্ষ্ণ নজর দিব্যি এড়িয়ে যেতে পারল। পরের দিন সকালে অবশ্য মুনাপিসি তাকে চমকে দিয়ে বলেছিল—জামা ছিঁড়লি কিসে রে? হেমাঙ্গ টের পেয়েছিল, তাঁতের ফিকে শ্যাওলারঙা পানজাবিটা পিঠের দিকে কয়েক জায়গায় ফেড়ে আছে। পুরনো পানজাবি। সুতোর আঁশ দুর্বল হয়ে গেছে। হেমাঙ্গ বলেছিল, কাঁটাতারের বেড়ায় ছিঁড়েছে তাহলে। রেলইয়ার্ডে সিধে ঢুকতে গিয়েছিলুম। শর্টকাট করতে গিয়ে।

তবে সারাটা রাত গায়ে অমির গায়ের গন্ধ ছিল। চুলের গন্ধ ছিল। মুনাপিসি শুঁকলে ধরা পড়ে যেত। তারপর মাঝরাতে একবার মনে হয়েছিল, অমিও কি তার মতো এই প্রথম—নাকি জগদীশের সঙ্গে…

পরে মনকে বোঝাল, তাতে কী? সে তো অমিকে বউ করে ঘরে তোলার কথা ভাবছে না। ওই ধরনের সামাজিক এবং গতানুগতিক স্থায়িত্ব এই প্রেমকে সে দেবে কিনা, সে-সিদ্ধান্ত নেয় নি। আগে মাঝে মাঝে যদি বা ভাবত বিয়ের কথা, সে যেন ছিল নেহাৎ একটা চিরাচরিত ইচ্ছার ব্যাপার। তীব্র আগ্রহ থাকলে বিয়ের কি কিছু বাধা ছিল। অমির সঙ্গে জগদীশের গোপন সম্পর্ক যত কিছু থাক, অমির কাছে হেমাঙ্গই তো ছিল চরম আশ্রয়। এর অসংখ্য প্রমাণ সে পেয়ে আসছে।

এইসব সাত পাঁচ ভাবনা তার রাতের ঘুমকে ভণ্ডুল করে দিয়েছিল। বারবার জগদীশ সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। হেমাঙ্গ তাকে মৃত মানুষ বলে বিকেলে শংকরার বেদী থেকে তার খুলিকে

লাথি মারতে মারতে নিয়ে গিয়ে খালের জলে ফেলে দেওয়ার মতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিল। শেষরাতে ঘুমের করুণা হল। গভীর ও প্রগাঢ় ঘুম তার অন্তরাত্মা কিংবা শরীরের তৃপ্তি থেকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল। টেনে নিয়ে গেল নিস্তব্ধতার অন্ধকারে।

সকালে ছেঁড়া জামা নিয়ে কথা ওঠার কিছুক্ষণ পরে হেমাঙ্গ মুনাপিসির সঙ্গে ডাবুর চিঠি নিয়ে আলোচনা করছে, বাড়িটাকে অবাক করে দিয়ে অমির গলা শোনা যায় বাইরের বারান্দায়।—পিসিমা! পিসিমা!

রীতিমতো জোরালো কণ্ঠস্বর। মুনাপিসি ধরতে পারে নি। কিন্তু হকচকিয়ে গেছে হেমাঙ্গ। সে বলে—কে ডাকছে দেখ তো।

কপাটে ধাক্কা দিচ্ছিল অমি। কেমন নির্লজ্জ লাগে হেমাঙ্গর। মনে তীব্র অস্বস্তি জেগে উঠেছে। তার বুকটা গলা শুনেই ধক করে উঠেছিল। চাপা ধুকধুক চলতে থাকে। মুনাপিসি ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে হেমাঙ্গের দিকে তাকিয়ে বলে—অমির গলা মনে হচ্ছে না?

হেমাঙ্গ বলে, কে জানে! দেখ না গিয়ে কী বলবে!

মুনাপিসি হেমাঙ্গের ঘরে ঢুকে গিয়ে দরজা খুলে বলে—অমি যে! এস এস কী হাল করে ফেলেছ শরীরের! চেনাই যায় না যে!

মুনাপিসির স্বভাব এই। আড়ালে যার সম্পর্কে যাই বলুক, সামনাসামনি আকাশপাতাল খাতির না দেখিয়ে ছাড়বে না। অমির চিবুকে হাত দিয়ে আদর করার উপক্রম করতেই অমি হেঁটমুণ্ড হল এবং পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল। পুবের বারান্দায় সকালের টাটকা রোদ পড়েছে। প্রণামের সময় হেমাঙ্গ অমির পাঁজরের হাড়গুলো দেখতে পেল।

কাল সন্ধ্যায় সে বুঝতে পারে নি এই জীর্ণতাটা। হয়তো বোঝবার মনই ছিল না। হেমাঙ্গ এখন ওর দিকে সোজা নিঃসঙ্কোচে তাকাতেই পারছে না। মুনাপিসি অমিকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে ঢোকায়। তারপর টানতে টানতে ভেতরের বারান্দায় নিয়ে যায়। হেমাঙ্গের দিকে অমি তাকায় না।

উঠোনে নেমে গিয়ে চারপাশে ঘুরে দেখতে দেখতে অমি হাসিমুখে বলে, অনেককাল আসি নি পিসিমা। সত্যি, আপনি বাড়িটা কী সুন্দর করে রেখেছেন।

মুনাপিসি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সস্নেহে বলে, কেন আসো নি মা? তোমার জন্যে কত ভাবি!

যান, যান! খুব ভাবেন! তাই আমার কীর্তিকলাপ দেখতে যাবারও সময় পান নি।

মুনাপিসি অপ্রস্তুত মুখে বলে, লজ্জা দিস নে অমি। সত্যি যেতে পারি নি। তোদের বাড়ি যাওয়া সবার পক্ষে তো সহজ নয়, মা। তুই নিজেও তো বুঝিস!

হ্যাঁ, সে তো বুঝি। বলে অমি যেন এতক্ষণে হেমাঙ্গকে দেখতে পায়। আরে! হেমাদা যে! কেমন আছ তুমি? আমি তো ভেবেছিলুম, কোথায় চাকরি-বাকরি পেয়ে কেটে পড়েছ।

অভিনয় অথবা ডাহা মিথ্যা চালিয়ে যেতে কোনো কোনো সময় মন্দ লাগে না। তাছাড়া হেমাঙ্গ ততক্ষণে খুশি হয়ে উঠেছে। সে একটু হেসে বলে, পাগল! আমার মুনাপিসির চাকরি ছেড়ে যাব? এমন সুখের চাকরি দেবে কে?

মুনাপিসি হাসতে হাসতে বলে, অমি! কাছে এস। গল্প করি। তারপর সে অমিকে কেন যেন খুব খাতির দেখাতে দেয়ালের কাছে রাখা চেয়ারটা সরিয়ে আনে। ফের বলে, এখানে বোসো।

অমি উঠোন থেকে প্রায় ছুটোছুটি করে এসে মুনাপিসিকেই বসিয়ে দেয় চেয়ারটাতে। তারপর তার পিঠের কাছ দাঁড়িয়ে বলে, কদিন থেকে শরীরটা ভাল আছে। খালি ভাবছি, আপনাদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দিয়ে আসি। আবার ভাবছি, কে জানে কীভাবে নেবেন!

মুনাপিসি বলে, কেন রে মেয়ে?

ডনের জন্যে মোহনপুরে সব্বাই কেমন যেন আনইজি ফিল করে বোসবাড়ির মেয়েদের দেখলে। জানেন না?...বলে অমি খিলখিল করে হাসে।

মুনাপিসি এবার ভীতু চোখ তুলে গলা চেপে বলে, হ্যাঁ অমি, ভনের কী সব গণ্ডগোল হয়েছে শুনেছিলাম। কী ব্যাপার বলো তো?

অতি তাচ্ছিল্য করে বলে, আদাড় গাঁয়ের শেয়াল রাজা গিয়েছিল কলকাতায় মস্তানী করতে। পায়ে গুলি লেগেছিল নাকি। তারপর হসপিটালে নিয়ে যায় পুলিস। এই অব্দি আমি জানি।

তারপর, তারপর?

তারপর আর কিছু জানিনে। না, আর একটুও শুনেছি। হসপিটাল থেকে নাকি নিখোঁজ হয়ে গেছে। আণ্ডার অ্যারেস্ট ছিল। পুলিস এসেছিল। এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মুনাপিসি চাঞ্চল্য চেপে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে তো তোমার বড্ড কষ্টে যাচ্ছে, মেয়ে! এদিকে নিজের এই অসুখ, ওদিকে ভাইটার ওই অবস্থা। খুব স্যাড ব্যাপার।

অমি হাসে। আপনি ওসব নিয়ে ভাববেন না। আমিও ভাবি না। জ্যাঠামশাই জেঠিমাও ভাবেন না। বোস ফ্যামিলি গ্ল্যাডলি কাটাচ্ছে। হ্যাঁ গো পিসিমা, ওটা সেই জবাগাছটা না? হেমাদা কাটোয়া না বহরমপুর থেকে এনে দিয়েছিল যেন! জানেন? ভুতুবাবু একটা নার্শারি করেছে। যাবেন আমার সঙ্গে? কী সুন্দর না করেছে পুরো এরিয়াটা! কত রকম গাছ, কত অদ্ভুত অদ্ভুত সব ফুল!

অমির একটা জোরালো পরিবর্তন টের পাচ্ছিল হেমাঙ্গ। ততক্ষণে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে এবং জানলার পর্দাটা একটু ফাঁক করে তাকিয়ে আছে। কান পেতে কথা শুনছে। অমিকে কেন যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না, যদিও মনের কোণায় খুশির একটা হালকা অথচ তীব্র স্রোত বইছে।

মুনাপিসিরও অল্পস্বল্প গাছপালার বাতিক আছে। এই পাড়াটায় কার না আছে? ওইসব নিয়ে কথা বলতে বলতে একসময় দুজনে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এক টুকরো ম্রিয়মাণ সবজী-

ক্ষেত আছে ওপাশে। প্রায়ই গরু ছাগল এসে বেড়া ভেঙে মুড়িয়ে দিয়ে যায়। এদিকটা মোহনপুরের একেবারে শেষ দক্ষিণপ্রান্তে। বাড়ির ওপাশে আগাছার জঙ্গল, পোড়ো জমি আর দু'এক টুকরো বীজধান লাগানোর জমির পর ধাপে ধাপে মাঠটা নেমে গেছে দূরের দিকে। সবজীক্ষেতে দাঁড়ালে মনে হয় একেবারে অজ পাড়াগাঁ এদিকটা। অথচ কয়েকপা উল্টোদিকে ঘুরলেই রীতিমতো শহর। লাইটপোস্ট, একেলে ধাঁচের ঘর-বাড়ি, ক্রমে বাজার আর ভিড়। রেলকলোনী, সরকারী আপিস, লোকোশেড। সে এক জগাখিচুড়ি ব্যাপার।

হেমাঙ্গ হাই তোলে এবং ফের উঠোনের দিকে বেরোয়। হঠাৎ তার সন্দেহ জাগে, অমি কি কোনো গোপন কথা বলার জন্যে মুনা-পিসিকে ফিকির করে ওদিকে ডেকে নিয়ে গেল ?

তীব্র আগ্রহ নিয়ে সে উঁচু বারান্দার থামে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। কাল সন্ধ্যায় পিঠে নখের আঁচড় কেটেছিল অমি। এখন আর জ্বালা করছে না। কিন্তু স্নানের সময়টা সাবধানী হতে হবে।

কিন্তু ওদের আর ফেরার নামই নেই। এত কী কথা বলছে ? হেমাঙ্গ অস্থির।

কতক্ষণ পরে কথা বলতে বলতে দুটিতে ফিরে আসে ! মুনাপিসি-বলে, হেমা রে ! অমি বলছে, ভুতুবাবুর নার্সারিতে ভাল-ভাল গোলাপ আর বুগানভিলিয়া আছে নাকি। গেটের বুগানভিলিয়াটা তো সেবার সাপের জন্যে কেটে ফেলা হল। ন্যাড়া হয়ে আছে। তুই যাস না বাবা একবার।

অমি বলে, হেমাদা না যায়, আমি এনে দেব পিসিমা। তারপর হেমাঙ্গের দিকে চোখের ঝিলিক ছুড়ে মারে। হেমাঙ্গের বুকের ভেতর বিদ্যুৎ বয়ে যায়।

মুনাপিসি বলে, আয়। আমার কাছে বসবি কিচেনে।

এখনই রান্না চড়াবেন নাকি ? অমি ফের হেমাঙ্গের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে। হেমাদার আপিস বুঝি ?

মুনাপিসি হাসতে হাসতে বলে, নারে। অনেকদিন পরে এলি, মেয়ে। তোকে কিছু খাইয়ে দিই। ইস! কী করে ফেলেছিস চেহারাখানা! হ্যাঁ রে, বরং জ্যাঠাকে বলে সদরে ভাল কোনো ফিজিশিয়ানকে একবার দেখালি নে কেন?

মুনাপিসির এই স্বভাব। তুমি থেকে তুইয়ে নামতেও দেরি হয় না। অমি বলে, ও হেমাদা! এবার তোমার সঙ্গে গল্প করি। হ্যাঁ গো, তোমার কাছে ডিটেকটিভ উপন্যাস আছে? দাও না!

তারপর সে বারান্দা থেকে বাইরের ঘর অর্থাৎ হেমাঙ্গের ঘরে ঢোকে। মুনাপিসি কিচেনে গিয়ে ঢুকেছে। হেমাঙ্গ বুঝতে পারে, ভদ্রমহিলাকে জল করে দিয়েছে ধূর্ত অমি। সে একটু ইতস্ততঃ করে নিজের ঘরে ফিরে আসে। দেখে, অমি দেয়ালের তাকে রাখা তার ছেলেবেলার একটা ফটোর দিকে তাকিয়ে আছে।

হেমাঙ্গের উরু দুটো হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে। হাত-পা একটু কাঁপে। আগেও তো অমি এ ঘরে এসেছে, এমন হয় নি তার। দরজায় অবশ্য পর্দা ঝুলছে। অমি তার সাড়া পেয়েও পেছনে ফেরে না। হেমাঙ্গ কাঁপা শরীরে তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ফিসফিস করে বলে, কী ব্যাপার?

অমি আলতো হাতে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। দৃষ্টি এবং কোঁচকানো ভুরুতে তিরস্কার। মুনাপিসির অবস্থিতি আঁচ করানোর ভঙ্গীতে একটু সরে দাঁড়ায় সে। তারপর হাসে এবং গলা চড়িয়ে বলে, ওটা ডিটেকটিভ উপন্যাস না? হেমাদা, তুমি আর্থার হ্যালির কোনো বই পড়েছ? গোস্বামীদের বাড়ির কৃষ্ণা এসেছে কলকাতা থেকে। রাস্তায় দেখা হল। হাতে একটা ইংরেজী বই। কী ভড়ং জানো? কায়দা করে মেমসায়েবের মতো ইংরিজী বলছিল। আমি মফস্বলী মাল!—অমি খিলখিল করে হেসে উঠল।

এত বেশী কথা বলছে কেন অমি? এত কাল পরে কোথায় কোন একটা দরজা হঠাৎ হাট করে খোলা হয়ে গেছে ওর! হেমাঙ্গও

গলা চড়িয়ে বলে, কী? আর্থার হ্যালি—না হেলি? তারপর ফের ফিসফিসিয়ে ওঠে, আজ সন্ধ্যায় ওখানে যাবে?

ইস! খুব মজা পেয়ে গেছ!—অমি চাপা গলায় বলে। তারপর দেয়াল আলমারিটার পাল্লা খুলে বই নামাতে শুরু করে। চড়া গলায় বলে, এ তো তোমার পুরনো টেক্সট বুক! এগুলো এখনও যত্ন করে রেখেছ কেন? আমি তো সবই মিলুকে দিয়েছি!

অধীর হেমাঙ্গ ফের ফিসফিসিয়ে ওঠে, সন্ধ্যায় একবার—

অমি দ্রুত মাথা দোলায়। অস্ফুটস্বরে বলে, না।

কেন না?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অমি কেমন হাসে হঠাৎ। তারপর বইগুলোর দিকে হেঁটমুণ্ডু হয়ে বলে, যাব।

এই সময় হঠাৎ বাইরের জানালার পর্দার ফাঁকে চোখ পড়ে হেমাঙ্গের। প্রায় ঝাঁপিয়ে যায় সে। পর্দা সরিয়ে বলে ইডিয়ট কোথাকার! মারব এক থাপ্পড়!

ধুপ ধুপ শব্দ করে কেউ পালাল। অমি বলে, নিশ্চয় শঙ্করা?

॥ সাত ॥

প্রমথ তাঁর ছেলে জনকে আটকাবার চেষ্টা করছিলেন। জনের হাতে একটা কঞ্চি। কঞ্চির ডগায় খানিকটা নোংরা মাখানো। ওটা সে পল্টুর পাতে গুঁজে না দিয়ে ছাড়বে না। পল্টু বেচারা কিচেনের বারান্দার এক কোণায় খেতে বসেছিল। এখন থালা তুলে নিয়ে কুয়োতলার আড়ালে চলে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে। দাঁত বেরিয়ে পড়ছে। কিন্তু মাথায় আগুন জ্বলছে। বাগে পেলেই ওই ক্ষুদে শয়তানটাকে টুপ করে তুলে কুয়োয় ফেলে দেবেই।

প্রমথ অনেক কষ্টে জনকে তুলে নিয়েছেন কোলে। কিন্তু সে বাবার গলা কামড়াবার চেষ্টা করছে। বাড়িসুদ্ধু মেয়েরা হাসছে। অবশেষে সুলোচনা এসে বাঁ হাতে কঞ্চিটা কেড়ে নিয়ে ফেলতে গেলেন। তারপর জন ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

প্রমথ দোদুল্যমান পুত্রকে নিয়ে বেরুলেন। রোয়াকে বসে হাঁক দিলেন—ইলু, জনের ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে আয় তো! আমরা খেলব।

এমন সময় হেমাঙ্গকে দেখা যায় লনের ওদিকে রাস্তায়, গেটের সামনাসামনি। প্রমথর দৃষ্টি যেতেই জনকে ছেড়ে ফের ডাকেন, কে হে? হেমা নাকি?

হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই!

বিস্তর দিন তোমাকে দেখি নি। ছিলে না নাকি?

জন হেমাঙ্গকে দেখে ছুটে গিয়েছিল গেটে। তার হেমাঙ্গকে কেন যেন ভাল লাগে। হেমাঙ্গ এ বাড়ি এলে শান্ত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে চুপচাপ। অবশ্য হেমাঙ্গ ছাড়া আরেকজন তার লক্ষ্যের মানুষ—সে জামসেদপুরের ডাব্বু। উলটে ডাব্বু তাকে জ্বালাতনের একশেষ করে। কিন্তু জন প্রতিশোধ নেয় না। এর

পর রইল ডন। ডনের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রভু ও ভৃত্যের। তার দিদিরা তাকে ডনের চাকর বলে তামাশা করে। ডন তাকে যেখানে যেতে বলবে, সে রাজী। তাই বলে বাড়ির এলাকার বাইরে তাকে যেতে বলে না ডন। বড়জোর বাড়ির ভেতরের টুকিটাকি ফরমাস খাটায়।

হেমাঙ্গের দিকে গেটের ওপার থেকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিল জন। হেমাঙ্গ হাসিমুখে বলে—হ্যাল্লো জন!

জন গেটের ওপর দিকের আংটা তোলার চেষ্টা করতে থাকে। ওর ছোট্ট হাত অত উঁচুতে পৌঁছয় না। হেমাঙ্গ নিজে খুলে ভেতরে ঢোকে। ওর প্রকাণ্ড মাথাটা একটু নেড়ে দেয়।

প্রমথ বলেন, ভালো করে আটকে দিও হেমা। ও বেরিয়ে পড়বে। জন! চলে আয়। ব্যাট খেলি।

হেমাঙ্গ রোয়াকে ছায়ায় বসে বলে, শরীর ভাল ছিল না। তাই আসা হয় নি।

সিজন চেঞ্জের সময় যে! প্রমথ বলেন। শেষ রাতে তো কনকনে শীত পড়ে। সকাল থেকে ভ্যাপসা গরম সারাদিন। পক্সের মরশুম। টিকেফিকে নিয়েছ তো?

হেমাঙ্গ মাথা দোলায়।

টিকে একটা নোংরা ব্যাপার। না নেওয়াই ভাল। হোমিও-প্যাথিতে ভাল ওষুধ আছে। খেয়ে যাও। টিকের অলটারনেটিভ ভদ্র সভ্য ব্যবস্থা।—বলে প্রমথ জনকে খোঁজেন। জন বাগানে দাঁড়িয়ে এখন প্রজাপতি ধরার চেষ্টা করছে।

এই সময় ইলু এসে ব্যাট-বল রাখে বাবার পাশে। হেমাঙ্গের দিকে তাকায়। হেমাঙ্গ চোখ এড়িয়ে বলে, ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ কেমন চলছে ইলু? চড় খাবার ভয়ে জানতে সাহস পাই নে।

ইলু হাসতে হাসতে বলে, সৈকা পালিয়ে গেছে জানেন না?

বলো কী!

শঙ্করা খ্যাপার তাড়া খেয়ে।

প্রমথ হো-হো করে হেসে ওঠেন। তারপর বলেন, মাকে গিয়ে বল ইলু, হেমাদা এসেছে।

ইলু চলে গেলে হেমাঙ্গ সতর্কভাবে জিগ্যেস করে, জ্যাঠামশাই, ডনের খবর পেয়েছেন ?

প্রমথ নড়ে ওঠে। চাপা গলায় ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, কিছু শুনেছ নাকি ?

না। আমি তো—মানে, অসুস্থই ছিলুম বলতে গেলে। বেরোই নি বিশেষ।

প্রমথ মুখ তুলে গাছপালা দেখতে দেখতে ভারী গলায় বলেন, আমার কেমন যেন ধারণা—পুলিস ওকে গুলি করে মেরে ফেলে রটাচ্ছে, হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে। পায়ে যদি গুলি লেগে থাকে, কীভাবে পালাবে বলো ? আমি তো যতটা করার, ছুটো-ছুটি করে তা করলুমও। জ্ঞানবাবু এম. এল. এ.-কে ধরলুম। বললেন, অ্যাসেমব্লিতে কথা তুলব। রোজ তো কাগজ দেখছি। কই ! তবে জানো হেমা, এ আমি জানতুম। বুঝলে ? ডনকে হাজার বার বলেছি, কানে নেয় নি। আসলে ছেলেটার মধ্যে একটা ব্লাইণ্ড-ফোর্স কাজ করছিল। জাস্ট লাইক এ ম্যাড হর্স !

আপনি ঠিকই বলেছেন জ্যাঠামশাই। হেমাঙ্গ সায় দেয়। তারপর ফের বলে, ওর জন্যে আপনাকেও যথেষ্ট হয়রান হতে হল আর কী !

তা তো হলই। যখন তখন আই. বি. এসেছে। জেরা করেছে। একবার বাড়ি সার্চও করে গেল। তুমি আমাদের ঘরের ছেলে। তোমাকে লুকিয়ে লাভ কী ? প্রমথের মুখে তীব্র ক্ষোভ ফুটে ওঠে। তেতো মুখ করে আলগোছে একটু দূরে এক চিলতে থুথু ফেলেন। তারপর বলেন, ওদিকে ভাইয়ের ওই অবস্থা। এদিকে বোনের এই উদ্ভট অসুখ। বাড়িতে সুখ নেই হে !

হেমাঙ্গ নেহাত কথার ছলে বলে, অমির অসুখ কেমন এখন ?

প্রমথের মুখের বিকৃতি চলে যায়। বলেন, হোমিওপ্যাথি

ইগ্নেশিয়া থাউজেণ্ড এক্স মিরাক্‌ল করেছে বলতে পারো। আর কই, বিশেষ ফিটটিট হয় না। তবে মাথা ঘোরা আর মাথার মধ্যে জ্বালা করা ভাবটা আছে। ওটাও চলে যাবে। তবে ডনের ব্যাপারটা আবার নিশ্চয় জোরালো শক দিয়েছে।

অমি কান্নাকাটি করছে বুঝি?

না, না। জোরে মাথা দোলান প্রমথ। তুমি তো বরাবর দেখছ ওকে। ভেতরে যাই হোক, যত ঝড় জল তাণ্ডব চলুক, মুখ দেখে কিস্যু বোঝার উপায় নেই। টিপিক্যাল ইগ্নেশিয়া ক্যারেক্টার।

এই সময় সুলোচনা এলেন বারান্দায়। কী হেমা! পথ ভুলে নাকি বাবা? হ্যাঁ! ছেলের যে আর পাত্তাই নেই। আজ সকালেই জিগ্যেস করছিলুম পল্টেকে। বলল, বাজারে দেখেছে।

হেমাঙ্গ কাঁচুমাচু মুখে বলে, অসুখ করেছিল জেঠিমা। আপনি ভাল আছেন?

সুলোচনা হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে বাগানে নেমে গেলেন।—এই বাঁদর! ও কী করছিস? দেখছ—দেখছ গাছটা কেমন করে ওপড়াচ্ছে?

প্রমথ হাই তুললেন। দুপুরে খেয়েটেয়ে একটুখানি গড়াই। আজ কী যে হল। শুলুম বটে, কেমন একটা অস্থিরতা! হঠাৎ ডনের জন্যে মনটা কেমন করে উঠল। আফটার অল সেই এ্যাট্রকুন বেলা থেকে মানুষ করেছি ভাইবোনকে। সুমু—ওদের বাবা সুমথকে তোমার মনে পড়বে না। সুমু কিন্তু অত্যন্ত জেণ্টলম্যান ছিল। ওদের মা অবশ্যি একটু জেদী একরোখা টাইপের মেয়ে ছিল। তাহলেও মনটা ছিল ভারী নরম। আমাকে বাবার মতো ভক্তি করত। একবার কী ঝগড়াঝাঁটি করে তিন দিন খায় নি। সুমু টেলিগ্রাম করল। পেয়ে তক্ষুণি চলে গেলুম। আমাকে দেখেই পা জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না। কাছে বসিয়ে খাওয়ালুম। তুমি কল্পনা করতে পারবে না হেমা! তখন ওরা থাকত মণিহারীঘাটে। ডনের বয়স মোটে বছরখানেক হয়েছে।

প্রমথ এরপর ডনের বাল্যজীবন নিয়ে পড়লেন।

হেমাঙ্গের কান অন্যদিকে, মনও অন্যখানে। অমি অভিসার বন্ধ করে দিয়েছে হঠাৎ। দু-একদিন অন্তর বাঁজাডাঙার চটানে, কোনো-দিন রেলইয়ার্ড পেরিয়ে ক্যানেলের পাড় ধরে এগিয়ে পূর্বের মাঠে স্লুইস গেটে, এবং একদিন লোকোশেডের ওদিকে রেলের ফুটবল খেলার মাঠে গেছে দুজনে। রাত আটটা-নটা অব্দি কাটিয়েছে। তারপর হঠাৎ অমির আর দেখা নেই। হেমাঙ্গ অস্থির।

প্রমথ বলেন, তারপর লালুর কথাই ধরো। ও তো তোমার বুজমফ্রেণ্ড ছিল। না কী?

হেমাঙ্গ বলে, হ্যাঁ।

লালুও কেমন ভদ্র শান্ত ছেলে তুমি তো দেখেইছ। কিছুটা বোকাও ছিল যেন। কলকারখানার মধ্যে আনমনে ঘুরতে আছে? অকালে নিজের জীবনটা হারাল।

এবার এল টলু। বারান্দার থামে পিঠ রেখে হেলান দিয়ে হেমাঙ্গের দিকে চেয়ে হাসল। প্রমথ কথায় ডুবে আছেন। হেমাঙ্গ টলুর হাসির জবাব হাসিতে দিল। টলুর স্বাস্থ্য এমন উজ্জ্বল কীভাবে হচ্ছে, হেমাঙ্গ বুঝতে পারে না। হঠাৎ খানিকটা মুটিয়ে গেছে যেন। সচরাচর বিধবাদের চেহারায় একটা ঘষা খাওয়া পাংশুটে ভাব থাকে —টলুরও ছিল, কিন্তু এখন তা নেই। ওর গড়ন এমনিতেই খানিকটা পুরুষালি। হাত পায়ের হাড় মোটা। মুখেও কঠোরতার ছাপ আছে। টলুকে বাঙালী মেয়েদের মোটামুটি সৌন্দর্যর স্ট্যাণ্ডার্ডে ফেলা যাবে না। বরং যেন পাঞ্জাবি মহিলাদের মতো খানিকটা। শালোয়ার কুর্তা পরিয়ে দিলে বাঙালী বলে চেনা কঠিন।

হেমাঙ্গ ইদানীং নিজের গুরুতর পরিবর্তন টের পাচ্ছে! আগে মেয়েদের দেখা মাত্র সেক্সটেক্স মাথায় আসত না। এখন এই কদর্য অনুষঙ্গ—শরীর তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। টলুকে সে বস্তুত উলঙ্গ দেখেই দ্রুত আড়ষ্ট হয়ে পড়ছে। শুধু টলু কেন, যেকোন যুবতীই তার চোখে আজকাল উলঙ্গ হয়ে ধরা পড়ে। মেয়েদের শারীরিক

গঠন, প্রত্যঙ্গ, ভাঁজ এবং টুকরো টুকরো ভাবে বুক, নাভিদেশ, উরু, নিতম্ব, গ্রীবা ও ঠোঁট—এমন কি শ্বাসপ্রশ্বাসের গন্ধ সমেত তাকে বিব্রত করে। আসলে মানুষের শরীরে কত কী তীব্র আনন্দদায়ক ব্যাপার আছে, জানা হয়ে গেলে হয়তো এইরকম হ্যাংলামি প্রথম প্রথম পেয়ে বসে।

টলুকে সে টলুদি বলে। অমির কত বড় সে। অমি বলেছিল, টলুদি সত্যি লেসবিয়ান মেয়ে। হেমাঙ্গ সেই সব ভাবে। আবার এও টের পায়, তার এই ভাবনা খুবই অশালীন এবং তার লালিত-পালিত কিছু মূল্যবোধ হঠকারী ধাক্কায় ভেঙেচুরে গেছে। সে কি লম্পট হয়ে পড়ছে ক্রমশ? অথচ অমির ওই শরীর! অমি শরীর দিয়ে তাকে কব্জা করে ফেলেছে। টেনে নিয়ে চলেছে আরও তীব্র, অসহনীয় এবং জ্বালা-ধরানো চেতনার দিকে। হেমাঙ্গ মাঝে মাঝে ভয়ও পায়।

টলু কি তার চাহনিতে কিছু আঁচ করছিল? মেয়েদের নাকি সেক্সের ব্যাপারে একটা জোরালো ইনটুইশান আছে। সত্য হতেও পারে। টলু পেটের কাছটা আলতো হাতে কাপড় টেনে ঢাকল।

ক্লান্ত প্রমথ বললেন, এবার চা খাওয়ার সময় হয়েছে নিশ্চয়। কী বলো হেমা?

কোনো-কোনো মানুষের ছোটখানো তুচ্ছ কোনো ব্যাপারে শৌখিনতা থাকে। আনন্দ থাকে। প্রমথের আনন্দ এবং শৌখিনতা এই রোয়াকে দুই পা তুলে বসে তারিয়ে-তারিয়ে চা খাওয়া। সময়টা বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে হওয়া চাই। তখন এদিকটায় পুরো ছায়া। বাগানে পাখিরা ডাকাডাকি করে। বর্ণাঢ্য ফুলে ওড়ে প্রজাপতি। সুলোচনা একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে দিয়েছেন নিজের পরিবারের জন্যে। অথচ সাপ থাকার মতো এমন পরিবেশে ডন থাকে। অমি…

না। অমি সত্যি সাপের উপমায় পড়ে না। অমি হৃদয়বতী মেয়ে। প্রেম বোঝে। আবেগ দিয়ে এবং কামনা দিয়ে জীবনকে

আড়ালে নিঙড়ে নিতে চায়। অমিকে উপমায় ধরা যাবে না। ওর মধ্যে বাঘিনীর কঠিন সাহস এবং হরিণীর কোমল ভীরুতা দুই-ই আছে।

সুলোচনা ততক্ষণে জনকে বাগান ঘুরিয়ে দক্ষিণ হয়ে বাড়ি ঢুকেছেন। টলু ফের হেমাঙ্গের দিকে নিঃশব্দে কেমন হেসে চায়ের কথা বলতে গেল। প্রমথ হেমাঙ্গের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বলল, যাক্ গে। অনেক বকবক করা গেল। কথা বলার তো মানুষ পাইনে মোহনপুরে। তোমার সঙ্গেই যা মন খুলে কথা বলি। ব্যাপারটা কী হয়েছে জানো? আমি সবার চোখে দানো হয়ে আছি। ভাবে, প্রমথ বোস মাস্তান গুণ্ডাদের মাইনে দিয়ে পোষে। এ শুধু ডনের জন্যে হে, বুঝেছ? খালি ডনের জন্যে। অথচ মোহনপুরে যারা মাস্তান গুণ্ডা সত্যি সত্যি মাইনে দিয়ে পুষছে, তাদের মুখোমুখি গিয়ে বল্ না তোরা, দেখি কেমন বুকের পাটা?

হেমাঙ্গের দৃষ্টি গেছে গেটের দিকে। অমি ঢুকছে।

এতক্ষণ তাহলে বাইরে ছিল অমি! কোথায় গিয়েছিল? কেন? এই প্রশ্ন মাথায় নিয়ে হেমাঙ্গ তাকিয়ে থাকে। অমির মুখে তাকে দেখে কোনো পরিবর্তন নেই। সে হন হন করে এগিয়ে আসে। হেমাঙ্গ নিজের অজান্তে নিষ্পলক চোখে তাকে লক্ষ্য করে।

প্রমথ বলেন, অমি! গিয়েছিলি নাকি ওখানে? দেখা পেলি?

অমি জবাব দেয়, হ্যাঁ।

প্রমথ হেমাঙ্গের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেন, কী বলল? হেমাও আছে যখন, ওর সঙ্গে কনসাল্ট করা যাক্।

অমি বারান্দায় উঠে তারপর থামে। ঘুরে বলে, ভেল্টুবাবুর কাছে আমাকে আর যেতে বলবেন না। এখন একেবারে উল্টো হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। ইনসাল্টিং টোনে কথা বললেন।

সে কী? কাল সন্ধ্যেবেলা ভেল্টুর সঙ্গে আমার কথা হল!

কী কথা হয়েছে, আপনি জানেন। এরপর ইচ্ছে করলে আপনি যাবেন। বলে অমি ঘোরে এবং পা বাড়ায়।

প্রমথ বলেন, আঃ! কী বলল বলবি তো?

বললেন, রিস্ক নিতে পারবেন না। এসবের মধ্যে উনি আর নেই। জ্ঞানবাবুকে গিয়ে ধরো।

অমি চলে গেল। হেমাঙ্গ অপমান বোধ করবে কিনা ভেবে অস্থির। প্রমথ রাগ দেখিয়ে বলেন, এই হয় রে নেমকহারাম! ঠিক আছে। জ্ঞান তো আছেই। ফিরুকও কলকাতা থেকে। এ্যাসেমব্লি সেশন চলছে তাই।

হেমাঙ্গের মন অমিকে অনুসরণ করেছে। অমি তার দিকে তাকিয়েছে, অথচ কোন কথা ছিল না দৃষ্টিতে। কোন সম্ভাষণ না। হেমাঙ্গ যেন গাছ, না পাথর। কেন এমন করে অমি? মাঝে মাঝে কাছে চলে আসে, এবার তো বড্ড বেশি কাছে এসেছিল, তারপর দূরে ছিটকে যায়। বরাবর এই ওর স্বভাব। যেন লুকোচুরি খেলে।

প্রমথ চাপাস্বরে বলেন, বুঝলে হেমা? ডনের খোঁজখবরের জন্যে ভেল্টু আমাকে কথা দিয়েছিল। ওর সোর্স আছে ওপরে। হঠাৎ নাকি উল্টো গাইছে। মানুষ কী এলিমেণ্ট বুঝতে পারছ? ডন থাকতে ব্যাটা সেলাম ঠুকত।

হেমাঙ্গ উঠে দাঁড়ায়। আজ চলি জ্যাঠামশাই!

প্রমথ ওর হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেন। চা আসছে। বসো। এতক্ষণ তো খালি নিজেদের কথাই বললুম। তোমার কথা শোনা যাক্। ডাবুর ব্যাপারটা কতদূর এগোলো হে? সেদিন চিঠি এসেছে ওর। লিখেছে, হেমা আমার রিপ্রেজেণ্টেটিভ। প্রমথ হা হা করে হাসেন।...ভাল। ভাল। তুমি তো চুপচাপ বসেই আছ। তবে ডাবু এনার্জেটিক ছেলে। ও যা গোঁ ধরে, তাই করে। দেখবে কবে হুট করে এসে কাজে নেমে গেল। আমিও ওর সঙ্গে থাকছি, জানো তো? বলে নি ডাবু?

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, না তো?

জাস্ট কনসাল্ট্যাণ্ট আর কী! প্রমথ হাসতে থাকেন।

তাহলে তো ভালই হবে। আপনি এসব ব্যাপারে এক্সপিরিয়েন্সড!

এই সময় ট্রে সাজিয়ে ইলু চা আনল। গরম-গরম কচুরীও আছে। প্রমথ খুশি হয়ে বলেন, খাও হে! এই একটা কথা সব সময় মনে রাখবে। খাওয়া পেলে কিছুতেই ছাড়তে নেই। বিশেষ করে তুমি বামুনের ছেলে!

হেমাঙ্গের সব তেতো লাগে। বিকেলের ছায়াভরা বাগানে বসন্তকাল আপন খেয়ালে চনমন করে বেড়াচ্ছে। কতরকম মিঠে ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে আসে। কত শব্দ। এমন একটা সময়ে অমির মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা বুকে জোর বাজে। এখনও অমির চুলের গন্ধ সব ছাপিয়ে তার স্নায়ুকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। খুব অসহায় মনে হয় নিজেকে। সংশয় কুটকুট করে জ্বালা দেয়। তাহলে কি শরীরের বিপজ্জনক খেলায় মেতে ওঠাটা ঠিক হয় নি?

অমি অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকলে তার কাছে যাওয়া যেত। প্রমথই যেতে বলতেন। অমিকে ছেড়ে সৈকার ভূত কেন যে পালিয়ে গেল!

হেমাঙ্গ ওঠে। প্রথম বলেন, শীগগির এসো আবার। তোমাকে দেখলে খুব ভাল লাগে বাবা!

হনহন করে সে গেট পেরিয়ে চলে যায়। রাস্তায় নেমে একবারও ঘোরে না। ঘুরলে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দোতালায় জানলার কাছে অমিকে দেখতে পাওয়ার চান্স ছিল।

বাজারের দিকে চলতে থাকে সে। তরুণ সংঘে গিয়ে আড্ডা দেওয়ার ইচ্ছে করে। কত দিন যাওয়া হয় নি। অথচ সে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য। এখন যেতে যেতে মনে হয়, মন দিয়ে ক্লাব-ট্লাবের কাজে লেগে যাবে।

হেমাঙ্গ চলে যাওয়ার একটু পরে সুলোচনা সময় পেয়ে রোয়াকে এলেন। এসে হেমাঙ্গের খোঁজ করলেন।

প্রমথ বললেন, হেমা এই মাত্র গেল। ইলুদের বলো না গো, দুটো বেতের চেয়ার এনে দিক। বাগানে একটু বসি। আজ পঞ্চমী না?

সুলোচনা একটু হাসেন। চাঁদের আলো দেখবে?

দেখিই না। কত কাল কিছু দেখি না।

হঠাৎ এ ভাবের উদয় কেন? উঁ? বলে সুলোচনা মেয়েদের ডাকেন। কয়েকটি সন্তান থাকলে এ গোলমাল সবারই হয়। ইলু বলতে মিলু, বুলু বা টলু হুটপাট করে মুখ দিয়ে বেরুতে থাকে, শেষে হেসে তুঃছাই বলেন। শেষে টলু আসে। হুকুম সেই পালন করে।

এখনও অবশ্য সূর্যাস্ত হয় নি। এলাকায় প্রচুর গাছপালার জন্যে মনে হচ্ছে দিনটা ফুরিয়ে গেল বুঝি। বাগানের দক্ষিণে উঁচু গাছ নেই। ফুলবাগিচা ওটা। পল্টু মালীর কাজ করে মাঝে মাঝে। ঘাসছাঁটা মস্তো কাঁচি চালিয়ে জল ছড়িয়ে সবুজ চিকন ভাব জাগিয়ে রেখেছে। ওখানে পশ্চিমের উঁচু শিরিষ আর অর্জুনের ছায়া এসে পড়েছে। ব্রিটিশ আমলে ওই দিকটায় মিলিটারি ছাউনি ছিল সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তারও আগে কোন যুগে ছিল সাহেবদের রেশমকুঠি। গাছগুলো সেই আমলের। এখন ভাঙাচোরা কিছু ঘর, মোটা মোটা থাম দাঁড়িয়ে আছে। কিছু ঘর সারিয়ে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা কেউ কেউ বাস করছে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে উঁচু পোড়ো জলের ট্যাঙ্কটা দেখতে পাওয়া যায়। শোনা যাচ্ছে, ওখানেই নাকি সুগার মিল হবে।

ফুলবাগিচার লনে কেয়ারীকরা ঘাসের ওপর বেতের চেয়ার আধুনিক জীবন-যাপনের ভঙ্গী হলেও প্রমথ তাঁর চিরাচরিত ঢঙে ঠ্যাঙ তুলে বসবেন। কাপড়ের ফাঁকে হাত গলিয়ে চুলকোনোর অভ্যাসও আছে। টলুকে দেখে সংযত হলেন। টলু বসবি তো আরেকটা চেয়ার নিয়ে আয়। বলে প্রমথ সুগার মিলের কথা তুললেন।

মধ্যে অনেকদিন ডনের ব্যাপার নিয়ে মানসিক অশান্তি গেছে। কী হয় কী হয় আতঙ্ক ছিল সারাক্ষণ। তাই এভাবে পারিবারিক আড্ডা জমে নি। এখন অবস্থা থিতিয়ে এল। তাছাড়া শেষ চৈত্রে চাঁদনী রাতে এখানে বসে থাকতে এ বাড়ির ছোটবড় সবারই ভাল

লাগে। শুধু এ বাড়ি কেন, আশেপাশে সব বাড়ির লোকেরাই তাই করে।

টলুর দেখাদেখি জন এল হেলতে তুলতে। বুকের ওপর তার ছোট্ট রঙীন মোড়া চেপে ধরে এল এবং গম্ভীর মুখে বসল। তারপর দেখা গেল ইলুও আসছে। সে ঘাসে হাঁটু তুমড়ে বসল এবং ফ্রকের ঘের দিয়ে পায়ের অনেকটা সতর্কভাবে ঢেকে রাখল।

সুলোচনা বলেন, মিলু এল না?

টলু ডাকে, মিলু! ও মিলু? মা ডাকছে। এখানে আয়।

অমির কথা যেন কারুর মনে নেই। মিলু আসার পর প্রমথ চাপা হেসে বলেন, টলু, ঘণ্টার মা বেরোয় না যেন, বেরুলেই ধরবি।

সবাই হাসে, এ কথায়। এমন কি জনও খিটখিট করে হেসে ওঠে। তবে পল্টু ও ঘণ্টার মা এ বাড়িতে চুরির ব্যাপারে অদ্ভুত ব্যালান্স। তুজনে নাকি কড়া শত্তুর পরস্পরের এবং উভয়ে উভয়ের দিকে লক্ষ্য রাখে, কে কাকে বমালসুদ্ধু ধরিয়ে হেনস্থার চূড়ান্ত ঘটিয়ে তাড়াবে, সেই সুযোগ খোঁজে।

এই পারিবারিক সম্মেলনে হাজারটা প্রসঙ্গ ওঠে। পৃথিবীর এবং মোহনপুরের তাবৎ ব্যাপার-স্যাপারকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। প্রমথ আজ পড়েছেন সুগার মিলের সূত্রে দ্বারিক গোঁসাইকে নিয়ে। দ্বারিক গোঁসাই মোহনপুরের ডাক্তার, জননেতা. আবার নতুন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান জ্ঞানবাবু এম. এল. এ.-র ডান হাত। কিন্তু সুগার মিলের পেছনে বাগড়া দিচ্ছেন দ্বারিকই, জ্ঞানবাবু সেটা বুঝতেই পারছেন না। ওঁকে বোঝালে খাপ্পা হয়ে যাবেন। এই হল প্রমথের মত। প্রমথ সিরিয়াস আলোচনা করলে তাঁর পরিবার গম্ভীর হয়ে শুধু শোনে মাঝে মাঝে সুলোচনাই যা ফুট কাটেন।

ইতিমধ্যে সূর্যাস্ত হয়েছে। সুলোচনা টের পেয়ে উঠে যান টলুকে নিয়ে। প্রমথ আবার চায়ের ফরমাস করতে ভোলেন না। একটু পরে শাঁখ বেজে ওঠে বাড়িতে। আলো জ্বলে।

এতক্ষণে প্রমথের মনে পড়ে অমির কথা। বলেন, অমি এল না যে? ইলু, অমি কী করছে রে?

মিলু বলল, ডনের ঘরে শুয়ে আছে।

ডনের ঘরে? ও ঘরে তো তালা আটকে দিয়েছিলুম। চাবি কোথায় পেল?

প্রমথকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। এ তো রীতিমতো রহস্য। ডনের ঘরের তালাটা অবশ্য পুরনো। ডনের কাছে একটা চাবি থাকত। মাঝে মাঝে তাকে তালা আটকাতে দেখা যেত। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই তালা নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু ডনের চাবিটা অমি কেমন করে পাবে?

ইলু বলল, আজ সকালেই তো ছোড়দিকে দেখলুম ডনদার ঘরের দরজা খুলতে।

জিগ্যেস করিস নি ওকে?

ভ্যাট্! আমি কেন জিগ্যেস করতে যাব?

প্রমথ চাঞ্চল্য চেপে বসে রইলেন। মিলু বলল, আয় জন। মাস্টারমশাই এসে যাবেন।

জন বড়দের ভঙ্গীতে হাই তুলে বলল, ঘুম পাচ্ছে!

মিলু বলল, ও ইলু! আচায্যিদের খোকনের মতো আজ পল্টেকে বসিয়ে দিচ্ছি মাস্টারমশায়ের কাছে।

অন্যমনস্ক প্রথম বলেন, সে কেমন?

বাবা, জানো? খোকন নাকি স্কুলে গিয়ে ওদেব চাকরকে ক্লাস করতে ঢোকায়। নিজে বাইরে খেলা করে। প্রক্সি!

প্রমথ শুকনো হাসলেন। এরা দুই বোনে খুব হাসাহাসি করল। সেই সময় সুলোচনা এলেন। মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর। পূর্বে বাড়ির সামনে রোয়াকের মাথায় আলোটা জ্বলছে। তার ছটা টেরচা এসে পড়েছে মুখে। নিজের চেয়ারটাতে বসে বলেন, জন, ঢুল'ছিস কেন? মিলু, ওকে নিয়ে যা তো। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ঘুম পায়। যাও, এক্ষুণি মাস্টার এসে যাবে।

মিলু জনকে মোড়াসুদ্ধ তুলে নিয়ে গেলে জন আপত্তি করে না, তারপর সুলোচনা বলেন, ইলু, আর কী ? পড়তে বসো গে।

ইলু চলে যাবার তালেই ছিল। সে গেলে প্রমথ বলেন, অদ্ভুত ব্যাপার তো। অমি নাকি ডনের ঘরে শুয়ে আছে। ইলু সকালেও কখন ডনের ঘরের তালা খুলে ঢুকতে দেখেছিল ওকে। চাবি কোথায় পেল ? চাবি তো আমার ড্রয়ারে ছিল।

সুলোচনা গলা চেপে বলেন, হতভাগী মেয়ের পেটে এত কথা চাপা থাকে ! আশ্চর্য, আশ্চর্য ! আমি তো থ হয়ে গেলুম। আজ দুপুরে তোমাকে বলে গেল, ভেল্টুবাবুর কাছে যাচ্ছে।

আহা, সে তো আমিই পাঠালুম।

ফিরে এসে কী বলেছিল তোমাকে ?

বলল, ভেল্টুবাবু ইনসালটিং টোনে কথা বলেছে। ও নাকি কিছু করবে-টরবে না।

আশ্চর্য ! অথচ···

অথচ কী ? আহা, বলো না কী ব্যাপার ?

কী মিথ্যাবাদী মেয়ে দেখছ ? ঢঙ দেখিয়ে ভেল্টুর কাছে গেল। এদিকে গত রাতে ডনের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। দেখা যদি হয়েছে, তো বললে কী হত তোর ? এদিকে ভেবে ভেবে আমাদের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ ! প্রমথ হতভম্ব হয়ে চেয়ার থেকে ঠ্যাং নামিয়ে সোজা হন। কোথায় দেখা হল ? কীভাবে দেখা হল ? অমি কি কাল সন্ধ্যার পর বেরিয়েছিল ?

একটু চুপ করে থাকার পর সুলোচনা বলেন, গিয়ে দেখি ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। প্রথমে অতটা লক্ষ্য করি নি, টুলুই বলল, দেখ মা, ডনের ঘরে আলো জ্বালাল কে ? তখন উঠে গেলুম। গিয়ে দেখি, চুপচাপ শুয়ে কাঁদছে ! আমাকে দেখে কান্না লুকোবার চেষ্টা করল। তো আমি জিগ্যেস করলুম, জেঠুর কাছে চাবি এনেছিস নাকি ? বেশ করেছিস। আজ থেকে এ ঘরেই শো। পুব-দক্ষিণ

খোলা। বিছানাটাও ভাল। আরামে ঘুমোতে পারবি। তখন হতচ্ছাড়ী ফুঁপিয়ে উঠে বলল, জেঠিমা, ডন মোহনপুরে এসেছে।

সুলোচনা আরও গলা চেপে ফিসফিস করে বলেন, কাল বিকেলে কোথায় ঝেণ্টু ছোকরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ঝেণ্টু ওকে জানায় ব্যাপারটা। ডনের পায়ে ব্যাণ্ডেজ আছে। ওই অবস্থায় কার ট্রাকে চলে এসেছে।

বিরক্ত প্রমথ বলেন, আহা! আছে কোথায় সে?

পাশের গ্রামে, কী যেন, হাঁড়িভাঙ্গা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। হাঁড়িভাঙ্গা। সে তো চাষাভূষোর গ্রাম।

ডন ওখানে কার বাড়িতে আছে। কিন্তু হারামজাদী মেয়ে আমাদের তো বলবি। না বলে কখন রাতে চুপিচুপি বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। আমরা কেউ টের পাই নি। ঝেণ্টু ওকে নিয়ে গেছে সেখানে। ডনের সঙ্গে দেখা করে এসে কখন বাড়ি ঢুকেছে, তাও আমরা এতটুকু টের পাই নি। কেন? এই লুকোচুরির দরকারটা কী ছিল, অ্যাঁ? আমরা আজ পর হয়ে গেলুম রাতারাতি? বলো তুমি, কী মানে হয় এর?

সুলোচনা আবেগ চাপতে পারলেন না। সাবধানে চুপি চুপি কেঁদে ফেললেন। প্রমথ বললেন, সত্যি বড় অদ্ভুত ব্যাপার অমির। তাছাড়া, ও ওভাবে মুসহর ছোকরার কথা বিশ্বাস করে গেলই বা কোন আক্কেলে? ছোকরা তো একের নম্বর মাস্তান। লম্পটের হদ্দ। স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

কান্না জড়ানো স্বরে সুলোচনা বলেন, যদি কথাটা মিথ্যা হত? যদি ওই গুণ্ডার সঙ্গে অমন করে গিয়ে বিপদেই পড়তিস! একে তো তোর ওই মারাত্মক রোগ। সেই কোথায় ক্যানেলের ধারে ধারে এতখানি পথ গেছে গুণ্ডাটার সঙ্গে। ভাবতে আমার গা কাঁপছে!

তুমি বকলে না? কী বলছে ও?

পা ছুঁয়ে কান্নাকাটি করল। হঠাৎ ডনের খবর পেয়ে মাথার

নাকি ঠিক ছিল না। তাছাড়া ডন নাকি আমাদের কানে তুলতে নিষেধ করেছিল।

ডন নিষেধ করেছিল? অসম্ভব। সে জানে না, আমাদের মনের অবস্থাটা কী? ভীষণ মিথ্যাবাদী মেয়ে।

কে জানে! তাই তো বলল। তুমি বরং ওর কাছে পুরো ব্যাপারটা জেনে নাও। আমি তো শুনে থরথর করে খালি কেঁপেছি। মানে, অমির কাণ্ড শুনে। কী সাহস, কী সাহস! ছি, ছি! তুই এডুকেটেড মেয়ে, তোর বাবা জ্যাঠার মান-সম্মান আছে দেশে। দৈবাৎ যদি পুলিসের পাল্লায় পড়তিস, তাহলে কী হত? ছি ছি ছি! ছিঃ!

প্রমথ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকার পর বলেন, এতে অবশ্য আমি অবাক হচ্ছিনে। তুমিই বা কেন অবাক হচ্ছ, ভেবেই পাইনে। ও কি তোমার টলু, না বুলু, না ইলু-মিলু? ও তো বরাবর ওইরকম! একাদোকা যেখানে খুশি যখন খুশি ঘুরে বেড়ায়। বুধনী বহরীর কাছেই শুনেছি, ওর মেয়ের সঙ্গে অমির ভাব ছিল নাকি। রেল-ইয়ার্ডের দিকটায় ঘুরে বেড়াত। কিন্তু ডন…ডনটা এ কী করল?

প্রমথ বিচলিতভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তারপর একই সুরে বলেন, চা করছে টলু?

তরুণ সংঘের দিকে যেতে যেতে হেমাঙ্গ ঘুরেছিল। এ এমন একটা সময়, কিছু ভাল লাগবার নয়। আরও একা হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। সে বাজার এড়িয়ে উলটোদিকে ঘুরে হাইওয়েতে পৌঁছেছিল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে প্রসাদজীর ইট ও টালিভাটা ছাড়িয়ে কাঠগোলার কাছাকাছি যেতেই দেখল, গুলাই হোটেল-ওয়ালা আসছে।

গুলাইয়ের কাঁধে ব্যাগ ঝুলছে। পায়ে হেঁটে কোত্থেকে আসছে সে? হেমাঙ্গ বলে, কী গুলাইদা, কেমন আছ?

গুলাই তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে। কাঠখোট্টা শুকনো শরীর।

তামাটে রঙ। ওর দাঁতগুলো দেখার মতো, সুন্দর সরু সরু দাঁত, নিখুঁত অর্ধবৃত্ত সাজানো। শুধু সামনের একটা দাঁত সোনার। পাতলা ঠোঁট। হাসলে লোকটাকে অমায়িক দেখায়। পরনে ঢোল খাকি পাতলুন, হাতগুটোনো সাদা শার্ট, পায়ে এবড়োখেবড়ো চপ্পল। ঠুনঠুন শব্দ হয়।

গুলাইকে ছেলেবেলা থেকে একইরকম দেখছে হেমাঙ্গ। সেই পাতলা লালচে চুল, মাঝখানে সিঁথি। রোগাটে গড়ন। চোখের তারা পিঙ্গল। সচরাচর এমন চোখ যাদের, তারা নাকি ধূর্ত হয়। গুলাইকেও অন্তত একটা কারণে ধূর্ত বলা যায়। হোটেলের আড়ালে তার নাকি চোলাই মদ, গাঁজা আফিং চরসের কারবার আছে। মজার ব্যাপার, ওর হোটেলের নাম 'শুকতারা' কে এমন দারুণ নামটা রেখেছে, জানতে ইচ্ছে করেছে হেমাঙ্গের। জিগ্যেসই করা হয় না।

গুলাই বলে, হেমাংবাবু যে! বেড়াতে বেরিয়েছেন?

হুঁ। তুমি কোত্থেকে আসছ এভাবে?

গাঁয়ে গিয়েছিলুম। মাছ বলতে। গুলাই পকেট থেকে চার্মিনার বের করে বলে, খান হেমাংবাবু। গরিবের সিগারেট।

অগত্যা হেমাঙ্গ একটা সিগারেট নেয়। গুলাই দেশলাই যত্ন করে জ্বেলে দিয়ে ফের বলে, মাছ সাপ্লাই নিয়ে যা প্রোবলেম হচ্ছে! রেগুলার সাপ্লাই দ্যায় না। কাঁহাতক আর ঝামেলা করি। এদিকে টাকাও দিচ্ছি এ্যাডভান্স। শেষে আরেক জায়গা গিয়েছিলুম। দেখা যাক।

ডেলি কত মাছ লাগে গুলাইদা? হেমাঙ্গ এমনি জানতে চায়।

গুলাই বলে, গড়ে ডেলি বারো কিলো এখন লাগে। পুজোর আগে থেকে এটা বাড়ে। ষোল, কোনদিন কুড়ি অব্দি। মার্চ অব্দি এমন। ফেলাকচুয়েট করে, হেমাংবাবু।

ফ্লাকচুয়েট করার কারণ কী?

লোক সমাগম যখন যেমন। খরার সময়টা মোহনপুরে লোক

আসে কম। তবে বছরে বছরে লোক আসা বাড়ছে। আমার নেহাৎ ছোট্ট হোটেল। দশ জন একসঙ্গে ঢুকলেই টেক্ল করা কঠিন।

আচ্ছা গুলাইদা, তুলো কোথায়? তাকে তো অনেক দিন দেখছিনে।

ওর নাম আর করবেন না হেমাংবাবু। হাড়ে বাতাস খাচ্ছি এখন। গুলাই তেতো মুখে বলে।

একটা ট্রাক চলে যায় ধুলো উড়িয়ে। তুজনে সরে ঘাসে গিয়ে দাঁড়ায়। হেমাঙ্গ বলে, পালিয়েছে তাহলে?

কে জানে! ওর খবর আমি রাখিনে। নেহাত মায়া বসেছিল, রহমান সাহেব মারা যাওয়ার পর ছোঁড়াটা এখানে ওখানে কাটায় দেখে কষ্ট বাজল মনে। এক বর্ষার রাত খুব বৃষ্টি হচ্ছে। কী খেয়াল হল, জানলা খুলে টর্চ জ্বাললুম। তার মধ্যে দেখি জানলার নীচে কুঁকড়ে শুয়ে আছে একহাত জায়গায়। বৃষ্টির ছাঁট গায়ে লাগছে, ডেকে ঘরে ঢোকালুম। গুলাই ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে দূরের আকাশ দেখতে থাকে।

হেমাঙ্গ বলে, চলি গুলাইদা!

আচ্ছা! হোটেলে মাঝে মাঝে যাবেন দয়া করে।

আণ্ডা-পরোটা খাওয়াবে তো? আর কাবাব!

গুলাই হাসে। সে আর বলতে? নতুন বাবুর্চি এনেছি শোনেন নি!

হেমাঙ্গ পা বাড়ায়। ডাবু, লালু আর সে গোপনে 'শুকতারায়' ঢুকে কাবাব খেয়ে আসত। দেখতে দেখতে কত বছর কেটে গেল। সব চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে ভাসে। লালু জামসেদপুরে যাওয়ার পর হেমাঙ্গ অন্য কাউকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। সে আঁতকে উঠেছে। মুসলমানের হোটেলে গিয়ে খাওয়ার কথা মোহনপুরে দশ বছর আগেও ভাবা যেত না। আজকাল প্রকাশ্যে খায় অনেকে। এমন কী, তুপুরের দিকে স্কুল কলেজের মেয়েরাও গিয়ে কাবাব খেয়ে

আসে। শুকতারার সাইনবোর্ডে লেখা আছে : নো বিফ। সামান্য দূরে রঞ্জিতলাল জৈন অস্থায়ী সিনেমা হল বানিয়েছিলেন, টিনের শেড। ইটের দেয়ালে মসলা ছিল কাঁচা। অর্থাৎ কাদার। হঠাৎ গত বর্ষায় নাইটশো চলার সময় আচমকা দেয়াল ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। জনা কুড়ি সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ে। অজস্র জখম হয়। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। বেশির ভাগই আশেপাশের গ্রামের লোক।

তবে মার্চ নাগাদ রঞ্জিতজী সব সামলে নিয়েছিলেন। পুরোদস্তুর কংক্রিট কাঠামো উঠছে সিনেমা হলের। সামনে পুজোয় ওপেনিং।

বিচিত্র তামাশা! হেমাঙ্গের দুঃখ হচ্ছে, হুলোটা গুলাইয়ের বশ মতো চললে রাজা হয়ে যেত। ডনই তো তার মাথাটা খেয়েছে। ডন যেন এই উঠতি শহরটাকে ইম্মরাল করে ছেড়েছে। জগদীশ যা শুরু করেছিল, ডন তা শেষ করে আনছিল প্রায়। এখন ডন বেপাত্তা। কিন্তু তার সঙ্গীরা তো আছে।

হেমাঙ্গ কাঠগোলা ছাড়িয়ে গিয়ে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছল। একটা ব্রিজে বসে সূর্যাস্ত দেখতে থাকল।

।। আট ।।

সে-রাতে হেমাঙ্গ ঘুমোবার প্রচণ্ড চেষ্টা করছে, পারছে না। বাইরে রাতের প্রতিটি সূক্ষ্ম শব্দ খুব বড়ো হয়ে তার অনুভূতিতে ধাক্কা দিচ্ছে। রেলইয়ার্ডেও কাল রাতে কী যেন গণ্ডগোল ঘটেছে। ইঞ্জিনগুলো খেপে শেড থেকে যেন বেরিয়ে পড়েছে। ওয়াগন এবং বগির পাল মাটি কাঁপিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। মুসহর বস্তিতে কুকুর-গুলো ভয় পেয়ে প্রচণ্ড চেঁচামেচি জুড়েছে। এত বেশী আওয়াজ!

অথচ মোহনপুরের এদিকটা নিঃঝুমই থাকে। কেন এমন হচ্ছে ভাবতে গিয়ে হেমাঙ্গ টের পাচ্ছিল, আসলে ঘুম ও স্বপ্নের মাঝামাঝি একটা নোম্যান্সল্যাণ্ডে সে আটকে গিয়েছিল।

এ ঘরে ফ্যান নেই। কারণ পিসেমশায়ের আমলে এ পাড়ায় বিদ্যুৎ আসে নি। গরমের ঋতুতে জানলা খোলা রাখলে প্রচুর হাওয়া ঢোকে, তাই ফ্যানের গরজ দেখা দেয় নি এখনও। বরং আজকাল শেষ রাতে কষ্ট করে উঠে জানলা বন্ধ করে দিতে হয়। বেশ শীত পড়ে। হেমাঙ্গের কোনো-কোনো রাতে উঠতে ইচ্ছে করে না বলে সকালে টের পায়, গলা ব্যথা করছে। বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা জমে গেছে। তখন নুনজলের জন্যে মুনাপিসিকে ফরমাস করতে হয়। মুনাপিসি সেজন্যেই রোজ শোওয়ার সময় ওর মাফলারটা বালিশের পাশে রেখে যায় এবং পইপই করে মনে করিয়ে দেয়।

এমনিতেই হেমাঙ্গের সুনিদ্রা হয় না। তাই অসংখ্য সিগারেট খায়। অ্যাসট্রের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে।

সকালে সেটা খাটের তলায় ঢুকিয়ে অর্থাৎ লুকিয়ে তারপর দরজা খোলে সে। মুনাপিসি জানে, হেমাঙ্গ সিগারেট খায়। অনেক সময় পেছনে জ্বলন্ত সিগারেট লুকিয়ে রেখেও সে পিসিমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। তবু এখনও সামনাসামনি সিগারেট খেতে বাধে।

হেমাঙ্গ দেখল, ঘুম যখন হবেই না একটা কিছু করা যাক। সে

উঠল এবং টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল। বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে সে ডাব্বুর পাঠানো প্যাডটা টেনে নিল। ডটপেন দিয়ে পাশে তাকানো নানা রকম মুখ, পাখি, হাতি, মোটরগাড়ি আঁকতে থাকল। কুকুর আঁকতে সে পারে না। ছাগল হয়ে যায়। ঘোড়া আঁকতে গেলে মোষ হয়ে ওঠে। হঠাৎ তার মাথায় অশ্লীল ইচ্ছে সুড়সুড় করে উঠল। ঠোঁটে হাসি রেখে সে নগ্ন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক আঁকতে বসল। গোপন প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত। তারপর ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দিল। মুনাপিসি সকালে ঘর সাফ করতে এসে পাছে দেখে ফেলে, টুকরোগুলো যতটুকু পারা যায় কুচি করে ফেলল। তারপর অমির নাম লিখতে শুরু করল। কয়েকটা নাম লেখার পর কারুকার্যে শিল্পমণ্ডিত করে তুলল সেগুলোকে।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সে ছিঁড়ে ফেলল পাতাটা। কুচোকুচো করে দুমড়ে টেবিলের তলায় ফেলে দিল। তারপর ভাবল, অমিকে একটা চিঠি লিখবে। খুব লম্বা চিঠিই হবে। সম্পর্ক শেষ করে দেওয়ার চরম নোটিশ। এটা খুব জরুরী মনে হল হেমাঙ্গের।

গুরুগম্ভীর শব্দ ভেবে নিয়ে সে সবে জোরালো হরফে অমি লিখে কমা দিয়েছে, পেছনে রাস্তার দিকের জানলায় খুটখুট আওয়াজ হল।

হেমাঙ্গ চমকে ঘুরে বসল। জানলার বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় শালকাঠের খুঁটিতে বাল্ব আছে। কিন্তু কদিন থেকে জ্বলছে না। এ বাড়িটা একেবারে শেষপ্রান্তে। জ্বললেও সামনের রাস্তা অব্দি আলো খুব সামান্যই আসে।

ঘরের টেবিল-বাতির বাল্বটা পনের ওয়াটের। শেড আছে। তার পেছনে জানলা অব্দি এর ফিকে ছটা ময়লা কাঁচের মতো ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু হেমাঙ্গের চিনতে ভুল হয় না। এক ঝলক রক্ত শিসিয়ে ওঠে তার হৃদ্‌পিণ্ডে। উরু ভারি লাগে। শরীর কেঁপে ওঠে।

তারপরই তার সব ক্ষোভ দুঃখ অভিমান ঘুচে যায়। সে উঠে

গিয়ে সাবধানে দরজা খোলে। অমি ঘরে ঢুকে ফিসফিস করে বলে, আলোটা নেভাও আগে।

হেমাঙ্গ দরজা ভেজিয়ে দিয়ে অবশ হাতে টেবিল ল্যাম্পটা নিবিয়ে দেয়। অমি বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসেছে। হেমাঙ্গ নিঃশব্দে বসে তার পাশে। এখনও বুঝতে পারছে না এটা স্বপ্ন কি না।

অমি ফিসফিস করে, ভীষণ দরকার তোমাকে। আমার সঙ্গে এখুনি বেরুতে হবে। যেতে পারবে?

কোথায়?

বাইরে গিয়ে বলব। পারবে যেতে?

হেমাঙ্গ বাড়ির ভেতরদিকে মুনাপিসিকে অনুভব করে নিয়ে বলে, হুঁউ। কিন্তু একটু বসো।

না। দেরি করা যাবে না। শীগগির ফিরতে হবে।

হেমাঙ্গ তার একটা হাত অন্ধকারে নিয়ে বলে, কোথায় যাবে? কী ব্যাপার?

পরে শুনবে। চলোই না।

হেমাঙ্গ নিজের শরীরের আবেগ দমন করতে কষ্ট পায়। বলে, কিন্তু একটা শর্ত।

কী?

ফিরে এসে কিছুক্ষণ থাকবে আমার কাছে।

চেষ্টা করব।

চেষ্টা না। বলো, থাকবে কিছুক্ষণ!

থাকব। ওঠ! বলে অমি উঠে দাঁড়ায়। ফের বলে, টর্চ আছে তোমার কাছে?

আছে। ব্যাটারি কমে গেছে। দেখছি। বলে হেমাঙ্গ তাক খুঁজে টর্চটা নেয়। পাঞ্জাবিটা পরে। তারপর অমির কাঁধে হাত রেখে বলে, চলো। এবং পায়ে স্লিপারটা গলিয়ে নেয়।

বাইরে বারান্দায় গিয়ে সে দূর অব্দি রাস্তাটা দেখে নেয়। অন্ধকারে গাছপালা শনশন করছে। সামান্য দূরে একটা বাড়ির মাথায়

মিটমিটে একটা বাম্ব জ্বলছে। কেউ নেই। সে বলে কিন্তু দরজাটা ?

একটু রিস্ক নাও না।

হেমাঙ্গ দরজার কপাট বাইরে থেকে টেনে ভেজিয়ে রাখে। অমি রাস্তায় নেমেছে তখন। হেমাঙ্গ রাস্তায় নামলে সে হাঁটতে থাকে। এদিকে শ্মশানবট অব্দি পৌঁছেছে রাস্তাটা। দু' ধারে টুকরো ক্ষেত আর আগাছার জঙ্গল। বাঁদিকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে খাল। খালের ওপারে মুসহর বস্তি এবং রেলইয়ার্ড। রেলইয়ার্ডের বেশি রকম উঁচু পোস্টগুলো থেকে দুধের মতো সাদা ল্যাম্প থেকে অনেক দূর অব্দি আলো ছড়িয়ে রয়েছে। তাই আত্মগোপনের সুযোগ নেই। হনহন করে কিছুটা এগিয়ে বাঁয়ে ঘোরে অমি। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে খালের ধারে পৌঁছায়। হেমাঙ্গ এবার অস্বস্তিতে পড়ে যায়। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে ? খুব সংশয়ে পড়ে যায় সে। অমিকে বিশ্বাস করবে, না করবে না—কারণ এভাবেই অনেক সময় খুন-খারাপি হয়ে থাকে, হেমাঙ্গ সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে হঠাৎ থেমে বলে—কী ব্যাপার আগে বলো ? এভাবে জঙ্গল ভেঙে আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

খালের ধারে সরু পায়ে চলা পথ আছে। দু' পাশ থেকে ঘাস আর ঝোপ উপচে এসেছে। সাপের ভয় আছে। হেমাঙ্গ পায়ের কছে টর্চ জ্বেলে ফের বলে, অমি !

অমি বলে, শোন। এখানটায় বেশি জল নেই। একটু কাদা হতে পারে। ধুয়ে নেওয়া যাবে পরে।

সে পায়ের স্লিপার খুলে হাতে নেয় এবং হাঁটু অব্দি কাপড় তুলে জলে নামে। হেমাঙ্গের পরনে লুঙ্গি। সেও স্লিপার খুলে তার পেছনে পেছনে খাল পেরোতে থাকে।

খালের পারেই রেলের কাঁটাতারের বেড়া। জঙ্গল গজিয়ে আছে। স্লিপার হাতে নিয়ে দু'জনে বেড়ার ধার ঘেঁষে কিছুটা যাওয়ার পর যেখানে বেড়া অনেকটা ফাঁক হয়ে আছে, সেখান দিয়ে

গলিয়ে রেলইয়ার্ডে ঢোকে। ওয়াগনের দঙ্গল এদিকটায়। হেমাঙ্গ বলে, সেন্ট্রিদের চোখে পড়তে পারে। তুমি কী করছ, বুঝতে পারছি নে!

অমি বলে, আহা! এসো না।

হেমাঙ্গের মনে হয়, এসব জায়গা অমির মুখস্থ। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর রেলইয়ার্ড শেষ হয়েছে। ডেডস্টপের ঘাসে ঢাকা একটা ঢিপির পাশ কাটিয়ে ফের বেড়ার মস্তো ফাঁক গলিয়ে তুজনে চলতে থাকে। বাঁয়ে রেললাইন, ডাইনে পোড়ো জমি এবং খাল। খাল ঘুরেছে যেখানে, সেখানে রেলব্রিজ। তুজনে ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে খালের পাড়ে পায়ে চলা রাস্তায় ওঠে। খাল এখানে পূর্বে ঘুরে মাঠের দিকে চলেছে। কিছুটা দূরে একটা স্লুইস গেট আছে।

স্লুইস গেটের কাছাকাছি গিয়ে হেমাঙ্গ বলে, সিগারেট ধরাব এবার। অসহ্য লাগছে।

হ্যাঁ। ধরাও।

এখানে ফাঁকা মাঠ। খালের তুধারে ধান চাষ হয়েছে। উত্তরে কিছুটা দূরে রেলইয়ার্ডের আলো জুগজুগ করছে। হুহু করে বাতাস বইছে। অনেক কষ্টে সিগারেট ধরায় হেমাঙ্গ। তারপর পা বাড়িয়ে বলে, কোথায় যাচ্ছি এবার বলো!

আকাশ জুড়ে নক্ষত্র। ক্যানেলের উঁচু পাড়ে সরু পায়ে চলা রাস্তাটা ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে। আর টর্চ না জ্বাললেও চলে। অমি পিছিয়ে হেমাঙ্গের বাঁ কনুইয়ের ওপরটা ধরে এবং গা ঘেঁষে হাঁটতে থাকে। তারপর বলে, তোমার ভীষণ ভয় করছিল, জানি।

না, ভয় ঠিক নয়। হেমাঙ্গ হাসবার চেষ্টা করে। তোমার কাণ্ড দেখে অস্বস্তি হচ্ছিল।

তোমাকে ফাঁদে ফেলতে ডাকি নি।

কিসের ফাঁদ? য়াঃ! আমি তা ভাবব কেন?

অমি তার বাহুতে গাল রেখে হাঁটে। বলে, তুমি না এলে তোমার সঙ্গে রিলেশন শেষ হয়ে যেত, জানো?

বলো কী! বলে হেমাঙ্গ বাঁহাতে অমির কাঁধ ঘিরে রাখে।

অমি বলে, তুমি ছাড়া এখন আর তো কেউ আমার নেই!

ভণিতা রেখে, এবার বলো না কোথায় যাচ্ছি?

ডনের কাছে।

হেমাঙ্গ থমকে দাঁড়ায়। চাপা স্বরে বলে, ডনের কাছে? কোথায় আছে সে?

ওই গ্রামে।

তাই বলো। বলে হেমাঙ্গ পা বাড়ায় ফের।

অমি আবেগ দিয়ে বলে, জানো? আমার ভীষণ অস্বস্তি ছিল! যদি তুমি দরজা না খোলো! যদি এভাবে আসতে না চাও! আমি তোমার কথা রাখি নি। এমন কী, আজ তুমি জেঠুর কাছে বসে ছিলে, তোমার সঙ্গে কথা বলি নি! আমার তখন মনের অবস্থা ভাল ছিল না। তুমি নিশ্চয় খুব রেগে গিয়েছিলে!

একটু-একটু।

কথা না রাখার কারণ সেরাতে ঝেণ্টুর কাছে ডনের খবর পেয়েছিলুম। কিন্তু ঝেণ্টু কিছুতেই ডন কোথায় আছে বলে নি। বলেছিল, আগে ডনকে জিগ্যেস করবে। যদি আমাকে তার ঠিকানা জানাতে বলে ডন, তবে সে জানাবে। এই করতে-করতে কয়েকটা দিন কেটে গেল। রোজ ঝেণ্টুকে জিগ্যেস করি। বলে, ডন ভাবছে। কী অদ্ভুত ছেলে! শেষঅব্দি গতকাল ঝেণ্টু বলল, ডন যেতে বলেছে আমাকে।

তুমি গেলে?

গেলুম। অনেকটা রাতে যেতে বলেছিল। কেন, তা বুঝতেই পারছ।

বাড়িতে নিশ্চয় এসব জানাওনি?

না। ডনের নিষেধ ছিল। জেঠুকে তো তুমি জানো না! এর-ওর কাছে গিয়ে সাধাসাধি এমনিতেই করছিলেন। এবার ঝোঁকের মাথায় আরও হইচই বাধিয়ে বসতেন। ডন তো এখন এ্যাবস্কাণ্ডার! ওর নামে হুলিয়া বেরিয়েছে।

হেমাঙ্গ টর্চ জ্বেলে পায়ের কাছটা দেখে নিয়ে বলে, তুমি কীভাবে গলে ? কেউ টের পেল না ?

না। ঝেণ্টু অপেক্ষা করছিল। আজ যেভাবে এলুম, সেভাবেই তোমার ঘরের পাশ দিয়ে গেছি।

অমি সারারাত জেগে ছিলুম। হেমাঙ্গ সিগারেট পায়ের তলায় ফেলে ঘষটে নিভিয়ে বলে। তারপর ?

ওই গ্রামে পৌঁছলুম, তখন রাত প্রায় একটা। তারপর···

হঠাৎ হেমাঙ্গ বলে, একা ঝেণ্টুর সঙ্গে, না আর কেউ ছিল ?

অমি একটু চুপচাপ থাকার পর বলে, আর কেউ ছিল না। তারপর কী বলতে গিয়ে চুপ করে যায়।

কী ?

থাক। পরে বলব। আমার একটু ভুল হয়েছিল।—অমি চলার গতি হঠাৎ বাড়িয়ে দেয়। তারপর বলে, ডন একটা মাটির কোঠা বাড়িতে ওপরের ঘরে আছে দেখলুম। পায়ে ব্যাণ্ডেজ এখনও আছে। তবে হাঁটতে পারে। ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। শীগগির বাইরে চলে যাবে কোথায়। আধঘণ্টাটাক থেকে আমি চলে এলুম। ও তোমার কথাও জিগ্যেস করছিল।

হেমাঙ্গ সঙ্গ পেতে হাঁফিয়ে উঠছিল। অন্ধকারে এভাবে যেখানে সেখানে পা ফেলো না। টর্চ তুমিই নাও বরং !

অমি আপত্তি করে। উঁহু। আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। এই তো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

তাহলে আস্তে চলো। আমি হাঁফিয়ে পড়েছি। হেমাঙ্গ একটু হাসে। তুমি এত সব পারো, আমার ধারণা ছিল না। অবশ্য, ছেলেবেলায় তুমি সোকল্ড গেছো মেয়ে ছিলে।

অমি একপা পিছিয়ে তার পাশে-পাশে হাঁটে আগের মতো। তার একটা বাহুও ধরে থাকে। হেমাঙ্গের এটা ভাল লাগে। কিছুক্ষণ চুপচাপ চলে ওরা। তারপর হঠাৎ হেমাঙ্গের মনে হয়, এইসব সময় অমি এত সহজ আর স্বাভাবিক। অথচ এখনই অতর্কিত-

ভাবে ওর অসুখটা অর্থাৎ সৈকার ভূত এসে গেলে হেমাঙ্গ খুবই মুশকিলে পড়ে যাবে।

এবং একথা ভাবতে ভাবতে সে জিগ্যেস করে, তুমি একটুও ক্লান্ত বোধ করছ না তো! আশ্চর্য!

করি নে আবার? এই যে যাচ্ছি, ভাবছ খুব গায়ের জোর হয়েছে বুঝি! অমি আগের মতো তার বাহু'ত গাল ছুঁইয়ে বলে। সত্যি, আমার এতটুকু স্ট্রেন্থ নেই শরীরে। তবু যাচ্ছি, দৌড়চ্ছি—জাস্ট একটা ঝোঁকে। তারপর তো মড়ার মতো হয়ে পড়ব। কাল ফিরে গিয়ে যখন শুয়ে পড়লুম, মনে হচ্ছিল আর পৃথিবীর মুখ দেখা শেষ। ভীষণ জলতেষ্টা—অথচ জল গড়িয়ে খাওয়ার ক্ষমতাটুকুও নেই।

হেমাঙ্গ হাঁটতে হাঁটতে যতটা পারে ভালবাসায় বা স্নেহে আদর দিয়ে চলে। এবং বলে, এভাবে ছোটাছুটি না করলে কি চলত না? অবশ্য, ডন তোমার ভাই। চুপ করে থাকা কঠিন! কিন্তু তুমিও এমন একটা সাংঘাতিক অসুখে ভুগেছ।

অমি ধীর গতিতে বলে, আমি আর বাঁচব না, সে তো জানি। তাই যতক্ষণ বেঁচে আছি······

হেমাঙ্গ ওর মুখে হাত চেপে বলে, চুপ।

হাত আলগোছে সরিয়ে দিয়ে অমি বলে, খুব আস্তে যাচ্ছি আমরা। ফিরতে ভোর হয়ে যাবে না তো?

দেখা যাবে। বলে হেমাঙ্গ আরও একটু গতিও বাড়ায়। তারপর ফের বলে, তুমি কী সাংঘাতিক রিস্ক নিয়েছ বুঝতে পারছ না ঝোঁকের মাথায়। আমি খালি ভাবছি, হঠাৎ মাথাটাথা ঘুরে······

অমি হাসে। বাধা দিয়ে বলে, কিচ্ছু হবে না। আর যদি কিছু হয়, ধরো ফিট হয়ে যাই কিংবা তেমন গোলমেলে কিছু করি, তুমি ফেলে রেখে চলে যেও।

পাগল? আমাকে তুমি তাই ভাবছ?

অমি নিশ্বাস ফেলে বলে, না। ভাবি নি।

আবছা দেখা যাচ্ছিল, সামনে আবার একটা স্লুইস গেট আছে।

হেমাঙ্গ এই ক্যানেলের ধারে-ধারে কতবার বেড়াতে এসেছে। কিন্তু এত দূর অব্দি আসে নি। মাঠটা রেললাইন থেকে লম্বালম্বি সামনের গ্রামঅব্দি এগোলে দু-আড়াই কিলোমিটারেরও বেশি হতে পারে। একেবারে সমতল এদিকের মাঠ। সামনের গ্রামের ওপারে কোথায় ভাগীরথী বয়ে যাচ্ছে। হেমাঙ্গের মনে পড়ে, এই ক্যানেলটা আসলে ছিল একটা ছোট্ট মজা নদী—যেটা ভাগীরথীতে গিয়ে মিশেছিল। যেখানে মিশেছিল, সেখানে একটা বিরাট বিল আছে। মোহন-পুরের বন্দুকওয়ালারা সেই বিলে পাখি মারতে যেত। এখনও হয়তো যায়। বছর সাত-আট আগে মজা খাতটা সংস্কার করে ক্যানেল তৈরী হয়েছে। ডনের জ্যাঠামশাই নাকি এই ক্যানেলের মাটি খোঁড়ার সময় মাপ-জোপের চার্জে ছিলেন। আবছা অনেক কথা মনে পড়ে হেমাঙ্গের। হাজার হাজার মানুষকে সে মাটি কাটতে দেখেছিল। দূর থেকে দেখে ভারি অদ্ভুত লেগেছিল, কেন কে জানে!

স্লুইস গেটের ব্রিজে এসে অমি বলে, এখানে একটু দাঁড়াও। আর বেশি দূরে নয়। তুমি কখনও আসো নি এদিকে?

না। তুমিও নিশ্চয় আসো নি?

উঁহু। কাল রাতে প্রথম।

ধন্য তোমার সেলফ-কনফিডেণ্ট!

কেন?

এসেছ অন্ধকারে। অথচ ধরে নিচ্ছ, ঠিক জায়গায় যাচ্ছি। তোমার ভুল হচ্ছে না, কিসে বুঝছ? এমনও হতে পারে, হেঁটে হেঁটে রাত পুইয়ে যাবে!

অমি আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে বলে, গোলমেলে জায়গা হলে আসব কেন? সোজা এই ক্যানেল ধরে এগিয়ে বাঁপাশে উঁচু জমিতে একটা বাড়ি। প্রথম বাড়িটাই। তাছাড়া বাড়িতে একটা কুকুর আছে। সে ভীষণ চ্যাঁচামেচি করবে।

হেমাঙ্গ হাসতে হাসতে বলে, তুমি পলিটিকসে নামলে তাক

লাগিয়ে দিতে। ধরো কোন ব্যানড পলিটিকাল পার্টিতে। আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেভলোউশানারীদের দলে। বাপ্‌স!

অমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ ঘুরে বলে, চুপ। দেখ তো, আলো জ্বলল একবার। কারা আসছে যেন!

হেমাঙ্গ তীক্ষ্নদৃষ্টে তাকাল। সে চমকে উঠেছিল। যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকে দূরে একবার আলোর ঝলক, তারপর নিভল। টর্চের আলো ছাড়া কিছু নয়। আবার আলো জ্বলল। নিভে গেল। আলোটা সাবধানী মনে হচ্ছে। মাটির ওপর খানিকটা জায়গায় পড়ছে এবং নিভে যাচ্ছে। কে বা কারা রাস্তা দেখে পা ফেলছে।

অমি ফিসফিস করে বলে, ওপারে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসা যাক্‌ কোথাও। শীগগির!

হেমাঙ্গ তার পিছু পিছু এগোয়। স্লুইস গেটের এই ব্রিজটা মাত্র হাত দুই চওড়া। পা ফসকালে খালে পড়তে হবে। তবে একধারে রেলিংমতো আছে। অমিকে সে বারবার সতর্ক করে দেয়। তারপর ব্রিজটা পেরিয়ে দুজনে নামতে গিয়ে পা হড়কে গড়াতে-গড়াতে পাড়ের নীচে পড়ে যায়। জল নেই। পাঁক আছে সামান্য। ধানের চারাগুলো সব মাথা তুলেছে। তার মধ্যে পাঁকে দুজনে আছাড় খেয়েছে। আশ্চর্য লাগে হেমাঙ্গের, অমি চাপা হাসছে। প্রচণ্ড রকম হাসি। হেমাঙ্গ বলে, এই! কী হচ্ছে? চুপ!

দুজনে জমিটা থেকে, জামাকাপড়ে যথেষ্ট কাদা নিয়ে ওঠে। ঢালু পাড়ের নীচের দিকে পা রাখার মতো জায়গা আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গ ফিসফিস করে বলে ওঠে, অমি! পুলিস! তারপর সে গুঁড়ি মেরে বসে। অমিও বসে পড়ে। চাপা শব্দ শোনা যাচ্ছে কয়েকজোড়া জুতোর। হেমাঙ্গের বুক কাঁপতে থাকে। প্রায় দম আটকে সে বসে থাকে।

পুলিসের দলটা ছোট বলেই মনে হচ্ছে। কোন কথা বলছে না ওরা। বললে শোনা যেত। হেমাঙ্গের মনে হয়, দলটা জুতোসুদ্ধ পা ফেলে ওর বুকের ওপর দিয়ে চলে গেল।

শব্দ একটু দূরে সরে গেলে অমি একটু উঁচু হয়ে দেখল। হেমাঙ্গ তাকে টেনে বসিয়ে দেয়। তারপর প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, ভাগ্যিস তোমার চোখে পড়েছিল !

অমিকে উত্তেজিত দেখায়। সে শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলে, সবাই পুলিস—নাকি সঙ্গে অন্য কাকেও দেখলে ?

ঠিক বোঝা গেল না। তবে জনা চার পাঁচ ছিল ওরা। সম্ভবত রোঁদে বা অন ডিউটি কোনো গ্রামে গিয়েছিল !

অমি একটু চুপ করে থেকে বলে, ডনের খোঁজ পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে ! হয়তো ওকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল !

হেমাঙ্গ জোর দিয়ে বলে, না। তাহলে টের পেতুম। ডনের পায়ে তো ব্যাণ্ডেজ বলেছ ?

হ্যাঁ। কিন্তু···জানো, আমার মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘটেছে।

হেমাঙ্গ এবার উঠে দাঁড়ায়। বলে, তাহলে কী করবে ? যাবে ওখানে ?

অমিও ওঠে। কী করি বলো তো ?

আজ কি ডন তোমাকে বিশেষ কোন ব্যাপারে যেতে বলেছিল ?

হ্যাঁ। ভীষণ জরুরী। বলে অমি একটু ইতস্তত করে যেন। তারপর সে ব্লাউসের ভেতর থেকে কী একটা বের করে।

হেমাঙ্গ স্থির হয়ে দাঁড়ায়। কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলে, কী ওটা ?

ডনের ঘরে এই রিভলবারটা ছিল। এটা পৌঁছে দিতে বলেছিল।

অদ্ভুত তো ! ঝেণ্টুর হাতে দিলেই পারতে !

ডন নিষেধ করেছিল। ঝেণ্টুর হাতে পড়লে তাকে দেবে কি না।

তাহলে ডন নিজে চুপি-চুপি বাড়ি ফিরে নিয়ে যেতে পারত !

অমি ঝাঁঝালো স্বরে বলে, তুমি বুঝতে পারছ না—মোহনপুরে ওর ঢোকা এখন খুব রিস্কি। তাছাড়া ও তো স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারছে না এখনও। দৈবাৎ পুলিস টের পেলে দৌড়ে পালাতে পারবে না যে !

হেমাঙ্গ ভারি নিশ্বাস ফেলে বলে, ওটাতে গুলি পোরা আছে কি না জানো? এভাবে রেখেছিলে!

অমি ছোট্ট রিভলবারটা ব্লাউসের মধ্যে আবার ঢুকিয়ে রেখে বলে, না। গুলি পোরা নেই।

নেই, কীভাবে জানলে?

অমি বিরক্ত হয়ে বলে, ডন বলেছিল। যাক্ গে, শোন। চলো, ব্রিজে যাই। তারপর একটা কিছু ঠিক করে ফেলি।

ঢালু পাড়ে মাটি আঁকড়ে দুজনে ওপরে ওঠে। ব্রিজে পৌঁছে চারদিকটা সতর্কভাবে দেখে নেয়। পুলিস দলের আলোটা আর দেখা যাচ্ছে না। হেমাঙ্গ বলে, আমি বলি বরং…

কী?

আজ আর রিস্ক না নিয়ে চলো ফিরে যাই।

তারপর?

কাল সকালে ঝেন্টুদের কাছে খোঁজ নাও। যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তাহলে বরং আমি দিনেই কোনো একসময় ওটা পৌঁছে দিয়ে আসব ডনকে। বললে, ক্যানেলের ধারে বাঁদিকে গ্রামের প্রথম বাড়ি। উঁচু মাটির বাড়ি। বাড়িতে কুকুর আছে। এই তো?

অমি চুপচাপ ভাবতে থাকে।

অমি কথা বলছে না দেখে হেমাঙ্গ বলে, আমি তোমাকে এতক্ষণ নিঃশব্দে ফলো করেছি, কোন বাধা দিই নি। কিন্তু তুমি খুব বোকার মতো ছুটোছুটি করছ কাল রাত থেকে। তুমি কেন বুঝতে পারো নি। এটা কত সাংঘাতিক রিস্ক! তুমি বিপদে পড়তে পারতে, সেটার চেয়ে আরও ডেঞ্জারাস ব্যাপার—ডনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে। শোন অমি। আমি ডনের কোন কিছু সমর্থন তো করিই নে, বরং আমি ওকে অপছন্দ করি। এবং সে তো ভালই জানো।

অমি মুখ খোলে। আমিও করি!

তুমিও করো, জানি। তবু যেহেতু তোমার ছোট ভাই, তোমার…

অমি ধমকের সুরে বলে থামো তো! অত জ্ঞান দিও না। কী করা উচিত, বলো।

আমার কথা শুনবে? আমি তো বললুম।

তুমি রিস্ক নেবে কেন?

তোমাকে রিস্ক নিতে দেব না বলেই!

হেমাঙ্গ তার কাঁধে হাত রেখে একটু টানে। ফের বলে, দেখো—পড়ে যেও না। সাবধানে এস। আমাকে ধরে থাকো।

সঙ্কীর্ণ ব্রিজটা আবার পেরিয়ে ক্যানেলের অন্য পাড়ে সেই পায়ে চলা রাস্তায় পৌঁছায় ওরা। তারপর অমি বলে. ডনকে আমি ভীষণ ঘৃণা করি। ছোটভাই হলে কী হবে? কিন্তু কিছু দিন থেকে আমি মাকে স্বপ্ন দেখতুম জানো? মা, ডন, আমি—আর দাদা। ঘুম ভেঙে কত কী কথা মনে পড়ত। ডনের জন্যে বুক ফেটে যেত। মা ছোট্ট ডনকে আদর করে বলতেন···

প্লীজ অমি!

অমি কান্নাজড়ানো স্বরে বলে, তবে ডনের কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত! ডন আমাকে সাংঘাতিক একটা ব্যাপার থেকে বাঁচিয়েছিল।

জগদীশ?

হ্যাঁ। আমি না জেনে ওর ফাঁদে পড়তে যাচ্ছিলুম। ডন ঠিক সময়ে আমাকে বাঁচিয়েছিল।

অমি শাড়ির আঁচলে নাক এবং চোখ দুটো মোছে। হেমাঙ্গ বলে, এদিকটা আমার ভাল চেনা নেই। সোজা ধানক্ষেত দিয়ে ষ্টেশনে পৌঁছানো গেলে ভাল হত!

না। খুব জলকাদা আছে ওদিকে। যে পথে এসেছি, সে পথেই ফিরে যাই চলো।

চলো!

দুজনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে থাকে মোহনপুরের দিকে। সিগারেট খাওয়ার তীব্র ইচ্ছে সত্ত্বেও হেমাঙ্গ সিগারেট খেতে ভয়

পাচ্ছে এখন। বুঝতে পারছে, এমন হঠকারী মেয়ের পাল্লায় পড়ে ওর কথা নিঃশব্দে মেনে চলাটা সাংঘাতিক রিস্কের ব্যাপার। এমন করে চলে আসাটা ঠিক হয় নি। বরং আগে জেদ ধরে সবটা শুনে নিয়ে পরামর্শ দিতে পারত সে। অবশ্য অমি তার কথায় কান দিত বলে মনে হয় না।

যেতে যেতে এবার সে লক্ষ্য করে, অমি যেন আর চলতে পারছে না। ধুঁকছে এবং টলতে টলতে পা ফেলছে। সে বলে, বিশ্রাম নিতে নিতে চলো। তুমি টায়ার্ড হয়ে পড়েছো।

নাঃ। চলো।

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলে, আপত্তি না থাকলে আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারি।

এ কথায় অমিও একটু হাসে। বেশ তো নেতিয়ে পড়ে যাব যখন তখন তাই করো।

পরদিন সকালে হেমাঙ্গ সমস্যায় পড়েছিল। পাঞ্জাবি লুঙ্গিতে ধানক্ষেতের কাদা মাখামাখি। গুটিয়ে খবরের কাগজে মুড়ে রেখেছিল খাটের তলায়। লণ্ড্রিতে দিয়ে আসবে।

কিন্তু মুনাপিসি রোজকার মতো ফুলঝাড়ু দিয়ে এ ঘরের মেঝে সাফ করতে এসে খাটের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল এবং মোড়কটা টেনে বের করল। হেমাঙ্গ তখন দক্ষিণের জানালার ধারে পা ঝুলিয়ে বসে চা খাচ্ছে। আঁতকে উঠল।

মুনাপিসি সচরাচর হেমাঙ্গের কোন জিনিষ হাতড়ায় না। কিন্তু এই মোড়কটা খাটের তলায় কেন, এতে তার কৌতূহল স্বাভাবিক। হেমাঙ্গ লক্ষ্য করছিল, কতদূর এগোয়। মোড়কের ফাঁকে মুনাপিসি আঙুল ঢুকিয়ে দিলে—সে হাঁ-হাঁ করে তেড়ে এল। আরে! ওটা ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।

ছোঁয়াছুঁয়ির খুব একটা বাতিক নেই। তা হলেও হেমাঙ্গের তাড়ায় আঙুল সরিয়ে নিয়ে বলল, কাপড়চোপড় নাকি রে? এমন করে রেখেছিস কেন?

হেমাঙ্গ অগত্যা জবাব দেয়, কাল খালের ওখানে পা স্লিপ করে পড়ে গিয়েছিলুম। কাদা লেগেছে। লণ্ড্রিতে দেব।

সন্দিগ্ধ মুখে মুনাপিসি বলে, তা এমন করে লুকিয়ে রেখেছিস কেন?

লুকিয়ে রাখলুম কোথায়? ফেলে রেখেছিলুম। গড়িয়ে ঢুকে গেছে ভেতরে।

পা গজিয়েছিল রে! সত্যি কথাটা বললে যেন আমি শূলে চড়াব! বাঁদর কোথাকার!

হেমাঙ্গ হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। মোড়কটা ছেড়ে মুনাপিসি মেঝে ঝাঁট দিচ্ছে। একটু পরে কোনার দিকে কাদামাখা স্লিপার এবং এখানে ওখানে হলুদ কাদার টুকরো আবিষ্কার করে সে। তারপর হেমাঙ্গের দিকে ঘোরে। রাতে কোথাও বেরিয়েছিলি। তাই না।

ভ্যাট্! কোথায় বেরুব?

হেমা, তুই হাসছিস আর আমার ইচ্ছে করছে তোকে ঝাঁটাপেটা করি!

হেমাঙ্গ মুখে দুষ্টুমির হাসি রেখে পা নাচাতে নাচাতে বলে, করো না যদি হাত সুড়সুড় করে!

মুনাপিসি গুম হয়ে ঝাড়ু বোলায় কিছুক্ষণ কাদার টুকরোগুলো বাইরের দরজার কাছে নিয়ে যায়। তারপর আপন মনে বলে তোমার মরণপাখা গজিয়েছে, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। তুমি আবার বোস বাড়ির মেয়েটার পাল্লায় পড়েছ। তোমার মতিগতি আবার আগের মতো দেখতে পাচ্ছি।

হেমাঙ্গ চটে যায়। কী সব বলছ আবোলতাবোল?

মুনাপিসি ঘুরে চোখ পাকিয়ে বলে তোর লজ্জা করে না? একবার প্রমথ বোস তোকে বাড়ি ডেকে নিয়ে অপমান করেছিল। ওর ভাইপো ছোঁড়া তোকে কবে স্টেশনের ওখানে মারতে গিয়েছিল, তাও শুনেছি। আবার তুই অমির সঙ্গে মেলামেশা করছিস?

সত্য অনেক সময় অসহ্য। হেমাঙ্গ জানালার ধার থেকে নেমে গম্ভীর মুখে কাপ-প্লেট রাখতে যায় ভেতরের বারান্দায়। তারপর

ফিরে এসে বলে, তুমি আসলে আজকাল আমাকে সহ্য করতে পারছ না পিসিমা। হ্যাঁ, তোমার আচরণে সেটা বেশ বুঝতে পারি।

মুনাপিসি কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে যায়। ঝাড়ু চৌকাঠে ঠেকে থাকে। হাতের মুঠো কাঁপে। তারপর বলে, তুই যদি ছেলেমানুষ থাকতিস, তোকে আমি আজ বেঁধে ঝাঁটাপেটা করতুম। তুই এখন বড় হয়েছিস। তোর গায়ে হাত তুলতে পারব না। বলে সে মুখ ঘুরিয়ে ময়লাগুলো আবার চৌকাঠের বাইরে বারান্দায় ফেলতে থাকে। তারপর বারান্দায় যায় চৌকাঠ ডিঙিয়ে। বারান্দায় ঝাড়ুর জোরালো ও দ্রুত শব্দ হতে থাকে।

হেমাঙ্গ টের পেয়েছে, মুনাপিসির চোখে জল এসে গেছে। কিন্তু তার এটা ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা। লজ্জা ঢাকতে সে যে নকল-রাগের পিছু নিয়েছিল, সেই নকল রাগ এখন আসলে হয়ে উঠেছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে রেগে গেছে।

মোড়কটা তুলে নিয়ে মুনাপিসির পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। উঁচু বারান্দা থেকে রাস্তায় শব্দ করেই নামে।

যেতে যেতে নিজের রাগের যৌক্তিকতা খোঁজে সে। পিসিমা তো অন্তর্যামী নয়। সে জামাকাপড়ে কাদার সঙ্গে অমির সম্পর্ক জুড়ে দিচ্ছে কোন্ যুক্তিতে? খালের ধারে বেড়াতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে যেতে পারে না সে?

তা ছাড়া আজকাল আর কী রকম হয়েছে তার চালচলন? সে তো সন্দেহজনক কিছু করছে না। বরাবর একই রকম ভঙ্গীতে বাড়ি ঢোকে। কথা বলে। খায়-দায়। শোয়।

এবং প্রমথবাবুর অপমান করা বা স্টেশনে ডনের মারতে আসার কথা যদি পিসিমা শুনেছিল, এতকাল চেপে রেখেছিল কেন? সে তাকে কোন কথা গোপন করে না বলেই বিশ্বাস ছিল হেমাঙ্গের। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পিসিমাকে বরাবর যত সরল এবং স্পষ্টভাষী সে ভেবে আসছে, ততটা মোটেও নয়।

হেমাঙ্গ আরও চটে যায়। বাজারে ঢুকে সে জয় মা তারা লণ্ড্রিতে

লুঙ্গি আর জামাটা কাচতে দেয়। তারপর যায় হরসুন্দরের চায়ের দোকানে। সেখানে ঝেণ্টুকে পাবে ভেবেছিল। ঝেণ্টু নেই। আজকাল ডনের সঙ্গীদের কথা জিগ্যেস করা নিরাপদ নয়, হেমাঙ্গ জানে।

হরসুন্দর বলে, কী হেমাংবাবু? মোহনপুরে ছিলে না নাকি? অনেক দিন দেখি নি।

ছিলুম। আসা হয় না।

হেমাঙ্গ ভাবে, একটু অপেক্ষা করবে নাকি। এইমাত্র চা খেয়েছে। বাড়ির চা খাওয়ার পর এই চা বিশ্রী লাগার কথা। খুব বেশী চা খাওয়ার অভ্যাসও তার নেই। সে এদিক-ওদিক তাকায়।

হরসুন্দর বলে, রোদে দাঁড়িয়ে কেন হেমাংবাবু? ভেতরে এসো।

প্রায় ন'টা বাজছে। গ্রীষ্মের হাবভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে আবহাওয়ায়। আকাশের চৈতালী মেঘলা অবস্থা আর নেই। দিনভোর উজ্জ্বল গরম রোদ। তবে বাতাস আছে জোরালো। দেশনেতা নলিনাক্ষের প্রতিমূর্তির ওখানে ওপাশের বিশাল আকাশিয়ার ছায়া এখনও খানিকটা পড়ে আছে। সেই পাগলটা কোথায় গেল? একদঙ্গল ভিখিরী কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বসে শুকনো রুটি চিবুচ্ছে। কারুর হাতে টিনের মগ। তারিয়ে তারিয়ে চা খাচ্ছে। ডনের সাঙ্গোপাঙ্গদের আড্ডার জায়গা পুরো বেদখল।

হেমাঙ্গ ভেতরে ঢুকে বলে, চা একটু পরে দিও হরদা।

অচেনা দুজন লোক বসে মামলেট খাচ্ছে। চেনাদের মধ্যে পোস্টমাস্টারবাবুর ভাই প্রাণগোপালবাবু, সাব-রেজেস্ট্রি অফিসের মুহুরী চিত্তবাবু আর ছকা পাণ্ডা বসে আছেন। কারুর চা খাওয়া শেষ, কেউ খাচ্ছেন। কেউ সিগারেট এবং বিড়ি টানছেন। চাপাগলায় দেশের হালচাল নিয়ে কথা হচ্ছে। ছকা পাণ্ডার হাতে সাজি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে সিংহবাহিনী দেবীর প্রসাদী ফুল বেলপাতা ও গঙ্গাজল বিলিয়ে হরসুন্দরকে ঝেড়েমুছে বিলোতে এসেছিল। পয়সা এবং চা দুই-ই জোটে। হেমাঙ্গকে দেখে সে শুধু একটু হাসে।

লোকেদের কথায় এটাই মোহনপুরের সেণ্টার জায়গা। মধ্যিখানে ওই গোলপার্ক, চারদিক ঘুরে রাস্তা। দোকানপসারে ঠাসা। বাস রিক্‌শা লরী টেম্পো গরুমোষের গাড়ি এবং এলাকার গ্রামগুলো থেকে নানান কাজে আসা মানুষের ভীড়ে গমগম করে সারাক্ষণ। একটা লক্ষ্য করার ব্যাপার—আজকাল অজস্র ফলের দোকান হয়েছে। কাঁদি কাঁদি পাকা কলা আর রাশিকৃত আপেল সাজানো আছে। হেমাঙ্গের মনে পড়ে, এত বেশী আপেল এখানে কোথাও দেখা যত না। দু'চারটে শুকনো পোকাধরা আপেল নিয়ে বসে থাকত ষষ্ঠি নামে একটা লোক। এখন শুধু আপেল কেন নাসপাতি, পীচফল, মোসাম্বি, সফেদা, পেয়ারার পাহাড় জমে থাকে। দেশের মাটির ফলন বেড়ে গেছে বছরে বছরে। স্টেশনের প্লাটফর্মে তরিতরকারির স্তূপ দেখলেও অবাক লাগে। কলকাতায় চালান যাচ্ছে। ছানা আর দুধের তো কথাই নেই। বড় বড় ড্রামভর্তি দুধ ট্রাকেও চালান যায়। একসঙ্গে এত বেশী দুধ মোহনপুরে আগে কেউ দেখে নি।

হেমাঙ্গের মনে মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে চারপাশের জমকাল এবং বিবিধ জিনিস তার মাথায় ঢুকে পড়ে। তাকে উদ্দীপ্ত করে। কারণ, ভাল লাগে এইসব সমৃদ্ধি, ফুলে ফেঁপে ওঠা, এইসব পড়ি-কী মরি করে ছোটাছুটি। অথচ যখনই মনে পড়ে যায়, বস্তুতঃ সে এসবের বাইরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং তার কিছু করার নেই, এবং ক্রমাগত লোভের ধাক্কায় হতচকিত, অথচ বিশেষ কিছু কেনাকাটার কোনো ক্ষমতাই তার নেই, তখন তার কেমন একটা অভিমান জাগে। নিজেকে অসহায় মনে হয়। তখন সে নিজেকে দ্রুত আরও তফাতে সরিয়ে নিয়ে যায়। নির্লিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতি ও প্রেমের সহজলভ্য সুখে মুখ ডুবিয়ে থাকতে চায়। অন্ততঃ এই ব্যাপারে তার বরাতটা তো ভালোই। ভাবতে গিয়ে অমির প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। অমি না থাকলে তার বেঁচে থাকাটা খুব বিশ্রী রকমেরই হতো।

পোস্টমাস্টারের ভাই প্রাণগোপাল উঠলেন। এতক্ষণে যেন দেখতে পান হেমাঙ্গকে। কে হে? হেমাং নাকি? কেমন আছ?

ভাল। আপনি ভালো আছেন?

হ্যাঁ হে হেমাং, বোসদের ডাবু নাকি কনট্রাক্টারি করতে আসবে এখানে? আমাদের সুলোক বলছিল। তুমিও নাকি আছ-টাছ ওর সঙ্গে?

হেমাঙ্গ একটু হাসে। ইচ্ছে আছে।

আমার কনিষ্ঠ পুত্রটিকে একটা কাজকম্মো দিও না বাবা! অ্যানি ড্যাম জব। হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে বসে আছে।

কে, তুলাল?

হ্যাঁ। দেখ না বাবা। গরিব মানুষ। বড্ড বেঁচে যাই!

দেখব।

প্রাণগোপাল আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল, হেমাঙ্গ মনে মনে হাসে। তার নিজেরই একই অবস্থা। মুনাপিসির মাথায় বসে আছে। আর তার কাছে চাকরির প্রার্থনা? সত্যি বলতে কী, ডাবুর কথার ততখানি গুরুত্ব সে এখনও দেয় নি। ডাবু তাকে লেটারহেড পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছে। ব্লক আপিসে এবং লোকাল পলিটিক্যাল দলের এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। হেমাঙ্গ আজও যায়নি। তবে সে আঁচ করেছে, প্রমথ বোস ভাবী জামাইয়ের জন্যে নিশ্চয় তদ্বির-তদারক শুরু করেছেন।

প্রাণগোপাল চলে যাওয়ার পর সে একটু উত্তেজনা বোধ করে। মুনাপিসির গলগ্রহ হয়ে থাকার কোন মানে হয় না আর। আজ যদি সে স্বাধীনভাবে থাকতে পারত, থাকত নিজস্ব একটা ঘরবাড়ি, তাহলে অমির সঙ্গে তার যোগাযোগটা নিরাপদ এবং নিবিড়তর হত না কি?

হেমাঙ্গ ঠিক করে, আজই হাত লাগাবে ডাবুর কাজে। ডাবু তাকে রীতিমতো নিজের জামসেদপুরের ফার্মের নামে প্রতিনিধি হিসেবে একটা পরিচিতিপত্রও দিয়েছে। ওপরে লেখা টু হুম ইট মে

কনসার্ন।' হয়তো হঠাৎ এসে হাজিরও হবে একদিন। এপ্রিলের আজ দশ তারিখ না?

চা খেয়ে হেমাঙ্গ উঠতে যাচ্ছে, ইদ্রিস এল। হ্যাল্লো হেঁমাংদা!

কী খবর ইদ্রিস?

চলে যাচ্ছে।

হেমাঙ্গ কাছে গিয়ে চাপাগলায় বলে, ডনের খবর জানো?

ইদ্রিস মাথা দোলায়। মুখটা নির্বিকার।—না দাদা! শুনেছিলাম কলকাতায়—

হেমাঙ্গ বাধা দিয়ে বলে, সে তো আগের কথা। পরে শুনেছি, পালিয়ে-টালিয়ে গেছে নাকি হাসপাতাল থেকে।

তাই নাকি? আমি শুনি নি।—বলে সে তার পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকে। হরদা, পুঁটে আসেনি গো?

হরসুন্দর বলে, এসেছিল? কিছুক্ষণ আগে গেল। তোমার কথা জিগ্যেস করছিল।

দেখছ শালার কাণ্ড? ইদ্রিস বেঞ্চে বসে টেবিলে থুতনী রাখে। মাথা কাত করে অদ্ভুত ভঙ্গীতে বসে থাকে।

হেমাঙ্গ পা বাড়ায়। কাল রাতের ব্যাপারটা জানার জন্যে অস্থির এখন। সোজা বোস বাড়ি গিয়ে অমির কাছে খোঁজ নিতেও পারে। কিন্তু অমি কিভাবে বাড়ি ঢুকেছে, কিছু জানাজানি হয়েছে কিনা— যতক্ষণ না জানতে পারছে, ওবাড়ি যাওয়া ঠিক নয়।

এইসব সময় হুলোর কথা তীব্র হয়ে মনে পড়ে যায়। হুলো থাকলে তার সব কৌতূহলের আস্কারা হত। হুলো কেন কে জানে, তাকে খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করত। তার কাছে কত গোপন কথা খুলে বলত।

আর মোহনপুরের কত সব গোপন ব্যাপার ঘটছে, ছেলেটা কী-ভাবে টেরও পেয়ে যেত। আসলে ওকে ডনেদের চর বলে ভেতরে সন্দেহ এবং ঘৃণা করলেও মোহনপুরের সবাই যেন পুরনো অভ্যাসেই ভাল না বেসে পারত না। বিশেষ করে মেয়েরা। ভদ্রলোকের

ফ্যামিলি হোক, কিংবা তথাকথিত 'ছোটলোকের'—সব বাড়ির মেয়েরা হুলোকে পেলে জমে উঠত। হুলো ছিল তাদের কাছে তামাসার কেন্দ্র। হুলোকে নিয়ে সেই এতটুকু থেকে মজা করতে ছাড়ে না কেউ। তবে সেটা খুব স্নেহময় এবং নিরপরাধ মজা করা। হুলোও মজা পেয়েছে এতে। সে যথার্থ ভাঁড়ের ভূমিকা নিয়েছে। এবং এসব সময় তার ধূর্ততা, খচরামি কিংবা গুপ্তচরবৃত্তির কোনো ছাপ তার মুখে ফুটে ওঠে নি। একরাশ সারল্য, বোকামি এবং অসংখ্য হাসি তার ভাঁড়ামিকে ভরিয়ে তুলেছে।

এসবের ফলেই হুলোর সর্বচর হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল। তাকে রাতবিরেতে কোথাও দেখলে কেউ চমকাত না। তাড়া করত না। আমি হুলো গো, হুলো? চোখের মাথা খেয়েছ? এই বললেই হাসতে হয়েছে। হুলো? তাই বল্। তা এখানে কী করছিস ব্যাটাচ্ছেলে?

সিঁদ দিতে এসেছি। হুলোর এই গম্ভীর জবাব শুনে আরও হাসি পাবে।

অথচ এত দিন হুলো নেই, তার কথা যেন মোহনপুরের লোকেরা ভুলেই গেছে। শুধু হেমাঙ্গের মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় তার কথা। মনটা কেমন করে ওঠে। ছেলেটা খুবই ভয় পেয়ে গেছে। কেন এত ভয় পেল সে? থানার অফিসাররাও তো ওকে ভালবাসেন, হেমাঙ্গ দেখেছে। হুলো কতবার বলেছে, আজ বড়-বাবুর বাড়ি খাব। ওনার জামাই এসেছে, হেমাদা! মাইরি দাদা, পুলিসের জামাই কখনও দেখি নি। তুমি দেখেছ তো হেমাদা?

হেমাঙ্গের হঠাৎ মনে হয়, হুলো সম্ভবত দু'পক্ষেরই অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছে। ওভাবে শ্যাম ও কূল রাখা একসঙ্গে কারুর পক্ষে তো সহজ নয়। একদিন না একদিন বিপদে পড়তেই হত। সেই বিপদে পড়ে গেছে ছেলেটা। অথচ হেমাঙ্গ তাকে সতর্ক করে দিয়েছে।

হেমাদা! কোথায় যাচ্ছ?

হেমাঙ্গ দাঁড়াল। ইলু স্কুলে যাচ্ছে।—স্কুলে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ। তোমার কী হয়েছে গো?

হেমাঙ্গ চমকে ওঠে। কেন? কী হবে?

ইলু সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে হাসছে। কেমন দেখাচ্ছে যেন।

হেমাঙ্গ হেসে ফেলে।—তোর অমিদির ভূতটা আমাকে ধরেছে তাহলে। ওকে ছেড়ে আমাকে ধরেছে। বুঝলি তো?

ইলু মাথা দোলায়। উঁহু! ছেড়েছে কোথায়? আজ সকাল থেকে খুব জ্বালাচ্ছে। দেখে এস না? বৈকার কথা বলছে। আর কী গালাগালি!

হেমাঙ্গ নিষ্পলক চোখে তাকায়। সে কী! ওর অসুখ তো সেরে গিয়েছিল?

ইলু চোখ বড়ো করে একটু চাপাস্বরে বলে, সারবে কী করে? মা ওকে যখন তখন আগের মতো বেরুতে বারণ করে। শোনেই না। জানো? কাল কী করেছে?

বুক কাঁপে হেমাঙ্গের। কী রে?

কাল রাতে ওকে নাকি নিশিতে পেয়েছিল। বাবা বলাবলি করছিলো। নিশি কী গো হেমাদা?

ঘুমের ঘোরে বেরিয়ে যাওয়া।

মা জেগে ছিল, জানো? অমিদির কাপড় কাদায় ভর্তি এলোমেলো চুল, লাল চোখ! মা খুব মেরেছে, বড়দি সকালে বলছিল। বাবা না ধরলে মেরেই ফেলত। বাবা বললেন, নিশিতে পেয়েছিল। তুমি যাবে হেমাদা, অমিদিকে দেখতে?

হেমাঙ্গ নিঃশ্বাস চেপে বলে, দেখি। তারপর ইলুর উদ্দেশে—আচ্ছা, চলি রে বলে পা বাড়ায়। তার মাথা ঘুরছে যেন। কেমন ক্লান্তি লাগছে। কাঠফাটা রোদ গায়ে নিয়ে সে কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন হেঁটে যায় ভিড়ের মধ্যে! খালের ব্রীজ পেরিয়ে বারোয়ারী বটতলায় গিয়ে ছায়ায় দাঁড়ায়।

অমিকে দেখতে যাবে, না যাবে না—ঠিক করতে পারে না। আনমনে সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকে। অমির জন্যে তার মনে

ছটফটানি শুরু হয়েছে। আহা, ওই অবস্থায় সুলোচনা তাকে মেরেছেন! রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে ওঠে হেমাঙ্গ। অতবড় মেয়ের গায়ে হাত তুলতে পারলেন সুলোচনা? এটাই তার বড্ড অবাক্ লাগছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর ভারি নিঃশ্বাসের সঙ্গে শেষ ধোঁয়াগুলো বের করে দিয়ে সে অভ্যাসমতো সিগারেটের টুকরো চটির তলায় ঘষে নেভায়। তারপর অন্য রাস্তায় ঘুরে বাড়ি ফেরে। বোসবাড়ির সামনে দিয়ে গেলে শর্টকাট হত। যেতে ইচ্ছে করছিল না।

কিন্তু বাড়িও ঢোকে না সে। বাড়ি যেন দাঁত বের করে কামড়াতে আসছে। সে শ্মশানতলার দিকে হাঁটতে থাকে।

একটু দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, শ্মশানতলায় শঙ্করার সামনে কারা বসে আছে।

কিছুটা কাছাকাছি হয়ে দেখল, ওরা গাঁজা খাচ্ছে। শঙ্করা আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে। তাকে ঘিরে আছে যারা, সবাই রেলের লোক। নেভি ব্লু উর্দি পরনে। একজনের মুখে সাদা গোঁফ-দাড়িও আছে। মাথায় রুমাল জড়ানো। ড্রাইভার কিংবা ফায়ারম্যান হতে পারে। হেমাঙ্গ অবাক্ হল। গাঁজা খেয়ে ইঞ্জিন চালাবে ওরা?

সম্ভবতঃ এখন অফ-ডিউটির সময় রেলইয়ার্ডে অন্য দিনের মতো শানটিং চলেছে। একখানে গ্যাংম্যানরা লাইনের পাথর সরাচ্ছে। ঝোপঝাড় গাছপালার ফাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। দূরে গোডাউনের শেডের সামনে কুলিরা ওয়াগন থেকে কাঠের বাক্সো নামাচ্ছে।

হেমাঙ্গ বাঁদিকে রেলইয়ার্ডের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকে। মাথার ওপর একটা গাবগাছের ঘন ছাউনি। গাবফলের গুটি ধরেছে। একটু পরে ওপর থেকে শব্দ হতেই সে চমকে দেখল, কেউ গাবফল পাড়ছে। হেমাঙ্গ লোকটাকে চিনতে পারে। জেলেপাড়ার লোক। জালে গাবের কষ মাখাবে। গাবফল পড়া শুরু হলে জামায় কষ ছিটকে পড়ার ভয়ে সরে আসে। বিরক্ত হয়। কোথাও

একা দাঁড়াবার জো নেই। সে বটতলায় যেতে ইতস্ততঃ করছিল আসলে। সেই সময় দেখল, দলটা একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। শঙ্করাকে সেলাম ও প্রণাম করে তারা নাক-বরাবর চলে গেল। তারপর খালের হাঁটুজল পেরিয়ে গিয়ে কাদা ধুতে থাকল।

হেমাঙ্গ এগিয়ে গিয়ে ডাকে—কী রে শঙ্করা?

শঙ্করা চোখ বুজে বসে ছিল। লাল চোখে তাকিয়ে হেসে বলে, উরে বাস! হেমাং যে রে! আয় রে, আয়। বোস্! সে সামনের নগ্ন মাটিতে থাপ্পড় মারে। ধুলো উড়ে যায়।

হেমাঙ্গ বসে না। দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, খুব শিষ্যটিষ্য জুটিয়েছিস শঙ্করা! কত প্রণামী পেলি?

শঙ্করা মুখ বাঁকা করে বলে, তোর সঙ্গে কথা বলছি এই তোর ভাগ্যি। শালা! আমায় সেদিন মারতে এলি?

তুই অমন করে উঁকি দিচ্ছিলি কেন? ডেকে ঢুকতে পারতিস!

জিভ কেটে শঙ্করা বলে, তাই ঢোকা যায়? তুই তখন প্রেম করছিস। আমি বাগড়া দিতে পারি?

হেমাঙ্গ হেসে ফেলে।—ইডিয়ট কোথাকার। তা হ্যাঁরে, তোর সেই খুলিটা কই?

শঙ্করা খিক-খিক করে হাসে। পালিয়ে গেছে জগা শালা! এত আদর সইল না। যাক না। আবার একটা খুলি পেয়ে যাব! শীগ্‌গিরই পাব।

তাই বুঝি? কার খুলি?

তোর।

হেমাঙ্গ হাসতে গিয়ে ভেতরটা শুকিয়ে যায়। হৃদপিণ্ডে খিল ধরে গেছে।

॥ নয় ॥

প্রমথ জ্ঞানবাবুর বাড়ি যাবেন বলে বেরিয়েছিলেন।

বড়পোল পেরিয়ে বাজার, যার নাম লিচুতলা। তার উত্তরে বিরাট এলাকার সবটাই আদি মোহনপুর। পুবে লোকোশেড আর রেললাইন, পশ্চিমে ক্যানেল এবং তার ওপারে ইটখোলা, কাঠগোলা, ঘোষেদের ডেয়ারি, নন্দীদের ফার্মিং, ভুতুবাবুর নার্শারি, ব্লক অফিস আর কোয়ার্টার। আদি মোহনপুরে ঢুকলে মনে হবে উত্তর কলকাতারই কোন এলাকা। গলিঘুঁজি রাস্তা, দোতলা-তিনতলা পুরনো আমলের বাড়ি। সংকীর্ণ রাস্তাগুলো কদাচিৎ রোদ পায়। এমন কি কাশীর গলির মতো ষাঁড়ও ঘুরে বেড়ায়। এই বনেদী বসতি সেই নবাবী আমলের। মাড়ওয়ারের জৈনরা সতের শতক থেকে বাংলা মুলুকে ঢুকে ছিলেন। তখন ভাগীরথী মোহনপুরেরই ধার ঘেঁষে বইত। জেলার ইতিহাস তাই বলে। রেললাইনের ওধারে পুবের নীচু মাঠটা যে এক সময় খাত ছিল, এখনও বোঝা যায়!

প্রমথ যে পাড়ায় ঢুকলেন, তার নাম ছিল পাটোয়ারিপাড়া। পাটোয়ারিরাও জৈন। তাঁদের প্রায় সকলেই কলকাতা চলে গেছেন। আর সব মাড়োয়ারিরাও চলে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে তাঁদের বংশের লোকেরা কেউ কেউ ফিরে এসেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের পালে নতুন হাওয়া লেগেছে এতো-দিনে। অনেক নতুন মাড়োয়ারিও এসে জায়গা কিনে হালফ্যাসানী বাড়ি করেছেন। বাজারে দোকান দিয়েছেন। কিন্তু পাটোয়ারি পাড়ায় ফাঁক পেয়ে এলাকায় গ্রামগুলো থেকে কম করে সত্তর-আশি বছর ধরে ধনী এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা নানান গ্রাম থেকে এসে ঢুকে পড়েন। এখানে পুরনো আমল থেকেই শহুরে জীবনের আদল খানিকটা ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানি রেললাইন

পেতে স্টেশন করল। লোকো শেডও হল। স্বাধীনতার যুগে হল রেলইয়ার্ড, রেলকলোনী, নিজস্ব হাসপাতাল এবং স্কুল। এর পর ক্রমশ পাটোয়ারিপাড়ার নাম হয়ে গেছে অনেকগুলো। বাবুপাড়া, স্যাঁকরাপাড়া, বেনেপাড়া এই সব। বেনেদের রবরবা বেড়েছে। স্যাঁকরারা ক্ষয়ে টিমটিম করছে কোন রকমে। বাবুপাড়ায় যাকে বলে পোলারাইজেশান ঘটে গেছে। কয়েক ঘর বিরাট ধনী, বাদ-বাকী ছোট ও মাঝারি চাকুরে এবং অগণতি বেকার ফ্যামিলি। এই সব বাড়ির ছেলেদের আলাদা দল আছে। তারা হেমাঙ্গ বা প্রমথবাবুদের নয়া বসত এলাকায় সুখী এবং মডার্ন ফ্যামিলির ছেলেদের দুচোখে দেখতে পারে না। এ পাড়ার মেয়েরা স্কুল-কলেজে যাবার পথে ওদের প্যাঁক খায়। সে নিয়ে অনেকবার ছোটখাট সংঘর্ষ হয়েছে। মজার কথা, মুসহরবস্তি এবং বাজারের মাঝামাঝি জায়গায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু কলোনী—সেখানকার ছেলেরা বাবুপাড়ার ছেলেদের 'অপোজিট গ্যাং'। এরা 'আউটসাইডার' এবং 'মডার্ন'দের 'সাপোর্ট' করে। হাঙ্গামা বাধলে বাবুপাড়ায় ঠেলে কোণঠাসা করে আসে ওদের। ওদিকে রেল কলোনীর ছেলেরা 'নিউট্র্যাল'। হরসুন্দর চাওলার কাছে এই সব তথ্য পাওয়া যাবে। এ হল মোহনপুরের নানামুখী স্রোতের খবর। কিন্তু তলার স্রোত বা 'আণ্ডার কারেন্ট' তো থাকবেই। সেটা স্রোতের নিয়ম। এই আণ্ডারকারেন্টের নমুনা ডনের গ্যাং। তার গ্যাংয়ে পাড়াভেদ ছিল না। বাজারপাড়া, বাবুপাড়া থেকে শুরু করে রেল-কলোনী, উদ্বাস্তু আর হাউসিং কলোনী জুড়ে ওর দলের রিক্রুট। অবশ্য, ভেল্টুবাবুরও একটা আলাদা গ্যাং আছে। কিন্তু সবাই জানে ভেল্টুবাবু আর ডনের গ্যাং কাজের বেলায় আলাদা নয়। ওদের সব শেয়ালের এক রব। ভেল্টুবাবু ও ডন পরস্পরকে খাতির করে চলেছে।

মোহনপুর যত নিজেকে ছড়িয়েছে বা ছড়াচ্ছে, তত তার জটিলতা বাড়ছে। প্রমথের নিজের জীবনেই যা দেখলেন, অবাক্ হয়ে যান।

কয়েক বছরের মধ্যেই কত অচেনা মুখে ভরে গেছে মোহনপুর। আগে বাজারেই আসুন, আর কোনো পাড়াতেই ঢুকুন—অজস্র লোক বলে উঠত, ওভারসিয়ার বাবু যে! ভাল আছেন? কেউ বলত—বোসবাবু। কেউ বোসদা। আজকাল সেই ডাক কমই শোনেন।

এর আরেকটা কারণ থাকতেও পারে। তাঁর ভাইপো ডনের ওপর তো ভেতরে ভেতরে অনেকেই নৈতিক কারণে চটে গেছে। তার সঙ্গে প্রমথেরও কিছু ত্রুটি ঘটেছে। নিজেও বোঝেন। ডনকে শুধু লাই দিয়েছেন, তাই নয়—ছুতোনাতায় লোককে ডনের নাম করে শাসিয়েছেন। সম্প্রতি মনে হচ্ছে, খুব ভুল করেছেন। ডনের মতো বুনো ঘোড়াকে সামলানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তার জন্যে তাঁর দেমাক দেখানো ঠিক হয় নি। এখন বরং ভয় হচ্ছে, ডনের অভাবে এবার তাঁকে পাঁকেপড়া হাতির মতো বিস্তর চামচিকের লাথি খেতে হবে!

জ্ঞানবাবু প্রখ্যাত নেতা নলিনাক্ষের ভাইপো। নলিনাক্ষ বাঁড়ুয্যে ব্রিটিশ যুগে মন্ত্রী ছিলেন কয়েক বছর। জেলার লোকের কাছে গর্বের ব্যাপার। উত্তরবঙ্গে জমিদারি ছিল। চা-বাগান ছিল। বিহারে কয়েকটা খনিও ছিল। নিঃসন্তান নলিনাক্ষের ভাইপো জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাঁড়ুয্যের দীক্ষা জ্যাঠার হাতে। তবে জেল খাটার সুযোগ পান নি। তাঁর জ্যাঠামশাইও তা পান নি। কিন্তু জেল না খাটলে কি দেশসেবা করা যায় না, নাকি নেতা বলে না লোকে? জ্ঞানবাবু জনপ্রিয় এম. এল. এ.।

তাঁর মতো লোকের কাছে ডনের কথা তোলাটাই ধৃষ্টতা হত। কিন্তু যে কোন কারণে হোক, ডনকে জ্ঞানবাবুর বাড়ির মেয়েরাও স্নেহ করেন বরাবর। ডনের অনেক গুণও তো ছিল। পরের জন্যে প্রাণ দিয়ে খাটতে তার মতো ছেলে একটিও নেই মোহনপুরে। তাছাড়া গুণ্ডামি মারামারি যা কিছু করুক, ডনকে অন্তত মেয়েদের ব্যাপারে কেউ কখনও ফক্কুরি পর্যন্ত করতে দেখে নি। বরং মেয়েদের

সম্পর্কে তার শালীনতাবোধ ভারি অদ্ভুত। মেয়েদের সম্মান দিতে জানে সে। জ্ঞানবাবুর বাড়ির মেয়েরা ফাংশান হলে ডনের হেফাজতে গেছেন এবং নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পেরেছেন। ওবাড়ি বাইরের কোনো ছেলের পক্ষে অগম্য। অথচ ডনের ছিল যেন নিজেরই বাড়ি। সোজা ভেতরে চলে গেছে। ঘরে ঘরে ঘুরেছে।

প্রতিবার ইলেকশানে ডনের ভূমিকা ছিল দেখার মতো। নাওয়া নেই খাওয়া নেই, সারাদিন গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরেছে দল নিয়ে। গত ইলেকশান অব্দি তার গুণ্ডা বলে যত বদনাম থাক, চোর-ডাকাতের বদনামটা ছিল না। এই তিনটে বছরে ডন আস্তে আস্তে অন্য রাস্তায় পা বাড়িয়েছিল। প্রমথ সব জেনেও কিছু বলেন নি। ওদিকে জ্ঞানবাবুর ছায়া থেকেও নাকি ডন দূরে চলে গিয়েছিল। জ্ঞানবাবুই সেকথা বলেছেন।

কিছুদিন আগে জ্ঞানবাবুর কাছে গিয়েছিলেন প্রমথ। জ্ঞানবাবু খুব উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। ডনের সঙ্গে তাঁর অনেককাল যোগা-যোগাই নাকি নেই। তার সম্পর্কে নানান কথা ওঁর কানে এসেছে। ডনকে ডেকে পাঠিয়েছেন, ডন যায় নি দেখা করতে। যাবে কোন্ মুখে ?

জ্ঞানবাবু বলেছিলেন, ওকে আমি ছেলের বেশি স্নেহ করতুম। কতবার বলেছি, চাকরির ব্যবস্থা করে দিই। এড়িয়ে গেছে। আমার কী গরজ বলুন ? তাছাড়া এখন আর তো প্রশ্নই ওঠে না। ও এ্যান্টিসোশ্যাল এলিমেন্টদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে। আমার পক্ষে ওর হয়ে কিছু করা সম্ভবই নয়। আর, এই প্রথম হলে কথা ছিল। এর আগেও বেশ কয়েকবার ওকে ইনডিরেক্টলি আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি। ও সেজন্যে কৃতজ্ঞতাটুকুও প্রকাশ করতে আসে নি—কী বলব ?

প্রমথ একটু হেসে বলেছিলেন, তবু সবাই তো বলছে, ডন আপনারই লোক। আপনার অপোজিট পার্টি তো মোহনপুর জুড়ে রব ছুটিয়েছে, আপনি নাকি ওকে ছাড়িয়ে নার্সিংহোমে রেখেছেন !

জ্ঞানবাবু রেগে আগুন। বলছে নাকি ? কার কাছে শুনলেন ?

প্রমথ অবশ্য মিথ্যা বলেন নি। তাই রটেছে। বলেছিলেন, ভেঁটু ভটচাযরা বলছে শুনলুম।

জ্ঞানবাবু গুম হয়ে গিয়েছিলেন। প্রমথ বুঝতে পেরেছিলেন, ওষুধ ধরেছে। এরপর আরও নানান কথা হয়েছিল। শেষঅব্দি জ্ঞানবাবু বলেছিলেন, একটা কাজ আমি করতে পারি। এ্যারেস্টেড পার্সন উণ্ডেড হয়ে হসপিটালে ভর্তি হয়েছিল, কেমন তো? তারপর সে হসপিটাল থেকে নিখোঁজ হয়েছে। তাই না?

প্রমথবাবু বলেছিলেন, হ্যাঁ। লোকাল থানা অফিসার শুধু এটুকুই জানালেন আমাকে।

কোন এরিয়ায় এ্যারেস্ট হয়েছিল? কলকাতায় তো?

মুচিপাড়া।

ঠিক আছে। দেখব এ্যাসেমব্লি সেশন এখন মুলতুবি আছে। পরশু শুরু হচ্ছে আবার। আমি কথা তুলব। পুলিস ডনকে মেরে ফেলে নিখোঁজ বলে রটাতেও পারে। দিস ইজ দা পয়েণ্ট।

জ্ঞানবাবু আরও বলেছিলেন, তবে ডনের এই লাস্ট চান্স। যদি হতভাগার বরাতে তেমন কিছু—ভগবান না করেন, ঘটে না থাকে, তো ওকে যাতে খুঁজে বের করে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়, সে চেষ্টা আমি করব। একটু মিথ্যে বলতে হবে আর কী! বলতে হবে, পলি-টিকাল ওয়ার্কার আমাদের দলের। মিথ্যে ওকে জড়ানো হয়েছে। ব্যাপারটা ইমিডিয়েটলি তদন্ত করা হোক। কেমন তো?

প্রমথ খুশি হয়ে বলেছিলেন, যথেষ্ট, যথেষ্ট।…

তারপর থেকে রোজ খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়েছেন প্রমথ। বিধানসভার অধিবেশন শুরু হয়েছে। কিন্তু আজকাল কাগজগুলোর কী যে হয়েছে, ডিটেলস কিচ্ছু থাকে না আগের মতো। আগে প্রশ্নোত্তরগুলো সবটাই থাকত। ভারি উপভোগ্য ছিল। আজকাল একেবারে শর্টকাট। খুব গুরুত্ব না থাকলে কিছু দেয় না। জন-প্রতিনিধিরা নিজেদের এলাকার ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কে কী বলছেন, কিচ্ছু জানা যায় না।

এভাবে অনেকগুলো দিন চলে গেছে। তারপর হঠাৎ প্রমথ সেদিন অমির কাছে ডনের খবর পেয়েছেন। অমির কাণ্ড শুনেও বিরক্ত হয়েছেন। বাড়াবাড়ির সীমা ছাড়িয়ে গেছে অমি। একবার না হয় গিয়ে ভাইটাকে দেখে এলি—দিদির মন! কিন্তু পরের দিন আবার ওইভাবে জলকাদা মেখে রাতবিরেতে না গেলেই চলত না? শরীরের ওই অবস্থা! তার চেয়েও বড় কথা, বাড়ির খিড়কির দরজা ওভাবে বাইরে থেকে ভেজিয়ে রেখে যাওয়া! এখন আর বাড়িতে ডন নেই, সবাই জানে। বাড়ির নিরাপত্তাই নেই আর। চারদিকে যা চুরি-ডাকাতি চলছে!

কদিন থেকে অমিকে সুলোচনা নজরবন্দী রেখেছেন। এদিকে হিস্টিরিয়াটা কমে গিয়েছিল ইগ্নেশিয়া থাউজ্যাণ্ডে। আবার রিভাইভ করেছে। করবেই তো! মানসিক উত্তেজনা বা অশান্তি হলেই করবে। এবার আর চড়া পাওয়ার নয়, সিক্স এক্স থেকে শুরু করেছেন। সাতদিন এই ডোজ চলার পর আরেকটা ওষুধ দেবেন। ফস্‌ফরাস থার্টি এক্স। আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলোকে খতম করতে হবে। একটু আগে পাশে বসে খুঁটিয়ে সিম্পটমগুলো নোট করে নিয়েছেন। মেয়েটার চেহারা দেখে কষ্ট হচ্ছে প্রমথের। খুব মোটাসোটা না হলেও গায়ে জোর ছিল খুবই। মুখখানা সব সময় খুশিতে ঢলঢল করত। আর কথায়-কথায় হাসি-তামাসা! অবশ্য একটু ঠোঁট-কাটা স্বভাবও ছিল। আচমকা যা তা বলে বসত লোককে। নিজের মেয়েদের মধ্যে বুলুর খানিকটা ওই স্বভাব আছে। জামাই-বাবাজীকে সব সময় তটস্থ রাখে দেখে প্রমথ মনে মনে হাসেন। অমির বিয়ে হলে অমিও হয়তো তাই করবে।

প্রমথ ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলেন। অমির বিয়ে! আর কে ওকে বিয়ে করতে চাইবে? সতীশ মোক্তারের ভাইপোর মতিগতি দেখে মাঝে মাঝে আশা জাগে, আবার নিরাশ হতে হয়। সতীশের বউ মানদাসুন্দরী একানড়ে মেয়ে বরাবর। মেলামেশা বিশেষ করেই না কারও সঙ্গে। সে বেঁচে থাকতে কি ভাইপো হেমাঙ্গকে ওই

মেয়ে নিতে দেবে? তার ওপর কায়েতের মেয়ে! এক ভরসা ছিল, হেমাঙ্গটা স্বাধীনচেতা ছেলে। নম্র, একটু ভীতুও বটে—কিন্তু স্বাধীনচেতা ছেলেরা হঠকারী হয়, এই হচ্ছে প্রমথের বিশ্বাস। এখন শুধু একটুখানি ক্ষীণ আশা, ডাবুর সঙ্গে ওকে ভিড়িয়ে যদি এখানে কন্ট্রাক্টরিতে লাগানো যায়—নিজের জোরে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে। ততদিনে অমিও কি সেরে উঠবে না? অমির সঙ্গে হেমাঙ্গের ভাব-ভালবাসা আছে, কে না জানে!

প্রমথ চাইছেন একটিলে দুই পাখি মারতে। ডাবুর সঙ্গে মিলুর বিয়ের কথাটা এমাসে প্রচুর এগিয়েছে। ডাবুর বাবা-মায়ের কোনো আপত্তি নেই। ডাবুরও নেই বলে মনে হচ্ছে। ঠাকুর কৃপা করলে জ্যৈষ্ঠ মাসেই শুভ কাজ চুকিয়ে ফেলা যাবে। মিলুর পরীক্ষা আছে সামনে। পরীক্ষাটা হয়েও যাবে ততদিনে।

প্রমথ আজ যে জ্ঞানবাবুর বাড়ি যাচ্ছেন, তার উদ্দেশ্য ডন নয়, ডাবু। ছোকরা বি. ডি. ও.-র সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। মোহনপুরে কমিউনিটি সেন্টার হবে। প্রজেক্ট রেডি। টেণ্ডার শিগগির ডাকা হচ্ছে। ডাবু আজকালের মধ্যে এসে পড়বে। তার আগে জ্ঞান-বাবুকে একটু ধরা দরকার।

সেকেলে বিরাট হলঘরে আরও অনেকে অপেক্ষা করছে জ্ঞান-বাবুর জন্যে। জ্ঞানবাবু এখনও ওপর থেকে নামেন নি। ওঁর পি. এস. আকবর প্রমথকে দেখে এগিয়ে আসে। বোসদা যে!

নাতির বয়সী ছোকরা দাদা বলে। আগে ক্ষুব্ধ হতেন। এখন মেনে নিয়েছেন। আকবরের বাবা পাশের গ্রামের ধনী গৃহস্থ—যাদের বলা হয় জোতদার। অথচ আকবর জ্ঞানবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি নিয়েছে, শখের চাকরি নিয়েছে, শখের চাকরিই বলা যায়। বি. এ. পাশ করে চাষবাস নিয়ে থাকতে যাবে কেন? তবে ছেলেটি বড্ড বেশি স্মার্ট। সবজান্তার মত কথা বলে। জ্ঞান-বাবু নাকি ওঁর কথাতে ওঠেন বসেন।

তাই বলে ডনের ব্যাপারে আকবরের থ্রু দিয়ে যাননি প্রমথ। জ্ঞানবাবুর সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক আছে ডনের সুবাদেই। গম্ভীর মুখে সোফায় বসে বলেন, হ্যাঁ হে আকবর, কখন নামবেন জ্ঞানবাবু?

অন্যদের মতো ছোটবাবু বলেন না প্রমথ। আকবর ঘড়ি দেখে নিয়ে বলে, সময় হয়েছে।

প্রমথ দ্রুত বলেন, আমি বাপু স্লিপটিল্প দেব না। তুমি আমার নাম বোলো।

আকবর হাসে। বোসদার কারবারই আলাদা।

দরজায় আবার কোনো দর্শনার্থী এসেছে। আকবর তাকে খাতির করতে এগিয়ে যায়। প্রমথ টের পান, ভুল সময়ে এসেছেন। এখন লোকের ভীড় হয়। সন্ধ্যার পর এলেই ভাল হতো সেদিনকার মতো।

কিন্তু এসে যখন পড়েছেন, আর কি করা! জ্ঞানবাবু নামবেন তো ওই সিঁড়ি দিয়ে। দেখতে পেলেই এগিয়ে যাবেন, হলঘর থেকে ঘোরালো কাঠের চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। কার্পেট পাতা সিঁড়ি। খুব পুরনো বেরঙা কার্পেট। সিঁড়ির ধারে এখানে ওখানে ছোট্ট থামে ভাস্কর্য আছে। জমিদারী কারবার আর কী! বাড়ির ভেতরে কখনো যাবার সুযোগ পাননি প্রমথ। ডনের কাছে গল্প শুনেছেন। এখন মনে হচ্ছে ডন থাকলে কত ভাল না হত! তাঁকে সাধতে আসতে হতই না। ডনই সব করে দিত। এবং দিতই।

এ মুহূর্তে ডনের অভাব তীব্র হয়ে বুকে ধাক্কা মারে প্রমথের। ডনের মতো ছেলেরা কত প্রয়োজনীয় এ যুগে ভাবা যায় না! এই যে আকবর ডাঁট দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, ডনকে দেখলে লেজ নাড়ত না কি? ডন তো সোজা ওপরে চলে যেত। সটান জ্ঞানবাবুর ঘরে ঢুকে ডাকত—জ্ঞানদা।

এই সময় সিঁড়ির মাথায় জ্ঞানবাবুর ধবধবে ফর্সা চেহারাটি দেখা গেল। হলঘরের সবাই উঠে দাঁড়াল। প্রমথও উঠলেন। তবে

সম্মান জানাবার জন্যে নয়। সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জ্ঞানবাবু হাসিমুখে নমস্কার করতে করতে নামছেন। প্রমথকে দেখে বলেন—আরে! প্রমথবাবু যে? ভাল?

প্রমথ ব্যাকুল স্বরে বলেন, আমি সবার আগে কথা সেরে নেব। আমার ঘরে মরণাপন্ন পেসেণ্ট। খুব সঙ্কটের মধ্যে আছি। এক্ষুণি ফিরতে হবে।

কার অসুখ করল আবার?

ডনের দিদির। মানে অমির।

অমির? ওঃ হো! শুনেছিলুম বটে কী যেন সব···জ্ঞানবাবু হাসেন একটু। ভূতুড়ে ব্যাপার না কী যেন?

হিস্টিরিয়া। উৎকট হিস্টিরিয়া। একেবারে লাস্ট স্টেজে পৌঁছেছে।

আচ্ছা! তাহলে তো মুশকিল। কলকাতায় কোন হসপিটালে ব্যবস্থা করে দিতে হবে?

প্রমথ দমে যান। বলছি সব। ঘরে বসুন, বলছি।

প্রমথ পেছন পেছন ঢুকে পড়েন পাশের একটা ঘরে। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে। জ্ঞানবাবু বসে টেবিলের কাগজগুলো দেখতে দেখতে বলেন, হুঁ, তারপর?

প্রমথ সামনের চেয়ারে বসে বলেন, তারপর আর কী? আমি নিজেই তো একটু আধটু হোমিওপ্যাথির চর্চা করি-টরি। আমিই ওষুধপত্র দিচ্ছি।

হুঁ! জ্ঞানবাবু স্লিপগুলো দেখতে ব্যস্ত।

এই সময় আকবর ঢোকে। দাদা, কাপাসীর একদল লোক এসেছে। ওদের সেই ইরিগেশন প্রজেক্টের ব্যাপার। সব্বাই দেখা করতে চায়। বললুম, ছুজন এসো। শুনছে না।

আসুক না। সবাই আসুক।

প্রমথ বলেন, তাহলে আমি প্রাইভেটলি কথাটা আগে সেরে নিই ছোটবাবু।

হ্যাঁ, বলুন।

আকবর প্রমথের দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে আছে। প্রমথ মনে মনে বিরক্ত। বলেন, একটু কনফিডেন্সিয়াল, ছোটবাবু।

ও। আকবর, ওদের দুমিনিট বসতে বলো না ভাই। এক্ষুণি ডাকছি।

আকবর বেরিয়ে যায়। প্রমথ একটু কসে বলেন, ডনের ব্যাপারটা…

জ্ঞানবাবু বলেন, আরে, সে তো এ্যাসেমব্লিতে তুলেছিলুম। এনকোয়ারিও হয়ে গেছে। ডন নিজেই পালিয়েছে! বাড়ি আসে নি বুঝি?

প্রমথ মাথা দোলান। না তো!

জ্ঞানবাবু বলেন, ও তো এখন এ্যাবস্কণ্ডার! ধরা না পড়া অব্দি আমার কিচ্ছু করার নেই। তাছাড়া ওর বিরুদ্ধে সিরিয়াস কেস আছে। বউবাজারে একটা জুয়েলারি দোকানে ডাকাতি করতে ঢুকেছিল নাকি। কী যে বলব হতচ্ছাড়া ছেলেটাকে! অত ভালবাসতুম ওকে। আমার স্ত্রী, আমার মেয়েরাও ওকে বাড়ির ছেলের মতো ভাবত! এখন যা অবস্থা, ভেরি ডেলিকেট ব্যাপার। আমার মানসম্মানের প্রশ্ন আছে। কী যে করতে পারব, জানি না। শুধু এটুকু অ্যাসিওরেন্স আপনাকে দিচ্ছি, ও ধরা দিক—কিংবা ধরা পড়ুক, তখন আমাকে জানাবেন। আমি দেখব, কী করতে পারি। কেমন?

প্রমথ গতিক বুঝে একটু ইতস্ততঃ করে আমতা হাসেন। তারপর দুম করে বলে ফেলেন, ইয়ে—ছোটবাবু, আমার আর একটা ছোট্ট আর্জি ছিল। বলতে গেলে, হারামজাদা ডনের জন্যে আর তত মাথাব্যাথা নেই। এটুকুর জন্যে আসা!

বেশ তো, বলুন।

প্রমথ করুণ মুখে বলেন, আমার চার মেয়ে। বড়র বিয়ে দিয়েছিলাম বহরমপুরে। এখন কপাল ভেঙে আমার কাছে ফিরে এসেছে।

কী? ডিভোর্স নয় তো? আজকাল যা হচ্ছে। জ্ঞানবাবু হাসেন।

না, বিধবা হয়েছে। এক বছরের মধ্যেই।

স্যরি। মনে পড়ছে, শুনেছিলুম যেন। তারপর?

মেজোর বিয়ে দিয়েছি সিউড়িতে। প্রমথ সংক্ষিপ্ত করেন কথা। এখন বাকী দুই মেয়ের মধ্যে বড়টি বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। এবারে বি. এস. সি. ফাইনাল দিচ্ছে। এদিকে আমার অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। ফতুর হয়ে আছি। এদিকে বয়সও হয়ে গেল। কখন চোখ বুজি ঠিক নেই। তা—

হ্যাঁ, বলুন।

একটি ভাল ছেলে সম্প্রতি পেয়েছি। ওদের আপত্তি নেই। আপনি ওদের চিনবেন।—বলে প্রমথ ডাবুর কথা পাড়লেন। জ্ঞানবাবু চেনেন ডাবুকে। তাই আরও উৎসাহে মূল কথায় চলে এলেন।— ছোটবাবু, কমিউনিটি সেণ্টারের প্রজেক্টটা যদি ডাবু পায়—ও ইতি-মধ্যে খুব নাম করেছে টাটানগর এরিয়ায়। ওর ফার্মের হাতে অনেক বড় বড় কাজ হয়েছে। সব কাগজপত্র দেখাতে পারি—যদি সময় করে দেখতে চান। অবশ্য সে সাবকণ্ট্রাক্টর। তাহলেও এক্সপিরি-য়েন্স তো হয়েছে। ভেরি এনার্জেটিক অ্যাণ্ড এফিসিয়েণ্ট ছেলে। এখানে কাজটাজ পেলে চলে আসবে, এবং—

জ্ঞানবাবু হাসিমুখে বলেন, আপনার কন্যাদায় উদ্ধার হবে। কেমন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই বড় ভরসা। দয়া করে আমায় নিরাশ করবেন না, ছোটবাবু!

কিন্তু ও তো ব্লক অফিসের ব্যাপার। ওঁরা টেণ্ডার ডাকবেন।

আপনি তো অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান। আপনি বললেই হবে।

জ্ঞানবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, আপনার উপকার হলে আমার আপত্তি কী? কিন্তু ব্যাপারটা ইললিগ্যাল। আপনি তো

এসব লাইনে পাকা লোক। প্রসিডিওর আইন-কানুন সবই জানেন। ভেঁটুবাবুরা এখন সব সময় ওৎ পেতে বেড়াচ্ছে।

এই সময় আকবর আবার পর্দা সরিয়ে উঁকি মারে। প্রমথ হাত তুলে বলেন, আর এক সেকেণ্ড ভাই। হয়েছে!

জ্ঞানবাবু ঘড়ি দেখে বলেন, এখনই কথা দেওয়া মুশকিল। ওবেলা কমিটির মিটিং আছে। টেণ্ডার কল করা হবে। আপনি ওকে বলুন, টেণ্ডার সাবমিট করুক। তারপর দেখছি কী করা যায়। আর ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতেও বলুন। ঠিক আছে?

প্রমথ উঠে দাঁড়ান। করজোড়ে বলেন, এতকাল কোন কিছু চাই নি ছোটবাবু। প্রার্থনাটা মনে রাখবেন দয়া করে। বৃদ্ধের কন্যা-দায় উদ্ধার করলে ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন।

জ্ঞানবাবু হাসতে হাসতে বলেন, পাত্র যদি কাজ পেয়ে আপনাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়?

প্রমথ শশব্যস্তে বলেন, না না। ওদের সঙ্গে আমাদের ছ'পুরুষের সম্পর্ক! ডাবু তো প্রায়ই আসে। আমার বাড়িতে থেকেই এক-রকম মানুষ বলতে পারেন!

অলরাইট প্রমথবাবু!

প্রমথ হাসিমুখে বেরিয়ে যান। ছ'মিনিটের জায়গায় পাঁচ মিনিট সময় নিয়েছেন। সেই গর্বে হনহন করে বেরিয়ে যান কারুর দিকে তাকান না।

তাকালে দেখতে পেতেন, দর্শনার্থী'দের মধ্যে সতীশ মোক্তারের বিধবা স্ত্রী মানদাসুন্দরীও বসে আছে কোণার দিকে।

এবং প্রমথকে দেখে কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করেছিল সে। কিন্তু প্রমথ সোজা বেরিয়ে গেলেন।

হেমাঙ্গ অভ্যাসমতো দক্ষিণের জানালায় বসে বাসি খবরের কাগজ পড়ছিল। সেদিনের কাগজ আসতে সেই বারোটা। অবশ্য স্টেশনে গেলে সকালের মধ্যেই কাগজ পাওয়া যায়। কিন্তু তার

কাগজ আসে লোকাল এজেন্ট অধীরবাবুর কাছ থেকে। অধীরবাবুর লোক সাইকেল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বিলি করে। হেমাঙ্গের এখানে তার শেষ কাগজ বিলি।

তবে এটা মন্দ না। দুপুরের খাওয়ার পর শুয়ে কাগজ পড়তে ভাল লাগে হেমাঙ্গের।

এখন এভাবে বসে বাসি কাগজ পড়ার মানে সময় কাটানো। মুনাপিসি বেরিয়ে গেছে কোথায়। বলে গেছে, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবিনে। হেমাঙ্গকে একটা রিক্‌শা ডাকতেও হয়েছে। এ পাড়ার রাস্তার যা অবস্থা, রিক্‌শো আসতে চায় না। সেই বড় পোলের কাছ থেকে অনেক খোসামুদি করে আনতে হয়েছে। কিন্তু পিসিমার গন্তব্যস্থল হেমাঙ্গ জানে না। শেষ অব্দি সতীশ মোক্তারের খাতির।

মুনাপিসির এই যাওয়াটা রহস্যজনক। হেমাঙ্গ জিগ্যেস করেছিল থানায় যাচ্ছ না তো?

নারে বাবা না। তুই চুপ করে বসে থাক তো।

হেমাঙ্গ ভেবেই পায় না, কোথায় যেতে পারে মুনাপিসি রিক্‌শো চেপে? সচরাচর তো যায় না। কতকটা একানড়ে মতো থাকে। গেলে বড়জোর রিফিউজি কলোনীতে। এ ছাড়া মাসের গোড়ায় আগে যেত পোস্টাপিসে টাকা তুলতে,—আজকাল ব্যাঙ্ক হয়েছে, ব্যাঙ্কেই যায়। মুনাপিসি এভাবে চুপচাপ কেমন করে সময় কাটায় সে ভেবে পায় না।

সেদিনের একটু রাগারাগি বা অভিমান কাটতে বেশী দেরি হয় নি। হেমাঙ্গের নিজের পায়ে দাঁড়াবার যে জেদটা চড়েছিল, আবার মিইয়ে গেছে। আলসোর অভ্যেস দানা বেঁধে গেলে তাকে কাটানো ভারি কঠিন। আবার দিন কাটছে, রাত কাটছে এলোমেলো চিন্তায়, কল্পনায়—অর্থাৎ তার চিরাচরিত দিবাস্বপ্নে। সেই দিবা-স্বপ্নে অমি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, যৌবন ও সৌন্দর্যের প্রতীক, এবং হেমাঙ্গও এক বলিষ্ঠ যৌবনসম্পন্ন পুরুষ। মাঝে মাঝে সেই দিবাস্বপ্নে তীব্র

যৌনতা এসে তাকে উত্তপ্ত করে তোলে। বুঝতে পারে শরীরের খেলায় প্রাণীদের মতো জড়িয়ে পড়ার ফলে মানুষের ভালবাসা ভীষণ কষ্টদায়ক এবং সমস্যাসংকুল হয়ে যেতে পারে। মাঝে মাঝে সে চুপি চুপি বালিশ শুঁকেছে অমির চুলের গন্ধ পাবে বলে। অমি সে রাতে কিছুক্ষণ শুয়েছিল এই বিছানায়। ইতিমধ্যে বালিশের ওয়াড় বদল হয়েছে। বিছানার চাদরও গেছে পাল্টে। অথচ গন্ধটা এখনও যেন পায়। হয়তো স্মৃতির গন্ধ।

সেদিন ইলুর কাছে অমির কথা জানার পর থেকে অমির জন্যে সে সারাক্ষণ ছটফট করেছে। নিজের ভীরুতায় তার নিজের ওপর ঘৃণা হয়েছে। অন্ততঃ বোসবাড়ি গিয়ে অবস্থাটা দেখে আসতে পারত। অমির পাশে বসে সান্ত্বনা দিতেও পারত।

মনে মনে তৈরি হয়নি, তাও নয়। কিন্তু শঙ্করা তাকে কেমন ভয় ধরিয়ে দিল। হেমাঙ্গের খুলির কথা বলল। জগার খুলিটা দেখেছে হেমাঙ্গ। তার নিজেরও যে একটা খুলি আছে, শঙ্করা তাকে টের পাইয়ে দিল!

অমিকে দেখতে যাবার ইচ্ছেটা তখনকার মতো দমে গেল হেমাঙ্গের। তারপর, ও কিছুই নয়—শঙ্করা তাকে নিছক তামাশা করে ভয় দেখিয়েছে, এই ভেবে হেমাঙ্গ আবার তৈরি হচ্ছিল মনে মনে। হঠাৎ কাল বিকেলে এক ভদ্রলোক এলেন।

মাথায় উঁচু, রোগাটে গড়ন, তামাটে রঙের লোক। মুখে পোড়-খাওয়া ভাব। গোঁফদাড়ি সম্ভবতঃ দু'দিন কামানো হয়নি। লম্বাটে নাক, কিন্তু চোখ দুটো গোল, কুতকুতে চাউনি। গায়ে সাদা হাত-গুটানো শার্ট, পরনে যেমন তেমন করে পরা ধুতি, পায়ে গাবদা পাম্পস্। বুকপকেটে নোটবই আর কাগজ ঠাসা ছিল। দুটো কলমও।

লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার, তাঁর মুখের নির্বিকার ভাব। কোন এক্সপ্রেশন নেই। ঠোঁট ফাঁক হয় এবং দাঁতও একটু দেখা যায়—অর্থাৎ হাসি, কিন্তু সে-হাসিও ঠিক হাসি নয়। এমনি একজন

ভদ্রলোক আস্তেসুস্থে রাস্তা থেকে উঠে বারান্দায় এলেন। হেমাঙ্গ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল তখন। কিছু জিজ্ঞেস না করে ওভাবে উঠে আসায় হেমাঙ্গ অবাক হয়েছিল।

আপনি হেমাঙ্গ ব্যানার্জি? এই তাঁর প্রথম প্রশ্ন।

হেমাঙ্গ ঘাড় নেড়েছিল। হ্যাঁ। কী ব্যাপার?

আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। একটু বসতে চাই।

হেমাঙ্গ ইতস্তত: করে বলেছিল, কোত্থেকে আসছেন আপনি?

থানা থেকে।

থানা থেকে মানে? হেমাঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে অবশ কয়েক মুহূর্ত। উরু ভারি। চোয়াল আঁটো।

আমি আই. বি. সাব-ইন্সপেক্টার।

সামলে নিয়ে হেমাঙ্গ জ্বলে ওঠার মত চার্জ করেছিল, আমার কাছে কী?

ভদ্রলোক সেই নির্বিকার হেসে বলেছিলেন, বলব বলেই তো এসেছি ভাই।

হেমাঙ্গের স্বভাবে ভীরুতা আছে। কিন্তু সে কোনো কোনো সময় উল্টো মেরুতেও চলে যেতে পারে। সম্ভবতঃ সব ভীরু মানুষের বেলায় এটা হয়। একটা মুহূর্ত আসে, যখন সে মরীয়া। শুধু মানুষ কেন, এমন প্রাণীও তো আছে। খেঁকি নেড়ী কুকুরও হঠাৎ খ্যাঁক করে কামড়ে দিতে পারে। হেমাঙ্গ বলেছিল, কিন্তু আপনি যে আই বি. অফিসার, কেমন করে বুঝব?

তখন ভদ্রলোক পকেট থেকে আইডেন্টি কার্ড বের করে সামনে ধরলেন। হেমাঙ্গের বুক ধুক ধুক করছিল। সে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখে বলেছিল, আচ্ছা, ভেতরে আসুন।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে চারপাশটা দেখে চেয়ারে বসলেন। হেমাঙ্গ বলেছিল, চা বলি?

ধন্যবাদ। অসুবিধে না থাকলে আপত্তি নেই।

হেমাঙ্গ ভেতরে গিয়ে মুনাপিসিকে আসল ব্যাপারটা গোপন করে

শুধু বলেছিল, এক পরিচিত ভদ্রলোক এসেছেন, পিসিমা। এককাপ চা করে দাও না!

মুনাপিসি বলেছিল, কে রে?

চিনবে না। বলে হেমাঙ্গ ফিরে এসেছিল। খাটে পা ঝুলিয়ে বসে বলেছিল, বলুন!

আপনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন!

হেমাঙ্গ নড়ে উঠেছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা…

আপনার ভয় পাওয়ার কারণ নেই, এটা জাস্ট সে-ব্যাপারেই একটা এনকোয়ারি।

পুলিস ভেরিফিকেশন তো? তাই বলুন।

দ্যাটস রাইট।

আগে বললেই হত স্যার! হেমাঙ্গ তোয়াজ শুরু করেছিল। কী মুশকিল!

আমি আপনাকে ইনশল্টিং টোনে কথা বলেছি! হেমাঙ্গ নির্মল হেসে ব্যাপারটা হাল্কা করতে চাইছিল।

আই. বি. অফিসার তেমনি নির্বিকার। নোটবই বের করে কী-সব দেখে নিয়ে তারপর বলেছিলেন, এর আগে কোনো চাকরি-বাকরি করেন নি তো?

না। পাইনি। পেলে তো…

এরপর বাবা-মায়ের নাম, তাঁরা বেঁচে আছেন কি না, বাবা কী চাকরি করতেন…এইসব থেকে শুরু করে হেমাঙ্গের পুরোদস্তুর জীবনচরিত এসে গিয়েছিল। এক ফাঁকে মুনাপিসি পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে চা দিয়ে গেল। চা খেতে-খেতে গোয়েন্দা হেমাঙ্গের সোস্যাল ওয়ার্ক, খেলাধুলোর ঝোঁক, ইত্যাদি হরেক প্রশ্ন করতে থাকলেন। হেমাঙ্গ খুশিমনে জবাব দিচ্ছিল। বাড়তি কথাও যোগ করছিল। চায়ের কাপ নীচে রেখে গোয়েন্দা তারপর হঠাৎ বলেছিলেন, অমিতা বোস নামে একটি মেয়েকে চেনেন নিশ্চয়?

হেমাঙ্গ চমক খেয়ে জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ। চিনি। কেন বলুন তো?

অমিতার সঙ্গে আপনার কেমন সম্পর্ক?

কেমন সম্পর্ক মানে?

আই মিন, হোয়েদার ইউ হ্যাভ এনি এমোশানাল এ্যাফেয়ার উইথ হার?

হেমাঙ্গ আকাশ থেকে পড়ার মতো বলেছিল, এর সঙ্গে আমার চাকরির ভেরিফিকেশানের সম্পর্ক কী?

আপনার মরাল ক্যারেক্টার সংক্রান্ত। বুঝলেন না? জাস্ট-ক্যারেক্টার ভেরিফিকেশন।

হেমাঙ্গ গম্ভীর মুখে বলেছিল, মোহনপুরে অনেকে অনেক কথা রটাতে পারে। কিন্তু অমিতা আমার ভাবী স্ত্রী।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। চাকরি পেলেই বিয়ে করব।

আপনারা তো ব্রাহ্মণ। ওরা কায়স্থ।

আমি ওসব মানি নে। আজকাল কেউ মানে না।

আপনার গার্জেন আপত্তি করবেন না?

সম্ভবত না। হেমাঙ্গ এবার ভীষণ বিরক্ত। কিন্তু চাকরির ব্যাপার বলে তেতো বড়ি গিলতেই হচ্ছিল তাকে।

সম্প্রতি অমিতার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

একটু দেরি করেই জবাব দিয়েছিল হেমাঙ্গ। না। কেন? সে তো অসুস্থ শুনেছি।

আপনি অমিতার ভাই সুপ্রকাশ ওরফে ডনকে তো চেনেন?

চিনি। কেন?

ডনের সঙ্গে সম্প্রতি নিশ্চয় দেখা হয়েছে আপনার?

না। এবার হেমাঙ্গ ঘামতে শুরু করেছিল।

ডন কোথায় আছে, তার দিদি নিশ্চয় বলেছে আপনাকে?

না। কিন্তু এসব কেন জিগ্যেস করছেন আমাকে?

অন্তত ডন সুস্থ না অসুস্থ, এটুকু নিশ্চয় বলেছে ?

হেমাঙ্গ জোরে মাথা নেড়েছিল। ডনের কোনো খবর আমি জানিনে। কেউ বলে নি। আপনি অকারণ আমাকে টিজ করছেন স্যার !

সিক্সথ্ এপ্রিল রাত্রে আপনি এবং অমিতা কোথায় গিয়েছিলেন ?

হেমাঙ্গ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকার পর জবাব দিয়েছিল, কে বলল আপনাকে ?

কোথায় গিয়েছিলেন হেমাঙ্গবাবু ?

একটু চুপ করে থাকার পর হেমাঙ্গ বলেছিল, আমরা মাঝে মাঝে বেড়াতে বের হই। সবাই জানে।

রাত্রে ?

হ্যাঁ। অনেক সময় রাত্রেও গেছি।

সিক্সথ্ এপ্রিল কোথায় গিয়েছিলেন ?

ক্যানেলের স্লুইস গেটের ওখানে। কতবার তো গেছি।

রাত একটা-দেড়টায় ?

হেমাঙ্গ একটু ফুঁসে উঠেছিল এবার। আপনি কিন্তু স্যার ইন্‌ডিভিজুয়াল লিবার্টিতে হস্তক্ষেপ করছেন। রাতে বেড়ানো নিশ্চয় বেআইনী নয় ?

ডিপেণ্ডস্। আচ্ছা হেমাঙ্গবাবু, আমি উঠি। গোয়েন্দা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর আগের মতো বিকারহীন হেসে ফের বলেছিলেন, শীগগির কোথাও বাইরে যাচ্ছেন না আশা করি !

না। কেন ?

প্লিজ টেক ইট অ্যাজ এ ফ্রেণ্ডস এ্যাডভাইস, আপাতত কিছুদিন বাইরে যাবেন না। জরুরী কারণে যেতে হলে দয়া করে থানায় একবার জানিয়ে যাবেন। আর, দেখুন হেমাঙ্গবাবু, কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আপনাকে আমার ভাল লাগল বলেই বলছি। মাঝে-মাঝে আমরা কেউ আপনাকে বিরক্ত করতে পারি। কিংবা ধরুন, থানা থেকে ডাকা হতেও পারে আপনাকে। নির্ভয়ে

যাবেন। আপনি যদি ক্লিন হন, ভগবান আপনাকে রক্ষা করবেন। আরে ব্রাদার, তিনি তো আছেন মাথার ওপর।

শেষ কথাগুলো শুনে হেমাঙ্গের কান গরম হয়ে গিয়েছিল। ভগবান দেখাচ্ছে! নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়েছিল সে। গোয়েন্দাটি আস্তে সুস্থে হেঁটে যাচ্ছেন। এতক্ষণে লক্ষ্য করল, মাথার পেছনে টাক আছে।

সেই সময় মুনাপিসি ভেতর থেকে ছিটকে এসেছিল। তারপর চাপা গলায় বলেছিল, কী রে হেমা, কী? তুই কী করেছিস? ও অত কথা জিগ্যেস করছিল কেন? ও হেমা!

চুপ করো তো বাবা! চাকরির ব্যাপারে ভেরিফিকেশনে এসেছিল।

আই. বি.। তাই না?

হ্যাঁ।

হেমা! এবার হল তো? এবার দেখ, কে তোকে বাঁচাবে। তোর পিসেমশাই থাকলে···

আঃ. চুপ করো না বাবা।

ওরে হেমা! আমি সব শুনলুম যে রে! চাকরি-টাকরির ব্যাপার নয়। প্রমথ বোসের ভাইঝি তোকে ডুবিয়েছে! আমি কতবার তোকে বলেছি, ওই সর্বনাশীর দিকে তাকাসনে হেমা!

হেমাঙ্গ রাগ দেখিয়ে বলেছিল, বাইরে দাঁড়িয়ে সিন ক্রিয়েট কোরো না তো। ভেতরে এস।

ভেতরে গিয়ে মুনাপিসি কান্নাকাটি করে অস্থির।

হেমাঙ্গ বুঝতে পেরেছে, এ নিশ্চয় শংকরার কীর্তি। ব্যাটা পাগল সেজে থাকে। ভেতরে-ভেতরে নিশ্চয় পুলিসের চর। সে রাতে তাদের যাওয়াটা দেখার চান্স একমাত্র শংকরার থাকতে পারে। ব্যাটা ভূতের মতো যেখানে-সেখানে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়। শংকরাকে কাল সন্ধ্যায় গিয়ে চার্জ করবে ভেবেছিল।

কিন্তু শংকরাকে দেখতে পায় নি। হেমাঙ্গ ওর আখড়াটা ভেঙে চুরে তছনছ করে এসেছে। শংকরার দেখা পেলে এখন তাকে মারতেও দ্বিধা হবে না হেমাঙ্গের।

কাল রাতে আরেকটা সাংঘাতিক আতঙ্কের ঝড় উঠেছিল তার মধ্যে। ডনের সেই রিভলবারটা। অমি সে রাতে ওটা তার কাছে রেখে গিয়েছিল। কারণ ওর ধারণা যখন তখন বোসবাড়ি সার্চ হতে পারে। হেমাঙ্গ কাগজে রিভলবারটা জড়িয়ে দেয়াল আলমারিতে বইয়ের পেছনে রেখেছিল। আই. বি. অফিসার যখন কথা বলছিলেন, তখন-ওটা সেখানেই। সার্চ করলেই কী বিপদে না পড়ত সে। প্রথম সুযোগেই তাই ওটা সরিয়ে খিড়কির ওধারে সব্জীক্ষেতে মাটি ঢাকা দিয়ে এসেছিল। তারপর অনেক রাতে মুনাপিসির ঘরের দরজা বন্ধ হলে সে চুপি-চুপি বেরিয়ে যায়। সকালে সব্জীবাগানে ঢোকা মুনাপিসির অভ্যাস, চোখে পড়াটা অসম্ভব নয়। তাই রিভলবারটা ওখান থেকে সরিয়ে সে প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়েছিল। অস্ত্রটা খুব ছোট্ট। কিন্তু বেশ ওজন আছে।

সে ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে এবার। কোথায় লুকিয়ে রাখবে? এদিকে অন্ধকারে কোথাও ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে শঙ্করা তাকে দেখছে কিনা, সেও এক আতঙ্ক। শেষ অব্দি সে ওটা পকেটে নিয়ে বাড়ি ঢুকেছিল এবং উঠোনের কোণায় কবেকার জড়ো করে রাখা সুরকির পাঁজায় ঢুকিয়ে ভাঙা ইটগুলো আগের মতো চাপিয়ে ঠিকঠাক করে দিয়েছিল। তারপর হাত ধোওয়ার শব্দে মুনাপিসি জেগে বলেছিল, কে রে? হেমা? কী করছিস?

হ্যাঁ পিসিমা। ল্যাট্রিনে গিয়েছিলুম।

বাইরের আলোটা জ্বালিস নি কেন? অন্ধকারে আছাড় খাবি যে!

না। তুমি ঘুমোও তো বাবা!

সকালে হেমাঙ্গ দেখে নিয়েছে, ইট দিয়ে ঢাকা সুরকির পাঁজাটা নির্দোষ দেখাচ্ছে। কিন্তু বৃষ্টি হলেই মুশকিল। রিভলবারে নিশ্চয় জং ধরে যাবে। শীগগির একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কোথায়

নিরাপদে রাখবে, এখনও ভেবে পাচ্ছে না। দৈবাৎ ডনের খবর পেয়ে গেলে সে যেভাবে হোক, অমির মুখ চেয়ে সবরকম ঝুঁকি নিয়েও ওটা তাকে ফেরত দেবে।

ঘণ্টা দুই পরে মুনাপিসির সাড়া পাওয়া গেল বাইরে। রিকশো চেপেই এসেছে। হেমাঙ্গ বেরিয়ে বলে, উদ্দেশ্য সফল তো মুখে তো হাসি দেখতে পাচ্ছি!

মুনাপিসির মুখে হাসি স্পষ্ট। কিন্তু কোনো জবাব দেয় না। নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে।

হেমাঙ্গ বলে, নিশ্চয় আমার জন্য কনে দেখতে যাওনি?

মুনাপিসি হেমাঙ্গের দিকে চড় তুলে বলে, এই তোর লাস্ট চান্স। ফের যদি কখনও দেখি কিংবা শুনি, তুই ওই হতচ্ছাড়ী মেয়েটার সঙ্গে মিশেছিস, আমার মরা মুখ দেখবি।

এ তো তোমার পেটেন্ট শাসানি! হেমাঙ্গ হাসে। বলো না কোথায় গিয়েছিলে? থানায় বুঝি?

জ্ঞানবাবুর কাছে।

উরে ব্বাস! তুমি মশা মারতে কামান দাগতে গেলে?

চুপ। একেবারে চুপ। আর কথাটি বললে তোকে বঁটিতে চড়াব। মুনাপিসি আঙুল তুলে শাসায়। তারপর ভেতরের বারান্দায় যেতে যেতে বলে, জ্ঞানবাবু তোকে দেখা করতে বললেন। পরশু কলকাতা যাচ্ছেন। তার আগে যেন দেখা করে আসবি।···

।। দশ ।।

সুলোচনা অমিকে রিকশো করে নিয়ে গেছেন জটাবাবার থানে। সঙ্গে পল্টে গেছে সাইকেলে। এইতে প্রমথ ক্ষেপে গিয়েছিলেন। রোয়াকে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ ওঠেন এবং ভেতরে গিয়ে টলুকে বলেন, জনকে জামা-প্যাণ্ট পরিয়ে দে। ওকে নিয়ে বেরুব।

ইলুও সঙ্গ ধরল। তাই দেখে মিলু বলে, বাবা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

প্রমথ ধোয়া ধুতি পাঞ্জাবি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভুরুতে চিরুনি চালাচ্ছিলেন, বলেন ব্লক কোয়ার্টারে। শংকরী প্রায় বলে, যাওয়া হয় না রে। তুই যাবি!

ইলু খুনসুটি করে, নাও! আমার যাওয়া সইবে না। পঙ্গপাল সঙ্গ ধরবে। যায় তো ওরা যাক। আমি না।

মিলু বাঁকা ঠোঁটে বলে, আমি কারুর সঙ্গে যাব না। আমি যাব মহুয়াদের কোয়ার্টারে।

প্রমথ বলেন, মহুয়া কে রে?

আছে ওখানে। তুমি চিনবে না।

শেষঅব্দি প্রমথ দুই মেয়ের মধ্যে রফা করে দিলেন। জন মুখটা সাদা করে ফেলেছে পাউডারে। টলু আঁচল ঘষে মুছতে গেলে জন ছিটকে বেরিয়ে গেল। টলু বোনদের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি একা থাকব বাড়িতে?

পাছে বড়দিও সঙ্গ ধরে, ইলু দ্রুত বলে, কেন? ঘণ্টার মা রইল না?

মিলু হাসে।...ও বড়দি। যদি তোকে সৈকা বাগে পেয়ে ধরে?

প্রমথ ঘড়ি দেখে কপট ধমক দেন, নাও! হল তোমাদের সাজ-

গোজ ? জন কোথায় গেলি রে ! সাড়ে চারটে বেজে গেল। আয় ইলু। তারপর ছড়িটি আলমারির মাথা থেকে টেনে বের করেন।

মিলু বেরুল সবার শেষে। একা পেছনে যাবে। ইলুর সঙ্গে ঝগড়া চলছে সকাল থেকে। বইয়ের পাতা ছেঁড়াছেঁড়ি পর্যন্ত হয়েছে।

টলু রোয়াকে দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখছিল। দলটা আড়াল হয়ে গেলে সে বাড়ির দিকে ঘুরে ঘণ্টার মায়ের উদ্দেশ্যে বলে, মাসি ! আমি এখানে আছি।

কদিন থেকে গরম পড়েছে। বাতাসও বইছে না। গাছপালার ঝিমধরা অবস্থা। আকাশকে শক্ত দেখাচ্ছে। বিকেলে এই ছোট্ট বাগানে অনেকরকম শব্দ অনেক গন্ধ। কোনার আমগাছে এবার বেশি মুকুল আসে নি। ভোরের কুয়াশার উপদ্রবে গুটিও ধরে নি বিশেষ। গতবার খুব আম হয়েছিল। টলু কোমরে আঁচল জড়িয়ে আমতলায় ঘোরে কিছুক্ষণ। তারপর ফুলগাছগুলোর দিকে যায়। ওদিকটা খোলামেলা। সেই সময় লক্ষ্য করে পশ্চিমের আকাশ জুড়ে চাপ চাপ মেঘ ঘনিয়েছে কখন। মেঘের মাথায় মেটে সিঁদুরের ছোপ। পুরনো ট্যাংকের ওপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে সাদা বক পালিয়ে যাচ্ছে। তারপর সোনালী রূপোলী রঙ ছড়িয়ে পড়ার মতো বিদ্যুৎ ঝিলিক দিতে থাকে। দূরে চাপা গুমগুম শব্দ ওঠে। কোথাও শনশন শব্দ হয়। তারপর দ্রুত বিকেলের রোদ চাপা দিতে দিতে আবছায়া ঘন হয়ে ওঠে। ঘণ্টার মা ডাকছিল—টলু, ও টলু। ঝড় উঠছে যে গো। ওরা সব বেরুল অবেলায়। ও মা, কী হবে!

টলু রাগ দেখিয়ে বলে, কী হবে আবার ? জানলা বন্ধ করোগে যাও।

বছরের প্রথম কালবৈশাখীর স্বাদ গায়ে নেয় টলু। চারপাশে হাজার হাজার হাতি শেকল ছিঁড়ে ফেলার জন্যে ছটফট করছে। হাতিগুলো মাটি কাঁপিয়ে হুলুস্থুলু করছে। কবে কোন প্রাগৈতিহাসিক সময়ে শেকলে ধরা পড়া আসঙ্গলিপ্সু কালো-কালো মত্ত হাতি। বিশাল শরীর। শুঁড় তুলে বৃংহতি নাদ তুলেছে। তাদের

পায়ের শব্দ, কালো শরীরের পিচ্ছিল স্পর্শ মাথার মধ্যিখানে। শেকল খুলে দেওয়ার ভঙ্গীতে সে দাঁড়িয়েছে। পোড়ো রেশমকুঠির ওদিকে দেবদারু গাছের মাথা ভেঙে পড়ল। ঘণ্টার মা আবার রোয়াকের দিকে বেরিয়ে আর্তনাদ করে, ও টলু! শিল হবে, শিল। গতিক ভালো না গো! ফাঁকায় থেকো না বাপু!

বোনেরা মিলে শিল কুড়োনো অভ্যাস আছে। টলু ঝড়ের ধাক্কায় টালমাটাল। ওর কাপড় জড়িয়ে যাচ্ছে এবং খুলে যাচ্ছে। কুঁজো হয়ে পা ঢাকতে ঢাকতে আসে। চোখ খোলা কঠিন। ধুলো খড়-কুটো ছেঁড়াপাতা ঘুরপাক খাচ্ছে। রোয়াকের কাছে এসে ভাল করে তাকিয়ে দেখে, হেমাঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। জ্বালাকরা চোখ কচলাতে কচলাতে টলু লাফ দিয়ে উঠে বলে, হেমা যে! আর আসবার সময় পাও নি? অসময়ে মরতে এলে? যাও, ভাগো! কেউ নেই বাড়িতে।

সেই সময় শিলপড়া শুরু হল। অলীক সন্ধ্যার আবছায়া জুড়ে কুয়াসার ধুসর পর্দা উড়ল। ঘণ্টার মা ভেতরে চলে গেছে। টলু হেমাঙ্গের পাশে দাঁড়িয়ে বলে, মুখে বোবা ধরেছে, হেমা? কথা বলছ না যে?

হেমাঙ্গ হাসে। তুমি তো ভাগিয়ে দিচ্ছ টলুদি!

দেব না কেন? তুমি যার কাছে এসেছ, সে তো নেই। মা ওকে নিয়ে জটাবাবার থানে গেছে। বাবা, জন, মিলু, ইলু গেছে ব্লক অফিসের ওখানে। টলু রোয়াকে নেমে হাতের তালুতে শিল কুড়োতে থাকে। তুমি ঠিক সময়ে আসো নি। গেট আউট।

হেমাঙ্গ বলে, ঠিক আছে। চলি।

সে রোয়াকে নামতেই টলু ওর প্যাণ্ট খামচে ধরে ভিজে হাতে। আরে! তুমি পাগল না মাথা খারাপ? মরবে নাকি? শিল পড়ছে। বাজ ডাকছে! এস, শিল কুড়োও আমার সঙ্গে।

অগত্যা হেমাঙ্গ মোটা কয়েকটা শিল কুড়িয়ে তুহাতে লোফালুফি করে। ইস। রক্ত জমে যাচ্ছে যে! তুমি ধরে আছ কীভাবে টলুদি?

টলু হাসে। আমার হাতে কোনো সেন্সেশান নেই

যাঃ। ঠাণ্ডা লাগে না তোমার?

বললুম তো। আমার গণ্ডারের চামড়া। বলে টলু যেন নিজের চামড়ার শক্তি দেখাতেই কয়েক পা এগিয়ে যায়। ঝড়, শিলাবৃষ্টি আর বজ্রপাতকে পরোয়া নেই, এমন ভঙ্গিতে থানের শাড়ি ভিজিয়ে এবং মুহুর্মুহু শিলীভূত বৃষ্টির প্রহারকে তুচ্ছ করে টলু তার দিকে ঘুরে হাসে, মুখ গড়িয়ে ফোঁটা ঝরে পড়ে গলার খাঁজে।

হেমাঙ্গ বলে, এই টলুদি! কী হচ্ছে? উঠে এস, উঠে এস।

সামনে কাছাকাছি কোথায় বাজ পড়ে এবং চোখের সামনে বিস্তৃত ঝলক—হেমাঙ্গ চোখ বুজে ফেলে এবং যখন খোলে, টলুকে কাছে দেখতে পায়। ভিজে জবুথবু অবস্থা। একটু-একটু কাঁপছে। কাপড় সেঁটে গেছে শরীরে। ফর্সা রঙ আবছায়ার মধ্যে ফুটে বেরিয়ে দাউ দাউ জ্বলছে। সে বলে, হেমা! হাঁ করো!

কেন?

শিল খাও। হাঁ করো।

ছ্যাঃ। ওই নোংরা জায়গায় পড়েছিল!

ইস! খুব ভাল জায়গার মানুষ তুমি। বলে হাসতে হাসতে শিল-গুলো ফেলে দিয়ে টলু কাঁপতে কাঁপতে পা বাড়ায়। ভীষণ শীত করছে যে! হেমা, ভেতরে এস। কাপড় বদলে নিই! বাবা রে বাবা! কত বিশ্রী গরম করছিল এতক্ষণ! এখন দেখি ডিসেম্বরের শীত!

হেমাঙ্গ ভেতরে যায়। ভেতরের বারান্দায় বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে। কিচেনের দরজার কাছে ঝি মেয়েটি চুপচাপ বসে আছে। টলু তার ঘরে ঢোকে। আলো জ্বালে। ডাকে, হেমা! এস। ওখানে ভিজছ কেন?

হেমাঙ্গ বাধ্য ছেলের মতো ওর ঘরে যায়। সেই বিশাল বিছানা। হারমোনিয়াম, তানপুরা, ডুগিতবলা। সে চুপচাপ বসে বিছানায় পা ঝুলিয়ে। টলু বাইরে কোথাও কাপড় বদলাচ্ছে।

একটু পরে তোয়ালেতে চুল ঘষতে ঘষতে সে ফিরে আসে। বলে, প্রথম কালবোশেখী আজ। তাই না রে হেমা?

হেমাঙ্গ বলে, হ্যাঁ। জাস্ট তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি এসেছি, আর…

এ্যাদ্দিন আসিস নি কেন রে?—টলু একটু হেসে ফের বলে, দেখছিস? তোকে আগের মতো তুই তোকারি করছি। তুই আমার চেয়ে এক-দেড় বছরের ছোট। তাই না? লালু আমার চেয়ে দেড় বছরের ছোট ছিল।

লালুর চেয়ে আমি দুমাসের বড়ো।

বলিস কী! টলু বিছানা ঘুরে এগিয়ে উত্তরের জানলা খুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু বৃষ্টির ছাঁট আসছে দেখে বন্ধ করে দেয়। বলে, তোর গরম লাগছে না তো? আমার শীত করছে।

করবেই তো। ভিজেছ। বলে হেমাঙ্গ সিগারেটের প্যাকেট বের করে।

টলু আঁতকে উঠে বলে, এই! খাসনে। ওরা এসে গন্ধ পাবে।

হেমাঙ্গ চকিতে অপ্রস্তুত হয়। প্যাকেট পকেটে ঢুকিয়ে আমতা হেসে বলে, তুমি একসময় লুকিয়ে সিগারেট খেতে আমাদের সঙ্গে। মনে পড়ছে?

টলু কেমন হাসে। তারপর দরজার কাছে গিয়ে বলে, বোস। চা নিয়ে আসি।

হেমাঙ্গ প্যান্টের বাঁ পকেটে রুমালের তলায় হাত ঢুকিয়ে দেখে নেয়, জিনিসটা আছে কি না। ভাগ্যিস দুপুরে সুরকির পাঁজা থেকে বের করে রেখেছিল। নৈলে ভিজে জং ধরে যেত। শেষঅব্দি অনেক ভেবে সে রিভলবারটা অমিকেই ফেরত দিতে এসেছে। নার্ভের চূড়ান্ত অবস্থা! রিস্ক নিয়েই এবাড়ি এসেছে। বারবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেছে, কেউ তাকে ফলো করছে নাকি। ভাগ্যিস ঝড়টা এসে পড়ল!

কিন্তু অমিকে নিয়ে গেছে জটাবাবার থানে। লোকোশেডের

ওদিকে একটা বড়ো পুকুরের পাড়ে জঙ্গলে জায়গায় থান। এক মুসলমান সাধুর কবর আছে। ওখানে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ওরা কীভাবে আছে কে জানে! একজন সেবায়েত ফকির থাকে অবশ্য। একটা ভাঙাচোরা ঘর আছে ইটের। ঘরটা যেকোন সময় ভেঙে পড়তে পারে। হেমাঙ্গ উদ্বেগ বোধ করে।

তার চেয়েও সমস্যা তার নিজের। আবার রিভলবারটা নিয়ে যাওয়া!

হঠাৎ মনে হয়, টলুকে বলবে সব? টলুর কাছে দিয়ে যাবে? টলু অমিকে দেবে। তারপর ভাবে, অমি ব্যাপারটা কীভাবে নেবে? সে ভুল বুঝতে পারে হেমাঙ্গকে। আনমনে হেমাঙ্গ তানপুরাটা টেনে নিয়ে পিড়িং পিড়িং করতে থাকে।

টলু তুহাতে তুকাপ চা নিয়ে এল। এসে বলে, জানিস আমার চা খাওয়া বারণ? এই সব সুযোগ পেলে লুকিয়ে খাই। এমনকি কাটলেট পর্যন্ত।

হেমাঙ্গ চা নিয়ে বলে, কাটলেট কোথায় পাও?

কাটলেট কোথায় পাওয়া যায় রে?

সে তো বসন্ত কাফেতে।

তবে জিগ্যেস করছিস কেন?

আহা, এনে দেয় কে?

টলু চায়ে চুমুক দিতে দিতে তার পাশে বসে। বলে, আমার লোক আছে। বলব না।

হেমাঙ্গ চুপচাপ চা খায়। এখন বেশ অন্ধকার ঘনিয়েছে বাইরে। মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। ঝড়টাও চলেছে। হেমাঙ্গ বলতে যাচ্ছে এখন লোডশেডিং হলে দারুণ জমে—বলার মুখেই সত্যি তাই হল। ঝড়ের দিন এ ব্যাপারটা প্রতিদিনই হয়। কোথায় মেন লাইন ছিঁড়ে যায়। থাম উপড়ে যায়।

ঘণ্টার মা চেঁচিয়ে উঠেছিল কিচেনের দিকে। টলু সাড়া দিয়ে বলে, তাকে মোম আছে। জেলে নাও। এই হেমা! দেশলাই জাল। হ্যারিকেন বের করি।

হেমাঙ্গ দুষ্টুমি করে বলে, থাক না। সৈকার ভূতটা এসে জমিয়ে তুলুক।

চাপা গলায় টলু বলে, যাঃ! ঘণ্টার মা আছে। কী ভাববে! জ্বালা না ভাই, দেরি করিস নে! বুড়ী ভীষণ লক্ষ্য রাখে সব।

হেমাঙ্গ এবার একটু কেঁপে ওঠে। তার হৃৎপিণ্ডে রক্ত শিসিয়ে উঠেছিল। খিল ধরা অবস্থা। দুই উরু ভার। কাঁপা কাঁপা হাতে সে চায়ের কাপটা অন্ধকারে পায়ের তলায় নামিয়ে রাখে। তারপর পকেট থেকে দেশলাই বের করে। কাঠি জ্বালে।

টলুও নীচে কাপপ্লেট ঠেলে দিচ্ছে। হেরিকেন খুঁজছে খাটের তলায়। কাঠিটা নিভে যায়। আবার জ্বালে হেমাঙ্গ। লক্ষ্য করে দুটো কাপেই আদ্ধেক চা রয়ে গেছে। সে জড়ানো গলায় বলে, পাচ্ছ না?

না রে! এখানেই তো ছিল। নিশ্চয় মায়ের কীর্তি! টলু গজগজ করে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। কিচেন থেকে মোম নিয়ে আসি দাঁড়া। তোর দেশলাইয়ের দরকার নেই। রাখ্।

হেমাঙ্গ দেশলাই পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছে, উঠোনের দিকে তীব্র আলোর ঝলক এবং প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। কানে তালা ধরে গেল।

টলু 'ও মা!' বলে তার ওপর ছিটকে পড়েছে এবং তার ধাক্কায় হেমাঙ্গও বিছানায় চিত হয়ে গেছে। ঠেলে ওঠার চেষ্টা করছে, তখনও তাকে দু'হাতে ধরে আছে টলু।

মেয়েদের শরীরের স্পর্শ এবং কমনীয় ভার অমির কাছে পেয়েছে হেমাঙ্গ। এ শরীর অন্য শরীর। আর টলু কি ব্রেসিয়ার পরে না? সরাতে গিয়ে হেমাঙ্গ টের পায়, টলু তাকে আঁকড়ে ধরে আছে। হেমাঙ্গ আস্তে সাবধানে বলে, আঃ! ছাড়ো!

টলু কি হাসছে নিঃশব্দে? নাকি সত্যি সত্যি ভয়ের কাঁপুনি? তারপর সে ফিসফিস করে বলে, এই বাঁদর! অমি হলে এখন কী করতিস রে?

প্লীজ. টলুদি ! হেমাঙ্গ প্রায় ককিয়ে ওঠে।

বল্ না ? ধর্, অমি তোকে এভাবে শক্ত করে—এমনি ভীষণ জোরে, তোকে মনে কর্ জড়িয়ে ধরেছে। আর তুই—তুই কী করবি ?

অগত্যা হেমাঙ্গ বলে, তুমি তো অমি নও।

মনে কর্ না বাবা, অমি আমি। অন্ধকারে আমাকে তো দেখতে পাচ্ছিস নে ! আমি অমি।

হেমাঙ্গের বুকের ভেতর বাইরের মতো ঝড়জল। বুক কাঁপছে। সে বলে, বেশ তাই। কিন্তু আমার দম আটকে আসছে, সত্যি। তুমি ভীষণ ভারি যে !

চাপা হেসে টলু সোজা হয়। কিন্তু সরে না। হেমাঙ্গ উঠে বসে। তার উরুর ওপর চাপ লাগে টলুর। তার দুই কাঁধে যেন নখ বসিয়ে রেখেছে মেয়েটা। হেমাঙ্গ মনে মনে আফশোস করে। জেনেশুনে ডাইনী অথবা বাঘিনীর গুহায় ঢুকতে এসেছিল। অমি তাকে কতবার টলুর সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল। কিচ্ছু মনে ছিল না হেমাঙ্গের।

টলু ফিসফিস করে বলে, অমিকে সত্যি বিয়ে করবি, না পথে ভাসাবি বল্ তো ?

কেন ?

বাইচান্স যদি ওর বাচ্চাটাচ্চা এসে যায় পেটে !

ভ্যাট ! কী বলছ আজেবাজে কথা !

মারব থাপ্পড় বাঁদরকে। আমি জানি নে ? আমার কাছে লুকিয়ে পার পাবি নে হেমা !

হেমাঙ্গ অস্বস্তিতে ঘামছে। বলে, এখন তোমাদের ঘণ্টার মা কিছু ভাবছে না ?

বয়ে গেল ! তুই আমার কথার জবাব দে।

কী জবাব দেব ?

অমিকে বিয়ে করবি, না শ্রেফ মজা লুটে কেটে পড়বি ?

দেখ টলুদি, একৃজাক্টলি ডন আমাকে এই কথা বলেছিল বলে—

ওর মুখে থাবা পড়ে।—বেশ করেছিল ডন। ওর দিদির সর্বনাশ করবি, আর ও তোকে ছেড়ে দেবে? মনে রাখিস, ডন এখনও বেঁচে আছে। তুমি সাবধান। জগার মত অবস্থা হবে!

তুমি কেন আমাকে শাসাচ্ছ বলো তো?

শুধু শাসাচ্ছি? তোকে পিষে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে!

বেশ, মারো! হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গীতে হেমাঙ্গ বলে।

টলু তাকে সত্যি সত্যি পিষে মেরে ফেলার মতো ফের দু'হাতে জড়িয়ে আচমকা ঝুঁকে তার নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে। হেমাঙ্গ অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। ধস্তাধস্তি করে ওকে হঠানোর চেষ্টা করে। টলুর গায়ের জোর দেখে তার অবাক লাগে।

তারপর হঠাৎ টলু তার প্যাণ্টের পকেট টিপে ধরে বলে, কী রে এটা? ব্যথা করছে! এত শক্ত কী এটা? টর্চ?

হেমাঙ্গ হাঁসফাঁস করে বলে, টর্চ! আঃ, ছাড়ো না! কী হচ্ছে?

টর্চ? ন্যাকা শেখাচ্ছ? দেখি, দেখি।

হেমাঙ্গ মরীয়া হয়ে বিছানা থেকে ঠেলে ওঠে এবং ওকে ধাক্কা দেয়। টলু পাথরের মতো। নড়ানো যায় না। হেমাঙ্গ বলে, তোমাকেও ভূতে ধরেছে টলুদি! ছাড়ো এবার। আমি চলে যাব।

তোর পকেটে ওটা কী?

ও একটা জিনিস।

বল, কী জিনিস?

বলা যাবে না।

হেমা! না বললে আমি চেঁচাব। তোর কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। ঘণ্টার মা সাক্ষী।

হেমাঙ্গ আরও ভয় পেয়ে যায়। বলে, তোমার লজ্জা করবে না?

কিসের লজ্জা? তুই বাগে পেয়ে আমাকে ধরতে এসেছিলি—আমার কী দোষ হবে?

সত্যি! তোমাকে চিনতে পারি নি টলুদি, তুমি—তুমি—

বল্, বল্—কী আমি?

তুমি ডেঞ্জারাস মেয়ে!

নেকু! জানো না সেটা? গাল টিপলে দুধ বেরোয়?

ছাড়ো! প্লীজ টলুদি! আমি চলে যাব।

এই রে! তুই কেঁদে ফেললি ভ্যাঁ করে। আয়, তোকে আদর করি।—বলে সে হেমাঙ্গের পাশে বসে পড়ে। কিন্তু ওকে ছাড়ে না।

হেমাঙ্গ বুঝেছে, টলু তাকে ব্ল্যাকমেল করছে। ওর হাত থেকে তার আজ পরিত্রাণ নেই। সে শান্ত হবার চেষ্টা করে। এবার টলু রাক্ষুসীর মতো তাকে অন্ধকারে জিভ বের করে গিলতে আসছে মনে হয়। বাইরে বৃষ্টিটা কিছু ধরেছে। কিন্তু ঝোড়ো বাতাস আছে। মেঘও ডাকছে। কিচেন এখান থেকে দেখা যায় না। বুড়ীটা নিশ্চয় কতকিছু ভাবছে। হেমাঙ্গ অসহায় হয়ে বসে থাকে। টলু তার পকেট থেকে মোড়কটা বের করার চেষ্টা করে আবার। তখন হেমাঙ্গ বলে ওঠে, ওটা ডনের রিভলবার।

কোথায় পেলি রে?

হেমাঙ্গ মিথ্যে বলতে শুরু করে।—ডন রাখতে দিয়েছিল। আমি ওর দিদিকে ফেরত দিতে এসেছি। বুঝতে পারছ না? রিস্‌কি ব্যাপার!

ঠিক আছে। আমার কাছে রেখে যা। দেব অমিকে।

হেমাঙ্গ মোড়কটা বের করে ওর হাতে গুঁজে দেয়। টলু ওটা অন্ধকারে একটু ঝুঁকে সম্ভবতঃ বালিশের তলায় গুঁজে রাখে। হেমাঙ্গ বলে, তোমাদের বাড়ি হঠাৎ সার্চ হলে বিপদে পড়বে কিন্তু।

টলু ভারি নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আর কতবার হবে? তিনবার হয়ে গেছে। আর হবে না।

এবার আমাকে যেতে দেবে তো?

হেমা! আমাকে তুই খুব ঘেন্না করিস। না রে?

না, না। কেন ঘেন্না করব?

আমাকে তোর ভাল লাগছে না?

লাগছে। না লাগার কী আছে?

টলু ওর মুখের কাছে ঝুঁকে এসে শ্বাস-প্রশ্বাস মিশিয়ে বলে, হেমা! আমাকে নিয়ে চলে যেতে পারিস কোথাও? আমার বড্ড কষ্ট রে! সময় কাটতে চায় না। বিশ্বাস কর, আমি সারারাত জেগে থাকি। ছটফট করি। কী সাংঘাতিক মনোটনাস লাইফ, হেমা! আর বাঁচতে এতটুকু ইচ্ছে করে না।

কেন টলুদি?

তুই বুঝিস নে হেমা? কেন ন্যাকামি করছিস? এবার তোকে চড় মারব আমি।

হেমাঙ্গ একটু হাসে। মারো না! অভ্যাস আছে।

হ্যাঁ, অমি তোকে চড় মেরেছিল।

অমির ওপর তোমার খুব হিংসে তাই না টলুদি?

কথাটা বলে হেমাঙ্গ নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনল। টলু তার জামা খামচে মড় মড় করে টেনে ছিঁড়ে ফেলে এবং হিংস্রভাবে তাকে আঁচড়াতে কামড়াতে থাকে। হেমাঙ্গ বুঝতে পারে জটাবাবার সাহায্যে সৈকা অমিকে ছেড়ে চোখের পলকে এখানে চলে এসেছে এবং টলুকে ধরে ফেলেছে।

হেমাঙ্গ প্রেতিনীকে সামলানোর চেষ্টা করে। তার পালানোর আর কোন উপায়ই নেই।

মোহনপুরের মাটি হাউসিং কলোনী এলাকায় গাঙ্গেয় পলিতে তৈরি। যত বৃষ্টি হোক, জল শুষে নেয়। কাদা হয় না বিশেষ। উত্তরে লিচুতলার ওদিকটা আবার অন্য রকম। এঁটেল আর দোঁয়াশ মাটি ওদিকে ঢেউ খেলানো। একছিটে বৃষ্টিতেই প্যাচপেচে কাদা। ব্লক কোয়ার্টারে প্রমথ চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন তখনো।

শঙ্করীপ্রসাদ তাঁর আমলের হেড-ক্লার্ক। রথ দেখা কলা বেচা দুই হচ্ছে। অর্থাৎ কমিউনিটি সেন্টারের টেণ্ডারের খবরাখবর নিতেই গেছেন। মিলু পাশের কোয়ার্টারে ওর বন্ধু মহুয়ার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। ওদিকটায় আলো যায় নি। কিন্তু বাকী মোহনপুর অন্ধকার। স্টেশনে অবশ্য আলো আছে। রেলের নিজস্ব ব্যবস্থা আছে বরাবর। তখন বৃষ্টি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। টিপ টিপ পড়ছে। আকাশ কিন্তু মেঘে ঢাকা। বাতাস অল্পস্বল্প আছে। গা শিরশির করা ঠাণ্ডা খেলছে আবহাওয়ায়। পোকামাকড় গলা খুলে গান জুড়েছে। ক্যানেলে ভীষণ চ্যাঁচামেচি করে ব্যাঙ-ব্যাঙনীরা ডাকা-ডাকি করছে। এখনও জোনাকদের মরশুম আসে নি। দু'চারটে বেরিয়ে পড়েছে বৃষ্টির স্বাদ ও ভিজে মাটির গন্ধে আবিষ্ট হয়ে। মাটির ওপর ঘোরাঘুরি করে উড়ে গিয়ে ঝোপের ডগা আর গাছের গা ঘেঁষে ঘুরছে। এই সব সন্ধ্যার একটা আলাদা স্বাদ। এত দিন চুপ করে থাকার পর দীর্ঘ নিঃঝুমতা ভেঙে অদৃশ্য আত্মাদের মতো পোকা-মাকড়েরা জেগে ওঠে। দলে দলে বেরিয়ে পড়ে। পথে ছেঁড়া পাতা আর ভাঙা ডালপালা পড়ে আছে। অন্ধকারে হেমাঙ্গ ক্লান্তভাবে হাঁটে এবং বারবার সেগুলো পায়ে জড়িয়ে যায়। খোয়াঢাকা এবড়োখেবড়ো রাস্তায় টোক্কর লাগে। স্লিপারের ফিতে ছিঁড়ে যায়। টিপটিপ করে বৃষ্টি ঝরে। শীত বেড়ে যায় এদিকটায় পৌঁছে। অন্ধকারে সাপের ভয় তাকে চমকে দেয় বার-বার। পায়ে নরম ঠাণ্ডা কিছু ঠেকলেই সে লাফিয়ে ওঠে। পা ছোড়ে। শরীরে এতটুকু জোর নেই। ছিবড়ে হয়ে গেছে। ক্লান্তির স্বাভাবিক আনন্দটুকুও নেই। গা ঘিনঘিন করে। জামা বুকের কাছে ছেঁড়া। কীভাবে মুনাপিসির সামনে দাঁড়াবে সেই অস্বস্তি।

এদিকে ঘরবাড়ি দূরে-দূরে ছড়ানো। তাদের বাড়িটাই শেষ বাড়ি। বাঁদিকে একটু দূরে খালের ওপারে রেল ইয়ার্ডের আলো দেখা যায় এতক্ষণে।

বাড়ির সামনাসামনি এসে এমনি একবার রেল ইয়ার্ডের দিকে

তাকায়। এখানে ওখানে ওয়াগন দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাল সবুজ বাতি জ্বলছে। সিগন্যাল পোস্টের কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়। হয়তো মুসহর বস্তির কেউ। ওদের ল্যাট্রিনের বালাই নেই। রেল লাইনের ধার বরাবর নোংরা করে রেখেছে।

তারপর হেমাঙ্গ বুঝতে পারে, যে দাঁড়িয়ে আছে, সে স্ত্রীলোক।

তারপরই তার গা শিউরে ওঠে। সৈকা ওখানেই মারা পড়েছিল। ভূতের ভয় তাকে পেয়ে বসে। লোকেরা বলে, সৈকা নাকি ওখানে মাঝে মাঝে রাতবিরতে দাঁড়িয়ে থাকে। রেলের সিকিউরিটির লোকেরাও বলাবলি করে একথা। হেমাঙ্গ ভূত যুক্তি দিয়ে মানে না, কিন্তু ভূতের ভয় অন্য ব্যাপার।

ভয়ের চোখে সেদিকে ফের তাকিয়েই সে বারান্দায় উঠে পড়ে। এসময় ভয়টা তাকে এমন বাগে পেয়েছে যে মনে হয় পিঠের কাছে সৈকা এসে গেছে। তার গলা কেঁপে যায় ডাকাডাকি করতে। ভেতরে মুনাপিসির সাড়া পেয়ে তার সাহস হয়।

সে বুদ্ধিমানের মতো জামাটা খুলে ফেলে। হেরিকেন নিয়ে দরজা খোলে মুনাপিসি। কোথায় ছিলি রে? প্রলয় ঘটে গেল এতক্ষণ। আমি খালি ঠকঠক করে কাঁপছি—আর ভাবছি!

হেমাঙ্গ ভেতরে ঢুকে ঝটপট আলনা থেকে লুঙ্গি নিয়ে প্যাণ্ট ছাড়তে থাকে। বলে, আটকে গেলুম জ্ঞানবাবুর বাড়িতে। জ্ঞানবাবু তো সকালের ট্রেনে চলে গেছেন। দেখা হল না।

হল তো? তোকে এত করে বললুম, গতকালই যাবার কথা ছিল!

আকবর বলল, আবার শীগগির আসছেন।

বিস্টিটা আরেকটু ছাড়লে না হয় আসতিস বাবা! ভিজে এতটা পথ এলি। বললুম, সাইকেলে যা। তাও গেলিনে! এবার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জ্বারি হোক।

হেমাঙ্গ টিউবওয়েলের কাছে যাচ্ছিল। মুনাপিসি বলল, এখনও টিপটিপ করে ঝরছে। ভিজিস নে আর। জল নে!

কোনরকমে হাত পা আর মুখ গলা কাঁধ রগড়ে ধুল হেমাঙ্গ। স্নান না করলে এই ঘৃণার হাত থেকে রেহাই নেই।

চা খাবি নাকি? বরং দুধ খা গরম-গরম।

থাক।

থাকবে না। মুনাপিসি ধমক দেয়। গরম দুধ খা। উনুনে বসিয়ে রেখেছি।

হেমাঙ্গ তার ঘরে আসে। টেবিল থেকে দেশলাই নিয়ে ড্রয়ার খোলে। মোমবাতি বের করে জ্বালে। দেশলাইটা গুঁড়ো হয়ে গেছে। সিগারেটের প্যাকেটও গেছে চেপ্টে! মোম টেবিলে বসিয়ে রেখে তার ইচ্ছে করে, সিগন্যালের কাছে মেয়েটা এখনও আছে নাকি দেখবে। না থাকলে ভূত বলে মেনে নেওয়া মন্দ হবে না। এমন রাতে ঘরে বসে ভূতের কথা ভাবতে ভালই লাগবে।

সে বাইরের দরজা খুলে বারান্দায় যায়। তারপর সিগন্যালের দিকটায় তাকায়। আরে! এখনও ওখানে তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে! নাকি ওটা আদতে মানুষই নয়, কোন কাঠের পোস্ট? চোখের ভুল হচ্ছে না তো?

ভুল নিশ্চয় হচ্ছে না। আলো আছে ওখানে। সামান্য তফাতে অনেক উঁচুতে তীব্র মারকারি বালব জ্বলছে—থালার মতো চওড়া সসার ল্যাম্প।

মুনাপিসি ডাকল ঘরে ঢুকে। কই রে? বাইরে কী করছিস?

পিসিমা, দেখে যাও তো!

মুনাপিসি বেরিয়ে আসে সঙ্গে সঙ্গে। কী রে?

দেখ তো, ওটা কোনো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে না?

মুনাপিসি দেখে নিয়েই ওর হাত ধরে টানে। চাপা গলায় বলে, চলে আয়। কোথায় কে দাঁড়িয়ে আছে, তাই নিয়ে মাথা ব্যথা কিসের তোর?

হেমাঙ্গ গোঁ ধরে দাঁড়ায়। বলে, কেউ সুইসাইড করার জন্যে ওভাবে দাঁড়িয়ে নেই তো?

মুনাপিসি রাগ দেখিয়ে বলে, তোর খালি অলক্ষুণে ভাবনা। মুসহর বস্তির কেউ জল সরতে বেরিয়েছে।

হেমাঙ্গ বলে, ভ্যাট! কতক্ষণ ধরে একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

এবার মুনাপিসি চাপাগলায় বলে, হেমা! অমি নয়তো রে?

সেই তো সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু অমি তো···হেমাঙ্গ চেপে যায়। অমিকে নিয়ে তার জেঠিমা ঝড় জলের আগে জটাবাবার থানে গেছে। হেমাঙ্গ যতক্ষণ বোসবাড়িতে ছিল, ওরা ফিরে আসে নি। তারপর এইটুকু সময়ের মধ্যে অমি কীভাবে ওখানে আসতে পারে? সে বলে, পিসিমা! আমি দেখে আসি।

মুনাপিসি আপত্তি করার সুযোগ পায় না। হেমাঙ্গ জানে তার টর্চের ব্যাটারি সেই কবে ক্যানেলের মাঠ থেকে ফেরার পর বোস-বাড়ির গেটের কাছে শেষ স্ফুলিঙ্গ দিয়ে গেছে। আর নতুন ব্যাটারি আজ কাল করে ভরা হয় নি। সে বারান্দা থেকে লাফিয়ে হনহন করে ছোট পোলের দিকে এগিয়ে যায়। এই পোলটা কাঠের। বাঁদিকে ঘুরে গিয়ে পৌঁছয় সে। ওখানেই একদিন মুখ ধুতে গিয়ে হুলোর কাছে অমিকে ভূতে ধরার খবর শুনেছিল।

হেমাঙ্গ মুসহর বস্তির কুকুরগুলোকে সচকিত করে চলতে থাকে। ওরা তাকে কিছুদূর অনুসরণ করে। তবু চ্যাঁচাতে ছাড়ে না। সিগন্যাল পোস্টের কাছাকাছি গিয়ে একবার দাঁড়ায় হেমাঙ্গ। ভাল করে দেখে নিতে চায় অমি না অন্য কেউ। মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে। কোমরঅব্দি ছড়ানো চুল।

চুল দেখেই হেমাঙ্গ লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে যায়। যত কাছা-কাছি হয়, তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে অমি। কোমর ও পাছায় শায়া বেরিয়ে রয়েছে এবং শাড়ি প্রায় খুলে পায়ের কাছে পড়েছে। আঁচলের দিকটা কোনমতে কাঁধে ঝুলছে। অমি বলে চেঁচিয়ে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ও একটু ঘোরে। হেমাঙ্গের বুক কেঁপে ওঠে। অমির মুখটা মরা-মানুষের মুখের মতো রক্তশূন্য, চোখের দৃষ্টি ভাসা-

ভাসা—অথচ আলোর ছটায় কেমন যেন নীলচে, বন্য, নিষ্ঠুর। কিন্তু ঠোঁটের কোণায় পাগলাটে হাসি।

হেমাঙ্গ ওর কাছে যাওয়ামাত্র সে দৌড়ুতে শুরু করে। লাইনের নীচে সরু পায়ে চলা পথ। তার ডাইনে আগাছাগজানো কাঁটা-তারের বেড়া। ওই পথে দৌড়ে যেতে যেতে অমি আচমকা বেড়ার দিকে ঘোরে। ঠেলে বেরুতে গিয়ে আটকে যায়। হেমাঙ্গ লাফ দিয়ে তাকে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে, অমি! অমি! আম!

অমি মুসহরবুলিতে গেঙিয়ে কী সব বলে এবং হেমাঙ্গকে আঁচড়াতে কামড়াতে শুরু করে। এবার হেমাঙ্গ তার গালে চড় মারে। অমি নেতিয়ে পড়ে।

হেমাঙ্গ হাঁটু গেড়ে বসে তাকে তুলে ধরে ডাকে, অমি, অমি! আর কোন সাড়া পায় না। ওকে শুইয়ে রেখে ওর শাড়িটা কাঁটা থেকে ব্যস্তভাবে ছাড়িয়ে নেয় হেমাঙ্গ। শাড়িটা ভিজে ছপছপ করছে। অমির ব্লাউস আর সায়াও ভিজে। গা ঠাণ্ডা। চুলও ভীষণ ভিজে। হেমাঙ্গ বুঝতে পারে, হয়তো পুরো ঝড় জলটা অমির ওপর দিয়ে গেছে।

শাড়িটা কোনমতে জড়িয়ে সে একহাত ওর পিঠের এবং অন্যহাত উরুর তলায় রেখে বয়ে নিয়ে চলে মুসহরবস্তির দিকে।

ঘোড়া নিমের গাছটার তলায় আসতেই ওৎপেতে থাকা কুকুর-গুলো আবার চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। মুসহরদের কয়েকটা লোককে হেমাঙ্গ চেনে। সে ডাকতে থাকে, লালু! লালু!

তার ডাকাডাকিতে একজন দুজন করে বেরিয়ে আসে। ভিড় জমে যায় দেখতে-দেখতে। হেমাঙ্গ বলে, তোমরা কেউ শীগগির বোসবাড়িতে খবর দিয়ে এসো।

সকালে হেমাঙ্গ সিগন্যাল পোস্টের ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবার গোয়েন্দার মতো খুঁজতে গেছে, কেন অমি ওখানে আসে। কেনই বা অমন করে দাঁড়িয়ে থাকে? এই একবার নয় এবং

অসচেতন কোনো নেশার ঘোরে নয়, সজ্ঞানেই সে এসেছে কতবার। বুধনী বহরী বলেছিল। ডন বলেছিল। সেই প্রথম ভূতে পাওয়ার দিনও সন্ধ্যায় এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল অমি।

বুধনী বহরীর বৃত্তান্তে এবং শংকরার সত্য মিথ্যায় মেশানো গল্পে সে একটা অস্পষ্ট সূত্র আঁচ করেছিল। অমির সঙ্গে জগদীশের গোপন সম্পর্ক আর ডনের হাতে জগদীশ খুন হওয়ার মধ্যে সেই সূত্রটা রয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল হেমাঙ্গের। অমি কি নিজের চোখে জগদীশকে খুন হতে দেখেছিল? মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল সম্ভবত।

কিন্তু হেমাঙ্গ জানে বা সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে, অমির মনটা খুব শক্ত। ছেলেবেলায় বাবা-মা মারা গেলে এবং অন্যের দয়ায় মানুষ হলে মানুষের জীবনে এক ধরনের সাহস আর শক্তি জেগে ওঠা হয় তো সম্ভব। অবশ্য হেমাঙ্গের বেলায় তো তেমন কিছু ঘটে নি।

তার ঘটে নি, এজন্যে মুনাপিসি বা মোক্তার-পিসের মতো মানুষ দায়ী। এই নিঃসন্তান দম্পতির কাছে হেমাঙ্গ ছিল আত্মজের প্রতীক। ডন ও অমির বেলায় উল্টো ঘটেছিল। ডন বয়স পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে এবং অমির স্বাধীনতাবোধ অমিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। শুধু অবাক লাগে, ডনের মতো নীতিবাগীশ ছেলে দিদিকে সামলাতেই পারে নি।

নাকি সামলানোর চেষ্টাটা বাড়াবাড়ি রকমেরই হয়ে যায় জগদীশকে খুন করার ঘটনায়? জগদীশ তো একসময় ডনেরই গুরু ছিল। বস্তুত জগদীশই ডনকে নিষিদ্ধ সবরকম ব্যাপারে এবং আইন ভাঙতে শিখিয়েছিল। আইন-ভাঙার একটা সুখ আছে। রাষ্ট্র ও সমাজবিরোধিতার আনন্দ মানুষের রক্তে থাকা স্বাভাবিক। কোথাও সেটা ব্যক্তিগত, কোথাও গোষ্ঠীগত। কেউ হয়ে ওঠে তথাকথিত এ্যান্টিসোস্যাল, কেউ হয় বিপ্লবী।

হেমাঙ্গ আনমনে রেলইয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাল

সন্ধ্যার বৃষ্টিতে লাইনের ফাঁকে ঘাসগুলো রাতারাতি সবুজ হয়ে উঠেছে। কিছুটা দূরে সান্টিং করে বেড়াচ্ছে একটা ইঞ্জিন। লাইন ডিঙিয়ে মুসহরবস্তির কয়লাকুড়ুনীরা ছুটেছে ওপরের বিশাল ছাই-গাদার দিকে। ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে একটা নেড়ী কুকুর। ঠ্যাং তুলে লাইনে পেচ্ছাপ করে কুকুরটা ধুকুর ধুকুর চলতে থাকে। এসব কুকুর নিজেদের বাঁচিয়ে রেখে অন্য প্রাণীর থ্যাঁতলানো লাস তারিয়ে তারিয়ে খেতে জানে। হেমাঙ্গ উদ্বিগ্নভাবে লক্ষ্য করে একটা ছাগল আপন মনে ঘাস খাচ্ছে। লাইনের ওপর পেট রেখে দুপা সামনে ঝুলিয়ে কুটকুট করে চিবুচ্ছে। গাড়ি এলে পিঠের ওপর দিয়ে চাকা চলে যাবে। সৈকা তার ছাগলকে বাঁচাতে গিয়েই নাকি মারা পড়েছিল।

সৈকার কথায় সৈকার ভূতের কথা এসে যায়। হেমাঙ্গ টের পায় অমির সব রহস্যের সূত্র যেন এখানেই লুকোনো আছে। অমির অবচেতনায় সৈকা ঢুকে পড়েছে। কেন? কাল রাতে যখন ওকে পল্টে আর হেমাঙ্গ ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে কাঠের সাঁকো পার করে রিকশোয় তুলল, অমি ক্ষীণ স্বরে মুসহর বুলিতে গুনগুন সুরে কী বলছিল বা গাইছিল। মুসহররা হতবাক হয়ে শুনেছে। ওদের মুখে-চোখে আতঙ্ক ঠিকরে পড়ছিল। অনেকটা রাত অব্দি বুধনী বহরীর চেরা গলায় কান্না শোনা গেছে।

লালুর মেয়ে মাল্‌তী তো অমির মুখের ওপর ঝুঁকে নিজেদের বুলিতে সৈকার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছিল। মরদেরা ওকে ধমক না দিলে রিকশোর পেছন পেছন বোসবাড়ি গিয়ে হাজির হত মাল্‌তী।

কালকের ঝড়ে মুসহরদের অনেক ঝোপড়ি ভেঙেচুরে গেছে। এখন সেগুলো মেরামত করছে ওরা। তারই মধ্যে ঢোলের শব্দ ভেসে আসছে। কয়লার পাঁজায় কে আগুন দিয়েছে। সকালের ঝকঝকে রোদে নীল ধোঁয়া সোজা উঠে গেছে অলীক স্তম্ভের মতো। বাতাস বন্ধ এখন থেকেই। হয় তো আজ বিকেলেও কালবোশেখী আবার আসবে।

দাদাবাবু! ওঁগো দাদাবাবু!

হেমাঙ্গ ঘোরে। তার পিছনে খালের ওপারে দাঁড়িয়ে পল্টে ডাকছে। হেমাঙ্গর বুক ধক্‌ করে ওঠে। অমির কিছু ঘটল না তো? সে সাড়া দিয়ে বলে, কী রে পল্টে?

আপনাকে গিন্নিমা ডেকেছে। একবার আসুন।

হেমাঙ্গ আড়ষ্ট বোধ করে। বোসবাড়ি যাওয়ার কথা ভাবলেই টলুকে সে সামনে দেখতে পায়। পুরুষালি গড়নের একটি মেয়ে—তার সারা শরীরে অতৃপ্ত কামনা নিয়ে বেঁচে আছে, এতদিন এতটুকু আঁচ করতে পারে নি। এত বেশি আলোয় তার মুখোমুখি হতে কেমন বিশ্রি লাগবে। ওর কথা ভাবতেই তার গা ঘিনঘিন করছে।

হেমাঙ্গ বলে, অমি কেমন আছে রে?

ভাল। রাতেই জ্ঞান ফিরেছিল। এখন শুয়ে আছে। আপনি আসুন দাদাবাবু।

কেন ডেকেছেন জেঠিমা, জানিস?

পল্টে মাথা নাড়ে।

যাচ্ছি বলে হেমাঙ্গ মুসহরবস্তি ঘুরে গিয়ে কাঠের সাঁকো পার হয়। মিনির মা আর বাবা বাড়ির গেটে ঝড়ে বিধ্বস্ত বুগানভিলিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত। মিনির বাবা তপনবাবুর স্টেশনারি দোকান আছে বাজারে। খুব শৌখিন লোক। এভাবে তাঁকে কাদা আর জঞ্জাল মেখে বুগানভিলিয়া নিয়ে ব্যস্ত দেখে অবাক লাগে। সৌন্দর্যের খাতিরেই তো এই খাটুনি আর নোংরাঘাঁটা।

দোকানে যান নি তপনদা?

এক্ষুণি যাব। দেখ না, ঝড়ে কী লণ্ডভণ্ড করেছে সব।

মিনির মা ঝাড়ের একটা দিক ধরে আছে। গলা চেপে বলে, হেমাং, কাল রাতে অমির কী হয়েছিল?

তপনবাবু বলেন, হবে আবার কী! অবসেসনের অসুখ। ঘুমের ঘোরে বেরিয়ে যায় না অনেকে? আমাদের ভোলাকে তুমি দেখ নি! কাটোয়ার বাড়িতে থাকত। প্রতি রাতে ও বিছানা থেকে

উঠে গিয়ে যেখানে সেখানে ঘুমোত। কখনও কারুর বারান্দায়, কখনও ড্রেনের ধারেই। সাইকলজিকাল ব্যাপার!

মিনি বুঝি পড়তে বসেছে?

মিনির মা বলে, তোমার ওপর খুব চটেছে হেমাং। বলে, কাকু আর আসে না। মুনা বুড়ি আর নিয়ে যায় না। ওদের সঙ্গে আড়ি।

হেমাঙ্গ হাসে। তাই বুঝি? যা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি। ওকে বলবেন, শীগগির আসব।

হেমাঙ্গ পা বাড়ালে তপনবাবু বলেন, কিসের এত ছুটোছুটি হে?

শোনেন নি? ডাবুর সঙ্গে কণ্ট্রাক্টরি করার তালে আছি। জামসেদপুরের ডাবু—ওই যে বোসবাড়ির!

বলেই হেমাঙ্গ চলে যায়। পল্টে দাঁড়িয়ে আছে।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। পল্টে বলে, কাল সেই বিকেলে বেরিয়েছিলুম গিন্নিমার সঙ্গে, এখন প্রায় আটটা বাজে—ছুটি পাই নি। ঘুমোতে পাই নি। আমার যা অবস্থা!

কাল কীভাবে অমি পালিয়ে এল রে? ডিটেলস বল্ তো। রাতে ভাল করে শোনা হয় নি।

পল্টে জড়িয়ে-মড়িয়ে অনর্গল কথা বলে যা শোনাল তা ভারি অদ্ভুত। পীরের থানে কাসেম ফকিরের ঘরে ওরা বসে আছে। ফকির চামরটা অমির গায়ে বুলোচ্ছে আর বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে। অমিকে পেছন থেকে ধরে থাকতে বলেছিল ফকির। সুলোচনা তাই ধরে আছেন। অমি বিরক্ত, তা বুঝতে পারছিল পল্টে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ঝড় শুরু হয়ে গেল। যত ঝড়, তত শিলাবৃষ্টি। চিক্কুর মেরে বাজ পড়ছে আর মেঘ ডাকছে মুহুর্মুহু। কাসেম ফকির চোখ খুলে বলল, বুঝতে পারছেন মা? গতিক ভাল না। এ বেটি কালা দেওয়ের (কালো দৈত্য) পাল্লায় পড়েছে। লড়ে তো যাই। একখানা শাল বখশিস দেবেন, শীতের সময় কষ্টে থাকি। ব্যস, আর কিচ্ছু চাইনে।

সুলোচনা বললেন, কেন দেব না? তুমি আমার মেয়েকে সারিয়ে দাও বাবা।

ফকির বলল, একদিনে হবে না মা। সাত দিন আনতে হবে।

তাই আনব।

ফকির চোখ বুজে আবার চামর এদিক-ওদিক দোলায় আর অমির গায়ে বোলায়। অমি চুপচাপ।

তারপর যেই না কাছাকাছি প্রচণ্ড আওয়াজে বাজ পড়েছে, চোখ ঝলসে গেছে সবার, অমনি আচমকা অমি একধাক্কায় সুলোচনাকে সরিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে। ফকির চেঁচাচ্ছিল, ধরো! ওকে ধরো!

পল্টে ছিল দোরগোড়ায়। সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তাকে লাথি মেরে অমি নীচে গিয়ে পড়ে। তারপর দৌড়ে পালিয়ে যায়। ঝোপজঙ্গলে ভরা জায়গায়। ততক্ষণে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। শিলা পড়া বন্ধ হয়েছে, কিন্তু ঝড় আর বৃষ্টি তুমুল চলছে। বাজ পড়ছে বারবার।

সুলোচনা হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠেন। পল্টেকে বলেন, ধর, ধরে আন ওকে।

পল্টের প্রাণের ভয় আছে। কিন্তু সে প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে ঝড় জলের মধ্যে নামে। খুব চেঁচামেচি করে ডাকতে থাকে। থানের জায়গাটা পুকুরের পাড়ে অনেক উঁচুতে। অজস্র মাদারগাছ আর মস্তো কাঠমল্লিকা আছে। এখন তাদের ফুলের সময়। মউ-মউ করে গন্ধে। কিন্তু তখন তো প্রলয় চলেছে। মড়মড় করে ডাল ভেঙে পড়ছে। একবার যেন দূরে নীচের দিকে রাস্তার এক ঝলক বিদ্যুতের ছটায় অমিকে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু নেমে গিয়ে সেখানে তার পাত্তা পেল না পল্টে। তখন ফিরে আসছে, দেখে সুলোচনা টলতে টলতে থান থেকে নেমে আসছেন। আছাড় খেয়ে গড়িয়েও পড়লেন একবার। কাপড় কাদায় মাখামাখি। কোমরে লেগেছে সুলোচনার।

সবচেয়ে বিপদ হল, রিকশোটা নীচের রাস্তায় অপেক্ষা করার কথা—সেটা নেই। ওখানে থাকা তখন সম্ভবও নয়। লোকোশেডের ওখানে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে পল্টে আর সুলোচনা রিকশোওলাকে পেলেন, তাই বাঁচোয়া। ওখানে কয়েকটা দোকান আছে। ছোট্ট দোকান সব। পান-সিগারেট চা এবং সন্দেশের দোকান। একটা দোকানে কোনরকমে মাথা বাঁচাবার জায়গা জুটল। তখন রিকশো নিয়ে বেরুনো অসম্ভব।

ঝড় বৃষ্টি কমলে বাড়ি ফিরতে পেরেছিল ওরা। তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। প্রমথবাবুরা তখনও ফেরেন নি। ফিরতে পারেন নি আসলে। টলু আর ঘণ্টার মা ছিল বাড়িতে। প্রতিবেশী-দের সঙ্গে বিশেষ ভাব নেই বোসবাড়ির। পল্টে ছাতি আর টর্চ নিয়ে বেরুল। ডনের বন্ধুদের সাহায্য নিতেই।

কিন্তু এখন আর কে কার বন্ধু! পল্টে বলে, কারুর পাত্তা পেলুম না গো দাদাবাবু! সব ব্যাটা গাঢাকা দিয়েছে, নাকি ইচ্ছে করেই বেরুল না। বাড়ির লোকেরা বলল, নেই। তারপর তো ফিরে আসছি। বাড়ির সমেনে এসে দেখি লালু মুসহররা হেরিকেন হাতে ব্যস্তভাবে ডাকাডাকি করছে।

হেমাঙ্গকে পেছনে ফেলে পল্টে দৌড়ে বাড়ি ঢোকে।

হেমাঙ্গকে আড়ষ্টভাবে হাঁটে। রোয়াকের সামনে ইলু মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছে। হেমাঙ্গ বলে, কী ইলু! কাল তোরা খুব নাকানিচোবানি খেয়েছিস শুনলুম!

ইলু গম্ভীর মুখে বলে, হেমাদা কাল রাতে এলে না যে?

আসি নি। হেমাঙ্গ বারান্দায় ওঠে। ফের বলে, তোর বাবা নেই?

বাবা এক্ষুণি বেরুল। বাজারে গেল।

হেমাঙ্গ বসার ঘরের ভেতর দিয়ে ঢোকে। ভেতরের বারান্দায় গিয়ে টলুর ঘরের দিকে তাকাতে পারে না। আবছা চোখের কোণা দিয়ে টলুকে আঁচ করে। যেন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

পল্টে বলে, আসুন দাদাবাবু! এ ঘরে।

বাঁদিকে কিচেনের পাশে ঘরে ঢুকে হেমাঙ্গ দেখে, সুলোচনা একগাদা বালিশ হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। ইশারায় তাকে পাশেই বসতে বলেন। হেমাঙ্গ বসে। সুলোচনার কোমরের কাপড় ঢিলে হয়ে আছে। সম্ভবত একটু আগে তেল মালিশ করা হয়েছে।

হেমাঙ্গ বলে, অমি কেমন আছে জেঠিমা?

সুলোচনা বলে, ভাল। জটাবাবার থানে গিয়ে মনে হচ্ছে কাজ হয়েছে। প্রথমে অতটা বুঝতে পারি নি, পরে সব বুঝলুম। কাল ঝড়জলের মধ্যে অমি যে দৌড়ে পালাল, ওটা কী জানো? ওটাই দস্তুর।

কিসের?

অশরীরী আত্মা যখন রোগীকে ছেড়ে দিতে চায়, তখন ঠিক যেখানটিতে প্রথমে তাকে ধরেছিল, সেখানটিতে নিয়ে যায়। এমন ঘটলেই বুঝতে হবে, ছেড়ে গেল। সুলোচনা চাপা উত্তেজনায় বলেন আবার এ তো অল্পের মধ্যে গেল। রুগীকে তখন দাঁতে জলভরা কলসী কামড়ে নিয়ে যেতে বললে তাও যায়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। মোহনপুরে দেখেছি, এমন কি একটা মেয়ে কুয়ো ডিঙিয়ে গিয়েছিল ভাবতে পারো? স্বাভাবিক অবস্থায় সে এক হাত লাফাতে পারে না। আমার ধারণা, অমি সেরে গেছে।

হেমাঙ্গ বলে, আপনি কাল পড়ে গেছেন শুনলুম।

হ্যাঁ বাবা। একে তো কোমরে বরাবর বাতের ব্যথা। জোর আছাড় খেয়েছি। রাতে অবিনাশ এসে ট্যাবলেট দিয়ে গেল। তাই বাঁচোয়া! একটু পরে হসপিটালে যেতে হবে। এক্সরে করাতে বলল। বলে সুলোচনা একটু ঝুঁকে এলেন তার দিকে।

তারপর দরজায় পল্টেকে দেখে বলেন, তুই হাঁ করে কী শুনছিস? হেমার জন্যে চা-টা করতে বল্‌গে টল্‌কে। পল্টে অমনি সরে গেল।

সুলোচনা ফিসফিস করে বলেন, ডনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল।

হেমাঙ্গ চমকে ওঠে। তাহলে টলু সব বলেছে। কতটুকু বলেছে? সে মাথা দোলায়।

কোথায় দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে?

আমাদের বাড়িতে। রাতে এসেছিল চুপি-চুপি। হেমাঙ্গ সহজেই মিথ্যা কথা বলে।

কেমন আছে? হাঁটাচলা করতে পারছে? ঘা সেরে গেছে?

হুঁ্যা।

তুমি বললে না বাড়ি যাও, তোমার জ্যাঠা-জেঠী কেঁদেকেটে সারা হচ্ছেন?

বললুম। ডন বলল, সুযোগ পেলে যাব'খন। হেমাঙ্গ ঠাণ্ডা স্বরে বলে যায়।

তোমাকে পিস্তল রাখতে দিল?

হুঁ্যা।

সুলোচনা একটু চুপ করে থেকে বলেন, কাল ওই বিপদ। তারপর অনেক রাতে শুয়েছি, টলু আমাকে বলল, হেমা এসেছিল। ডন তাকে একটা পিস্তল রাখতে দিয়ে গেছে। হেমা সাহস পাচ্ছে না। তাই অমিকে দিতে এসেছিল। শুনে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলুম। তোমার জ্যাঠামশাইকে ডেকে সব বললুম। উনি পিস্তলটা টলুর কাছ থেকে নিয়ে তক্ষুণি পুকুরে না কোথায় ফেলে দিয়ে এলেন।

হেমাঙ্গ তাকাল। কিন্তু কথা বলল না।

সুলোচনা বলেন, অমিকে বলেছিলে এ ব্যাপারটা?

হেমাঙ্গ মুখ নীচু করে জবাব দেয়, অমি জানে।

দেখছ হতচ্ছাড়ী মেয়ের কাণ্ড? একটুও বলে নি!...সুলোচনা একটু সরে ভঙ্গী বদলে বসেন। ফের বলেন, টলুর একশোটা কথার নিরানব্বুইটা আমি বাদ দিয়ে শুনি তাই তোমাকে ডেকেছিলুম হেমা।

হেমাঙ্গ বলে, বুঝতে পেরেছি।

সুলোচনা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, যাও না! অমিকে দেখে এস। ওপরে ডনের ঘরে আছে। ওর মনটা ভাল হবে। কালকের কথা তুলো-টুলো না যেন। যাও দেখে এস।

হেমাঙ্গ অগত্যা বেরিয়ে যায়। সুলোচনা টলুকে ডাকছেন। সিঁড়ির মুখে হেমাঙ্গ, তখন টলু আসছে। চোখে চোখ পড়লে টলু হাসে। চোখে ঝিলিক। হেমাঙ্গ তিনটে ধাপ উঠেছে, টলু ডাকে—এই হেমা!

হেমাঙ্গ ঘুরলে সে ইশারায় ওপর ঘর দেখিয়ে হাত মুঠো করে কিল দেখায়। তারপর হাসতে হাসতে চলে যায়। তার মানে অমির সঙ্গে প্রেম করলে টলু তাকে পিটুনি দেবে। হেমাঙ্গের হাসি পায় এতক্ষণে।

ডনের ঘরটা খুব সাজানো। খাটে ফোমের গদি আছে। সুন্দর হাল্কা একেলে ধাঁচের নানান আসবাব আর কুটিরশিল্প। ওর রুচির প্রশংসা করতে হয়। এই ঘরে ঢুকলে ডনকে দুর্বোধ্য লাগে। দেয়ালে একটা মোটে ক্যালেণ্ডার। ফুলের ছবি। ডন হাতের রক্ত ধুয়ে এঘরে ঢুকে ঘুমোত। মাথার কাছে মাকালির বাঁধানো ছবি। এ কি নেহাত অভ্যাস, না তার ভক্তিভাবের প্রতীক? অমি দক্ষিণের জানলার কাছে খাটের মাথায় পা ঝুলিয়ে বসে একটা পত্রিকা পড়ছিল। ঘুরে হেমাঙ্গকে দেখে স্থির চোখে তাকায়। হেমাঙ্গ বলে, কেমন আছ?

অমির গায়ের রঙ ফ্যাকাসে। চোখের তলায় অনেকটা জায়গায় কালো ছোপ পড়েছে। কোটরগত চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। নাসারন্ধ্র স্ফীত। সে হিসহিস করে ওঠে, ন্যাকামি করতে এসেছ কেন?

হেমাঙ্গ ভড়কে যায়। হাসবার চেষ্টা করে বলে, কাল রাতের এই বখশিস দিচ্ছ বুঝি?

তুমি বড়দিকে রিভলবার দিলে কেন? অমি ঘুরে বসে। ফের চার্জ করে, কেন দিলে ওকে?

হেমাঙ্গ চটে যায়। তোমাকেই ফেরত দিতে এসেছিলুম। পাইনি বলে ওকে দিয়ে গেছি।

ওসব বুঝিনে। আমার জিনিস আমি ফেরত চাই।

তোমার জ্যাঠামশাই নাকি কোন পুকুরে ফেলে দিয়ে এসেছেন কাল রাতে।

কী? বলেই অমি পত্রিকাটা ছুড়ে মারে ওর দিকে। হেমাঙ্গের বুকে এসে লাগে।

হেমাঙ্গ ওকে বোঝাবার চেষ্টায় এগিয়ে গিয়ে পাশে বসে। বলে ব্যাপারটা আমাকে এক্সপ্লেন করতে দাও। খামোকা এক্সাইটেড হচ্ছ কেন? তোমার শরীরের এই অবস্থা!

অমি মুখ নীচু করে জোরে মাথা দুলিয়ে বলে, নো এক্সপ্লেনেশান! আমার জিনিস আমাকে ফেরত দাও। সোজা কথা। যেভাবে পারো, এনে দাও!

আহা, শোন ব্যাপারটা।

না, না। আমি শুনব না। তুমি আমার জিনিস আমাকে এনে দাও! ব্যস!

তুমি ইনসিস্ট করলে চেষ্টা করব। কিন্তু···

কিন্তু-টিন্তু আমি বুঝিনে। তুমি রাখতে না পারলে আমার জিনিস আমাকে দিতে পারতে!

তুমি তো ছিলে না!

ছিলুম না বলে তুমি যাকে-তাকে দেবে?

যাকে-তাকে তো দিই নি। টলুদিকে দিয়ে গেছি।

কোনো কথা শুনব না। আমি ওটা ফেরত চাই।

ঠিক আছে। চেষ্টা করছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর আমার সম্পর্ক থাকবে না অমি!

ওসব বুঝিনে। তুমি আমার জিনিস আমাকে ফেরত দাও। নৈলে···

হেমাঙ্গ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, নৈলে কী করবে?

অমি আর কোনো কথা বলে না। জানলার দিকে মুখ ঘোরায়।

নৈলে জগার অবস্থা করাবে ভাইকে দিয়ে—এই তো? ঠিক আছে। তাহলে আর ওটা খুঁজে বের করার চেষ্টা আমি করছি না জেনে রাখো। যা খুশি করতে পারো তুমি।…বলে হেমাঙ্গ বেরিয়ে যায়।

নীচে গিয়ে ইচ্ছে হল, টলুকে চার্জ করে—কেন সে অমিকে রিভলবারের কথা বলেছে। কিন্তু সুযোগ পেল না। টলু মায়ের ঘরে।…

।। এগারো ।।

শ্মশানতলার আখড়া কে বারবার ভেঙে দিচ্ছে, শংকরা জানত না। সে প্রথমটা খুব চেঁচামেচি করে অকথ্য গাল দিয়েছিল। পিশাচ লেলিয়ে দেবে বলে শাসিয়ে বেড়াচ্ছিল। তারপর বেপাত্তা হয়েছিল কিছুদিন। হরসুন্দরের চায়ের দোকানে হেমাঙ্গ শুনেছে, সে নাকি উদ্ধারণপুরের শ্মশানে আছে। বলেছে, পিশাচ জাগাচ্ছি। মোহনপুরের মুণ্ডুসুদ্ধু কড়মড়িয়ে খাবে, দেখে নিও। কিন্তু কদিন পরে তাকে মোহনপুর স্টেশনেই দেখা গেছে। ওয়েটিং রুমের দরজার পাশে চিত হয়ে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। ছকা পাণ্ডা গিয়েছিল রেলবাবুদের প্রসাদী ফুল দিতে। সে ডাকতেই শংকরা উঠে বসে এবং হাউমাউ করে কাঁদে। উদ্ধারণপুরের সাধুরা তাকে খুব মেরেছে। কাটোয়া থানায় গিয়ে নালিশ করেছিল। ভাগিয়ে দিয়েছে। শংকরা তার জটাজুট সরিয়ে হাসপাতালের একচিলতে ব্যাণ্ডেজ দেখায়। তখন ছকার মায়া হয়। নিয়ে এসে বাবুপাড়ায় সিংহবাহিনীর মন্দিরে আশ্রয় দিয়েছে। তাঁর ঝাঁক অনেক কমে গেছে। হেঁড়ে গলায় মায়ের নামে হিন্দী ভজন গায়। পয়সাকড়ি পায়। ছকার সঙ্গে ছিলিম টানে।

হেমাঙ্গ একদিন দেখতে গেল শংকরাকে। সত্যি বলতে কী, বাড়ির দক্ষিণে ওই শ্মশানতলায় শংকরা থাকায় হেমাঙ্গ যেন একটা উপভোগ্য পরিবেশ খুঁজে পেয়েছিল। মাঝেমাঝে গিয়ে ওর কাছে আবোলতাবোল শোনাটা মন্দ ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা, শংকরার রহস্যময় আচরণ। সে নিশাচর। একটা গোপন হত্যা-কাণ্ডের সাক্ষী। হয় তো হেমাঙ্গ ছাড়া আর কাকেও ওই সাংঘাতিক কথা সে বলে নি। বললে নিশ্চয় পুলিস আসত। হইচই হত। হেমাঙ্গ তাকে আর নিছক বোকাহাবা ভাবতে পারত না। তার

খোপড়ি বার বার সে ভেঙে দিয়ে এসেছে অনর্থক রাগে। পরে অনুতাপ হয়েছে।

শংকরা মন্দিরের উঠোনের আটচালার থামে হেলান দিয়ে বসে আছে। কেন যেন শরীরটা আরও রোগা হয়ে গেছে। পাঁজরের হাড় গোনা যাচ্ছে। কণ্ঠা বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু আগের মতো নোংরা হয়ে নেই সে। দাড়িতে সকড়ি নেই। গায়ে অত ময়লাও নেই। কোমরে নোংরা ন্যাতার বদলে একটুকরো গেরুয়া কাপড় বা গামছা জড়ানো। কপালে দগদগে লাল ফোঁটা।

শ্মশান-মশানের আদিম রহস্যময় জগত থেকে সরে আসার ফলেই যেন এই অবস্থা। হেমাঙ্গের তাই মনে হচ্ছিল। সে ডাকে, কী রে শংকরা! কেমন আছিস!

শংকরা কটমট করে তাকায়। কথা বলে না। হেমাঙ্গ ভাবে, তাহলে কি ওর খোপড়ি ভাঙ্গার ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছে সে? হেমাঙ্গ একটু তফাতে হাঁটু দুমড়ে বসে। জুতো প্রথামতো গেটের কাছে খুলে রেখে এসেছে। সে বলে, রাগ করেছিস মনে হচ্ছে। কেন রে?

শংকরা হঠাৎ কেমন হেসে মাথাটা একটু দোলায়।

হেমাঙ্গ বলে, কী রে? হাসছিস কেন?

শংকরা শুধু বলে, শালা খচ্চর!

বটতলায় যাবিনে আর? তোর জন্যে পিশাচ ভূতপ্রেতগুলো কান্নাকাটি করছে যে রে!

শালা মাগীবাজ! বলে শংকরা ঠ্যাং গুটিয়ে আসন করে বসে।

হেমাঙ্গ চাপা গলায় বলে, আমি এক রাতে অমির সঙ্গে ক্যানেলের ওদিকে গিয়েছিলাম, তুই পুলিসকে বলে দিয়েছিলি। তাই না?

ভাত্-বে। পীরিতের ঘরে ধোঁয়া দে গে! আমি এখন ব্যস্ত।

বলেছিলি তুই?

যা যা! চ্যামনাগিরি করিস নে! এটা মায়ের জায়গা।

একটা টাকা দেব। বল্ না ব্যাটা!

আগে দে। বলে শংকরা হাত বাড়ায়।

হেমাঙ্গ একটা টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, তুই পুলিসকে বলে দিয়েছিলি তো?

টাকাটা ঝটপট শংকরা কোমরে গুঁজে ফেলে। তারপর বলে, আমি কি বলতুম নাকি? তোর গা ছুঁয়ে বলছি। আমাকে মাইরি যখন তখন রাতদুপুরে দারোগাবাবুরা এসে জ্বালাত। হারামীবাচ্চা জনের কথা জিগ্যেস করত। আমার কি চারটে চোখ আছে? বল্ না!!

শংকরা তেতো মুখে চুপ করে যায়। হেমাঙ্গ বলে, হুঁ। তারপর বলে দিলি যে......

বাধা দিয়ে শংকরা বলে, আমাকে একদিন থানায় নিয়ে গিয়েছিল।

বলিস কী!

সে জটা দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলে, এগুলো টেনে টেনে দেখলে মাইরি! দাড়ি টেনে দেখলে। তারপর খুব খাতির করে চা-বিস্কুট খাওয়ালে। তখন আমি ভেবে দেখলুম, এত খাতির যখন করলে তখন একটুকুন উপকার করা যাক।

তুই আমার আর অমির কথাটা বলে দিলি?

হুঁউ। তাতে কী! মিথ্যে বলেছি?

না, বলিস নি। কিন্তু তুই জগার কথা বলিস নি তো?

শংকরা গুম হয়ে থাকে। গাল ফুলিয়ে ঠোঁট গোল করে বাতাস বের করতে থাকে।

বল্ না রে!

আরেক টাকা লাগবে, ভাই।

এখন আর নেই। পরে নিয়ে আসব। বল্।

যখন দিবি, তখন বলব।

তার মানে বলেছিস।

উরুতে থাপ্পড় মেরে শংকরা চেঁচিয়ে ওঠে, বেশ করেছি। তোর বাবার কী?

হেমাঙ্গ বোঝে, ওকে চটালে কাজ হবে না। মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বলে, ভাল করেছিস। আমিই তো বলব ভাবছিলুম পুলিসকে। পাছে তোকে সাক্ষী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, তাই চেপে গেছি।

একথায় শংকরা শান্ত হয়। বরং ভয়ের ছাপ মুখে ফুটে ওঠে। বলে, মাইরি?

হ্যাঁ। তোকে সমন করে নিয়ে যেত আদালতে।

ওরে বাবা! হাকিম-টাকিম দেখলে মাইরি আমার ভয় করে। ওরাই তো ফাঁসি দেয়, না রে হেমা?

দেয়ই তো।

তাহলে ঠিক করেছি।······বলে শংকরা এপাশ-ওপাশ ঘুরে কী দেখে নেয়। তারপর ফিসফিস করে বলে, আরেকটা টাকা দিবি তো? মায়ের জায়গা। ওই ছাখ মা। দেখতে পাচ্ছিস?

হুঁউ, পাচ্ছি।

মায়ের সামনে বলছিস, আরেকটা টাকা দিবি?

দেব।

শংকরা আসন থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে এনে ফিসফিস করে বলে, জগা শালাও কম ছিল না মাইরি! একদিন সন্ধেবেলা খালের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। ওখানে একটা ওয়াগন উল্টে পড়েছিল দেখেছিস?

হ্যাঁ, ছিল······হেমাঙ্গের মনে পড়ে, ভাঙাচোরা ওয়াগনটা ছিল ডেডস্টপের পাশে। ঘাস আর আগাছা গজিয়ে ছিল তার চারপাশে।

শংকরা বলে, বুধনীর মেয়েটা রে। বুঝলি? সৈকা! সৈকা ছাগলের বাচ্চা বুকে নিয়ে আসছে। যেই ওখানটায় আসা জগা শালা কোত্থেকে এসে সামনে দাঁড়াল। তারপর মাইরি ছুঁড়িটাকে পটাতে শুরু করল। সব পষ্ট দেখা যাচ্ছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে। তারপর জগা শালা ছুঁড়িটাকে ধরল। আর ছাগলছানাটা চ্যাঁচাচ্ছে

চ্যাচাতে দৌড়ুল। তারপর হেমা, জগা শালা দু' হাতে ছুঁড়িটাকে ধরে ওয়াগংয়ের মধ্যে ঢুকল। আমি তো থ।

দম আটকানো স্বরে হেমাঙ্গ বলে, তারপর?

শংকরা বলে, বসে পড়লুম, দেখি কী করে জগা। ওয়াগং থেকে বেরুল, তখন আঁধার হয়ে গেছে, বুঝলি? তবে চাঁদটা উঠেছে। ওকে আবছা দেখলুম একা চলে যাচ্ছে। অনেকটা চলে যাওয়ার পর খাল পেরিয়ে গিয়ে সৈকাকে খুঁজলুম। ওয়াগংয়ের ভেতরে আঁধার হয়ে আছে। হলে কী হবে? আমি আঁধারে তো দেখতে পাই!

বলে শংকরা খ্যাঁক করে হেসে হাতে তালি দেয় একবার। হেমাঙ্গ বলে, তারপর?

শংকরা ফিসফিস করে। চোখ কুতকুতে, নিষ্পলক।

…ভেতরে সৈকা পড়ে আছে। গা ঠাণ্ডা। গায়ে হাত বুলিয়ে দেখি, একেবারে ন্যাংটো। আমি কাঁপতে কাঁপতে পালিয়ে এলুম। তা'পরে বুঝলি হেমা? বটতলায় চক্কর দিচ্ছি তখন চোখে পড়ল, জগা আর কে যেন আসছে। শালা ডন আসছে। এসে ওয়াগং থেকে ছুঁড়িকে বের করে মাইরি লাইনে ফেলে দিয়ে এল! তোর গা ছুঁয়ে বলছি!

এই সময় ছকার গলা শোনা যায়। শংকরা অমনি চোখ নাচিয়ে বলে ওঠে, হেমা! পালা!

হেমাঙ্গ ওঠে। পেছনে পায়ের শব্দ হতেই সে সেখানে দাঁড়িয়ে দেবীকে প্রণামের ভান করে। তারপর ঘুরে পা বাড়ায়। ছকা বলে, কী গো হেমাংবাবু? ভাল তো?

ভাল বলে হেমাঙ্গ বেরিয়ে যায়। রাস্তায় যেতে-যেতে সে পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। শংকরার খ্যাপামি অনেকটা কেটে গেছে মনে হল। হয় তো আবার মানুষের ভিড়ে এসে বাস করতে করতে নির্জন প্রকৃতির আদিম ব্যাপার-স্যাপার ওর মন থেকে খসে গেছে অনেকটা।

কিন্তু অমিও কি তাহলে সৈকার মৃত্যুরহস্যটা টের পেয়েছিল? শংকরা অমির কথা বলল না। অমি ওখানে থাকলে শংকরা তো তাকে দেখতে পেত।

নাকি শংকরা চলে আসার পর অমি অভিসারে বেরিয়েছিল? এমনও হতে পারে জগার সঙ্গে ওই ওয়াগনের মধ্যেই অমির প্রেম করার অভ্যাস ছিল। হয় তো শংকরার মতো সেও ধর্ষিতা সৈকার লাস আবিষ্কার করেছিল। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিল অবচেতনায়। কিন্তু…

একটা কিন্তু আছেই। হেমাঙ্গ আনমনে হাঁটতে হাঁটতে গুলাইয়ের হোটেলের সামনে এসে পড়েছিল। গুলাই তাকে দেখতে পেয়ে ডাকে—হেমাংবাবু! ও হেমাংবাবু!

হেমাঙ্গ 'শুকতারা' হোটেলে ঢোকে অনেককাল বাদে। ঢুকতেই তাকে হুলো একগাল হেসে অভ্যর্থনা করে। হেমাদা গো! আমি এসে গেছি।

কোথায় ছিলি রে অ্যাদ্দিন? বলে হেমাঙ্গ তার চুল খামচে ধরে।

গুলাই বলে, হ্যাঁ—গাঁট্টা লাগাও গোটাকতক হেমাংবাবু। আমার হাতের গাঁট্টায় হারামীর বেল ভাঙবে না। বাপ রে! মাথা নয়, পাথর।

গুলাইয়ের হোটেল বেশ পরিচ্ছন্ন। কারণ স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা এসে খেয়ে যায়। কাঠের পুরনো টেবিলের ওপর সানমাইকা লাগিয়েছে। স্টেনলেস স্টিলের জগ। দেয়ালগুলোয় অয়েলপেন্ট মাখানো এবং ছবিও এঁকে নিয়েছে।

দুটি গ্রাম্য শৌখিন লোক টেবিলে ট্রান্সজিস্টার রেখে মাংসভাত খাচ্ছে। তাছাড়া সব টেবিল ফাঁকা। হেমাঙ্গ গুলাইয়ের কাউন্টারের পাশের টেবিলে বসে হুলোকে বলে, কোথায় ছিলি বললিনে?

হুলো দাঁত বের করে শুধু হাসে। গুলাই বলে, চেহারার হাল দেখে বুঝতে পারছেন না কোথায় ছিল?…বলে গুলাই ফিসফিস

করে। একগাদা টাকা গচ্চা দিতে হল হারামীর জন্যে। নৈলে তো অ্যারেস্ট করে নিয়ে পেঁদানি দিত। কাল রাত্রিবেলা এসে ওই জানলায় খুটখুট করছে। জানলা খুলে দেখি, আমার হিরো এসে গেছে। গুলাই হাসতে থাকে।

হেমাঙ্গ বলে, হুলো! একগ্লাস জল খাওয়া রে! হুলো নিঃশব্দে হুকুম তামিল করে।

গুলাই বলে, সকালে উঠে বলেছি—থাকতে হলে খেটে খেতে হবে। খদ্দেরপাতি দেখতে হবে। কাউন্টারেও বসতে হবে। এ যদি মেনে চলো, তোমার উদ্ধার। নৈলে বাবা, গেট আউট হও! তা হেমাংবাবু, অসময়ে এলে যে গো! কাবাব তো এখনও রেডি হয় নি। কষা মাংস আর পরোটা খাও!

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, কিচ্ছু খাবো না। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, তাই ভাবলুম দেখে যাই কেমন আছেন গুলাইদা!

হুলো জলের গ্লাস রেখে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। হেমাঙ্গ জল খেয়ে বলে, হুলো! তোর অমিদির ভূতের খবর জানিস? ভূতটা ক্ষেপে গেছে রে!

হুলো মাথা দোলায়। গুলাই বলে, ভাল কথা! প্রমথবাবুর ভাইঝির ব্যাপারটা কী গো হেমাংবাবু? শুনলুম নিশিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল নাকি! আজকাল এমন হয়?

হয়। বলে হেমাঙ্গ সিগারেট এগিয়ে দেয় গুলাইকে। গুলাইদা, হুলোর অবস্থা তো শোচনীয় দেখছি। এবার ভাল করে মাংসটাংস খাইয়ে তাজা করে তুলুন।

গুলাই বলে, সে আমাকে বলতে হবে না হেমাংবাবু। ও নিজেই সে ব্যাপারে এক্সপার্ট। ওর নাম হুলো কেন, বুঝতে পারছ না? বিপদ কেউ কেউ ডেকে কাঁধে নেয়। আমিও নিয়েছি, ঘরে হুলো ঢুকিয়েছি।

হুলোকে নিয়ে কিছুক্ষণ রসিকতা চলতে থাকে। তারপর হেমাঙ্গ ওঠে। হুলো, যাস একবার। পিসিমা প্রায় তোর

কথা বলে। এসেছিস শুনে খুব খুশি হবে। দেখা করে আসিস।

কিন্তু সেদিন থেকেই হেমাঙ্গের সুখ শান্তি গেল।

কালবোশেখির ঝোঁক এসে গেছে এ বছর। প্রায় দিন বিকেলে আকাশ জুড়ে ক্ষ্যাপামি চলেছে। কোনোদিন শুধু ঝড়-ঝাপটা, কোনোদিন তার সঙ্গে ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি। গাছপালার রঙ ঝলমল করে। খালের জল হলুদ হয়ে গেছে মোহনপুর ধোয়া গড়ানে জলে। শ্মশানতলার দিকে সবুজ ঘাসের জেল্লা ফুটেছে। বাঁজা ডাঙায় গয়লাদের গরু-বাছুরের পাল দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভেজে। কখনও মেঘভাঙা রোদের মধ্যে বৃষ্টি ঝরে। রেল ইয়ার্ডে চেকনাই ভাব ফুটেছে। মুসহরবস্তির ঝোপড়িগুলোও ঘষামাজা তকতকে দেখায়। শুওরের পাল খালের ধারে হুলুস্থুল করে বেড়ায়। অনেক রাত অব্দি ঢোল বাজে ওদিকটায়। রেলইয়ার্ডে কোন শৌখিন গ্যাংম্যান বাঁশের বাঁশিতে হিন্দি ফিল্মের গান বাজায়। হেমাঙ্গের এইসব রূপ শব্দ গন্ধ অনুভবের আর কোনো স্নায়ুই নেই যেন।

মুনাপিসি নার্সারি থেকে নানারকম বীজ আর চারা এনে দিতে সাধে হেমাঙ্গকে। হেমাঙ্গের উড়ু-উড়ু মন। আর অস্বস্তি। যত দিন যাচ্ছে, বাইরে বেরুতে তার গা ছমছম করে। শুধু ভাবে, বাড়ি ফেরা হবে তো।

প্রতিমুহূর্তে সে অপেক্ষা করছে আততায়ী ডনের। কখন এসে তাকে রিভলবার চাইবে! হেমাঙ্গ কী বলবে, জবাব তৈরী করে। দৈবাৎ বাইরে থাকলে সন্ধ্যার আগেই সে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসে। রাতে কান পেতে থাকে ডনের পায়ের শব্দ পাবে বলে। কোথায় একটু শব্দ হলেই চমকে ওঠে। জানলার কাছে গিয়ে কান পাতে। শংকরার কাছে সৈকার মৃত্যুরহস্য জেনে তার চোখে মোহনপুর দিন-দুপুরেই ঘন অন্ধকারে ভরে গেছে। মারাত্মক অপশক্তিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে। আর একেকটি রাত মানেই নরকবাস। দীর্ঘ দীর্ঘ নরক-যন্ত্রণা।

কোনো-কোনো রাতে বাতাস বন্ধ হয়ে যায়। সব জানালা সে বন্ধ করে রেখেছে। উৎকট গরমে সে দরদর করে ঘামে। তবু জানলা খুলতে সাহস পায় না। হাত পাখা ঘোরায়। ভাবে, মুনাপিসিকে পটিয়ে একটা টেবিলফ্যান কেনার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সকাল হলেই দুঃস্বপ্নের অনেকটা অবসান, এবং এই বিলাসিতার জন্যে মুনাপিসিকে বলতে তার দ্বিধা আসে।

হেমাঙ্গ অনেক হাস্যকর এবং অদ্ভুত ব্যাপার করল। সে খুঁজে পেতে একটা লোহার মরচেধরা রড এনে রাখে খাটের তলায়। ছোট্ট ছুরি খুঁজে বের করে পুরনো জিনিসপত্রের জঞ্জাল থেকে। আজকাল সে মুনাপিসিকে চোর-ডাকাতের কথা বলে ভয় দেখাতে চায়, যাতে মহিলাটি সতর্ক থাকে! পিসেমশাই এই শেষ দিকটায় কেন যে বাড়ি করলেন, তা নিয়ে অনুযোগ করে। কাছেই শ্মশান—ওদিকে মাঠ জঙ্গল খাঁ খাঁ জায়গা!

মুনাপিসি বলে, গোলমাল তো পছন্দ করতেন না উনি। তুইও তো তাই। নিরিবিলি এমন বাড়ি বলে চিরদিন তোর পিসেমশায়ের কত প্রশংসা করেছিস। এখন উল্টো গাইছিস কেন রে হেমা?

হেমাঙ্গ বলে, আগে বুঝতুম না তাই। মোহনপুর যে কী মারাত্মক জায়গা হয়ে উঠেছে আজকাল, জানো না তো!

মুনাপিসি এ যুক্তিতে সায় দিয়ে বলে, তা অস্বীকার করছি নে। তবে আমরা তো আসলে গরিব মানুষই। চোর-ডাকাতেরা কী নেবে? কোন্ বাড়িতে হানা দিলে লাভ হবে, ওরা জানে।

আতঙ্কের প্রথম ধাক্কাটা কাটার পর হেমাঙ্গ একদিন বিকেলে নিজের সাহস বাজিয়ে দেখতেই গুলাইয়ের হোটেলে কাবাব খেতে গেল। একটু গোপন উদ্দেশ্যও ছিল। হুলোর কাছে ডনের খবর জানা।

হুলো ডনের খবর জানতেও পারে। ওকে গুলাই নিশ্চয়ই বেরুতে দিচ্ছে না, তাই ও হেমাঙ্গের বাড়িতে যায় নি। হেমাঙ্গকে দেখে গুলাই খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করে। হেমাঙ্গ বলে—কাবাব খেতে এলুম গুলাইদা! হুলো কই?

গুলাই বিকৃত মুখে বলে, ওর কথা জিগ্যেস করছ হেমাংবাবু! ও কি মানুষের বাচ্চা!

সে কী! হেমাঙ্গ হতাশ হয়ে বলে। আবার পালিয়েছে বুঝি?

যাবে কোন চুলোয়? চুলো থাকলে কি আমার কাছে ফিরে আসত ভাবছেন?

তাহলে?

সেই আগের মতো লাইন ধরেছে। এখন আছে তো তখন নেই। একটু আগে বললুম, নন্টুকে দেখে আয় বাড়ি ফিরেছে নাকি। আমার বাবুর্চি বুড়োটা তো দেখেও এল। এসে খানিক এদিক-ওদিক ঘুর-ঘুর করে কোন ফাঁকে হাওয়া। কদিন থেকে এইরকম।

হেমাঙ্গ একটু চুপ করে থেকে বলে, তাহলে ইদ্রিসদের সঙ্গে ঘুরছে আবার!

গুলাই রাগ দেখিয়ে বলে, তাই মনে হচ্ছে। কাল বিকেলে দেখলুম মুসহরদের ঝেণ্টু ওকে সাইকেলের রডে বসিয়ে গোলপার্কে চক্কর দিচ্ছে।

গুলাই বাজারের মধ্যিখানে নলিনাক্ষের আবক্ষ-মূর্তি সমন্বিত গোলে রেলিংঘেরা জায়গাটাকে গোলপার্ক বলে। আসলে ওর জীবনের একটা সময় কলকাতায় কেটেছে। ওর কথাবার্তায় সেই সব শহুরে গন্ধ ভুর-ভুর করে। হেমাঙ্গ জিগ্যেস করে, ঝেণ্টু নাকি গা ঢাকা দিয়েছিল শুনছিলুম।

গুলাই চাপা গলায় বলে, জ্ঞানবাবুর রিপ্রেজেণ্টেটিভ আছে একজন। জানো না?

সে আবার কে?

আকবর। আকবর এখন জ্ঞানবাবুর লেজুড় ধরে উঠতি নেতা হচ্ছে যে! সে আজকাল ঝেণ্টুদের গার্জেন হয়েছে দেখছি। খুব লেফটহ্যাণ্ড রাইটহ্যাণ্ড ভাব। বলে গুলাই দুর্বোধ্য একটা দুই হাত ঘুরিয়ে। তারপর খিকখিক করে হাসে।

কাবাব খেয়ে হেমাঙ্গ ওঠে। শুকতারায় এখন বিকেলের ভিড়। অবাঙালী মুসলিমও আছে মোহনপুরে। বেশির ভাগই রেলের লোক। কেউ কেউ ছোটখাট ব্যবসা করে। তাদের ভিড় এখন থেকে রাতঅব্দি চলবে। হেমাঙ্গ বাজারের চৌমাথায় এসে হরসুন্দরের চায়ের দোকানের দিকে তাকিয়ে থাকে। হুলো ওখানে নেই।

সে সতর্ক চোখে ভিড়ে যেন নিজের আততায়ীকে খুঁজতে খুঁজতে হাঁটে। বলা যায় না, ডন তার কোন সঙ্গীকে এই দায়িত্বটা দিতে পারে। আচমকা সে ড্যাগার বের করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে হেমাঙ্গের ওপর। হেমাঙ্গ প্রতিটি যুবককে সন্দেহের দৃষ্টে দেখতে দেখতে বড়পোল পেরিয়ে যায়।

বাঁদিকে হাউসিং কলোনীর রাস্তা। এ পথে সে আসে নি, ফিরেও যাবে না। কারণ এ পথের ধারেই বোসবাড়ি। কিছুটা এগিয়ে রেশমকুঠির পেছন ঘুরে যাবে। কিন্তু সেখানে মোড়ের মাথায় বারোয়ারি বটতলায় টলু তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। হেমাঙ্গ দাঁড়িয়ে গেল।

টলু মিটি-মিটি হেসে তার দিকে এগিয়ে আসে। তারপর সামনে দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গের মাথা থেকে পা অব্দি দেখে নিয়ে বলে, সত্যি সত্যি হেমা, নাকি অন্য কেউ?

হেমাঙ্গ গম্ভীর থাকতে চেষ্টা করে। কী ব্যাপার?

ব্যাপার তো তোর। কী হল সেদিন অমির সঙ্গে যে অমন করে পালিয়ে গেলি?

হেমাঙ্গ চারপাশে দ্রুত দেখে নিয়ে বলে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কথা? আমার সঙ্গে? সব কথা তো তোর অমির সঙ্গে!

না। তোমার সঙ্গেই।

খুশি হলুম। বল্!

এভাবে এখানে কথা হয় না। বলে হেমাঙ্গ উপযুক্ত জায়গা হাতড়ায় মনে মনে।

টলু চোখ নাচিয়ে বলে, তাহলে আমাদের বাড়িতে আয়। তবে আজ ওয়েদার ফাঁকা রে! আজ আর ঝড়-জলের চান্স নেই হেমা!

বারোয়ারি তলায় কিছু লোক সব সময় থাকে। পাশে বড় রাস্তা—যেটা স্টেশন রোড বলা হয়, সোজা পশ্চিমে এগিয়ে হাই-ওয়েতে মিশেছে। স্টেশন রোডে গাড়ির ভিড় আছে। হেমাঙ্গ বলে, তোমাদের বাড়িতে নয়। হাইওয়েব দিকে যেতে আপত্তি আছে?

টলু আঁতকে উঠে বলে, তোর মাথা খারাপ হয়েছে? তোর সঙ্গে ওদিকে যাব, আর চেনা কারুর চোখে পড়ুক! অসম্ভব। আয় না তুই আমাদের বাড়িতে। কোন অসুবিধে নেই।

হেমাঙ্গ টের পায়, বটতলার বুড়োরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। চেনা লোকেরাও তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে তাদের দিকে। সে বলে, চলো তো। বাড়ির পথে যেতে যেতেই বরং বলি।

টলু পা বাড়ায়। তার পাশে হাঁটে। যতীন কবরেজের বাড়ি গিয়েছিলুম রে! মায়ের কোমরে এক্সরে করে কিচ্ছু পায় নি। অথচ ব্যথা আছে। এখনও পা ফেলতে পারছে না ঠিকভাবে।

এই খোয়া ঢাকা রাস্তাটার দুধারে অজস্র গাছ, মধ্যে মধ্যে একটা করে সুন্দর বাড়ি। প্রত্যেক বাড়ির চারপাশে শাকসব্জীর ক্ষেত, ফুলফলের বাগান। বেশ নির্জন এলাকা। ঘন ছায়ায় ঢাকা। হেমাঙ্গ বলে, তুমি রিভলবারের কথাটা তোমার বাবা-মাকে বলে-ছিলে। কিন্তু অমিকে তাহলে বলতে গিয়েছিলে কেন?

টলু পুরুষালি ভঙ্গীতে হাসে। ওর ভরাট থুতনি আর পুরু ঠোঁট কাঁপতে থাকে সেই অদ্ভুত হাসিতে। ইস! অমির সঙ্গে রিলেশানে চোট খেয়েছে তো? বাঃ! কী ফাইন!

এ হাসির কথা নয় টলুদি!

দিদি বলতে লজ্জা করে না তোর?

হেমাঙ্গ চটে গিয়ে বলে, তবে কী বলব? কী শুনতে চাও আমার কাছে?

টলু এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে ওর চিবুক খামচে দিয়ে বলে, নেকু! খুকুছোনা! ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানো না?

ওসব ফাজলেমি ছাড়ো! তুমি আমাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছ জানো! হেমাঙ্গ তেতো মুখে বলে। হঠাৎ কখন ডন এসে অমির কাছে চাইবে। অমি বলবে আমাকে দিয়েছিল। তখন ডন আমার ওপর জুলুম করবে।

তুই ভাবিস নে হেমা! ডনকে আমি ম্যানেজ করব। টলু আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে বলে। কিন্তু এখন এ নিয়ে ভাবছিস কেন তুই? ডন এখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত!

হেমাঙ্গ চুপ করে থাকে। টলু খুব আস্তে হাঁটছে। একটু পরে হেমাঙ্গ বলে, ডন একবারও বাড়ি আসে নি?

টলু মাথা নাড়ে। তারপর ফিক করে হেসে বলে, জানিস? তোদের বাড়ি যাবার জন্যে খুব মন টানছিল। আদ্ধেক গিয়ে ফিরে এসেছি। বাপ্‌স! তোর পিসিবুড়ীর যা চোখ! তোদের বাড়ির একটা বাড়ি পরে অনুরা থাকে জানিস? হেডমাস্টার মশায়ের মেয়ে অনু। ওকে তোর কথা জিগ্যেস করলুম সেদিন। বলল, নেই বোধহয়। বাইরে-টাইরে গেছে।

হেমাঙ্গ কোন মন্তব্য করে না।

টলু হঠাৎ ফিসফিসিয়ে ওঠে, আমাকে তুই পাগল করে দিয়েছিস হেমা! ইচ্ছে করছে. তোকে এক্ষুণি স্ট্যাব করে মেরে ফেলি। সত্যি বলছি—বিশ্বাস কর। বেশ তো ছিলুম। কেন যে ছাই হঠাৎ…

টলুর কথা আটকে গেল। রাস্তার মধ্যে চোখে জলটল নিয়ে এক কাণ্ড করে ফেলবে মেয়েটা। হেমাঙ্গ বিব্রত হয়ে বলে, আমাকে তুমি বরাবর নেকু বলো। তুমি নিজে কম নেকী নও! আচ্ছা—চলি।

টলু নির্লজ্জ হাতে ওর পিঠের জামা খামচে ধরে আটকায়। বলে, আমার সর্বনাশ করে খুব গা বাঁচিয়ে বেড়াচ্ছ, তাই না?

হেমাঙ্গ আঁতকে উঠেছে। আবার সেদিনকার মতো ব্ল্যাকমেল শুরু করেছে রাস্তার মাঝখানে। সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে,

ছিঃ! তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞানই নেই। ওইসব বাড়ির লোকেরা চোখ বুজে বসে নেই খেয়াল আছে?

টলু বলে, হেমা! তুমি সেদিন একা পেয়ে আমার সর্বনাশ করেছ। যদি আমার কিছু হয়ে যায়, তার রেসপনসিবিলিটি তোমার। তোমাকে আমি ছেড়ে দেব না। আমি কেমন মেয়ে, তা তো জানোই।

হেমাঙ্গ হাসবার চেষ্টা করে বলে বাঃ! দিব্যি ব্ল্যাকমেল করে যাচ্ছ। করো! আমি নির্বোধ!

সামনে ডানদিকে বোসবাড়ি দেখা যাচ্ছে গাছপালার ফাঁকে। রোয়াকে প্রমথ যথারীতি বসে আছেন। সামনে আর কেউ বসে আছে। হয়তো কোন আত্মীয় কিংবা অন্য কেউ। টলু বলে, হেমা! যা বললুম, রাগ করিস নে লক্ষ্মিটি! সত্যি, ঝোকের বশে সেদিন কীসব হয়ে গেল—বড্ড ভয় করছে। শুধু কী ভাবছি জানিস? যদি সর্বনাশ ভাগ্যে থাকেই, তার শেষটুকু দেখতে ক্ষতি কী?

হেমাঙ্গ সে কথায় কান করে না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে আরেক আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছে। এবার মোহনপুর ছেড়ে তাকে পালাতে হবে। সে বলে, আসি টলুদি।

টলু খপ করে তার হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে সে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নেয়। সরে আসে নিরাপদ দূরত্বে। টলু চেঁচিয়ে বলে, বাবা! ও বাবা! হেমা আমাদের বাড়ি আসছে না!

প্রমথ দেখতে পেয়ে হাত তুলে ডাকেন। হেমাঙ্গ অগত্যা গেটের সামনে গিয়ে বলে, কাল সকালে আসব জ্যাঠামশাই। ভীষণ জরুরী কাজ আছে। পিসিমা খুব অসুস্থ।

প্রমথ বলেন, তাই নাকি? তাহলে তো একবার দেখে আসতে হয়। অনেক দিন……

বাধা দিয়ে হেমাঙ্গ বলে, না। বেশি কিছু নয়। সেরে যাবে। আসি জ্যাঠামশাই!

হেমাঙ্গ আর পিছু ফিরে তাকায় না। হনহন করে এগিয়ে

যেতে থাকে। কিছু দূর যাওয়ার পর সে গতি কমায়। তারপর টলুর শাসানির বাস্তবতা বুঝতে চেষ্টা করে। অমনি তার হৃদপিণ্ডে সেই বারবার আসা আতঙ্কের পরিচিত খেঁচুনি দেখা দেয়। উরু ভারি হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে, যেভাবেই হোক পাকেচক্রে এক ভয়ঙ্কর অপশক্তির ছায়ায় সে জড়িয়ে পড়েছে। শূন্যদৃষ্টে তাকায় হেমাঙ্গ। এখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া আর হয়তো কোনো উপায়ই তার নেই।···

পরদিন সকালে অভ্যাসমতো খালে কাঠের ব্রিজে দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গ ভেরেণ্ডা ডাল ভেঙে দাঁতন করছে, ওপারে মুসহর বস্তির দিক থেকে সিগারেট টানতে টানতে হুলো এল।

হেমাঙ্গ তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে একটু যেন ভড়কে যায় ছেলেটা। কাঁচুমাচু হাসে। একটা বেঢপ ঢোলা নতুন ফুলপ্যাণ্ট আর নতুন জামা পরে আছে। চুলের কেতা দেখার মতো। মুখে পাওডারের ছোপ। হেমাঙ্গ বলে, এই যে গুলাইবাবুর হিরো। এস, তোমাকে দেখাচ্ছি মজা।

হুলো ফিক করে হাসে। হেমাদা, এই নোংরা জলে তুমি মুখ ধোবে গো?

তুই যে ভীষণ সেজেছিস রে! কাছে আয় তো দেখি।

হুলো ব্রিজে ইচ্ছে করেই আওয়াজ দিয়ে হেঁটে এল। তখন হেমাঙ্গ দেখতে পায়, একটা উঁচু হিলওলা নতুন জুতোও পরেছে। কাছে এসে সে বলে, হেমাদা। তুমি বেরাশ দিয়ে দাঁত মাজলেই পারো।

হেমাঙ্গ বলে, তোর মতো আমার গুলাই-টুলাই নেই। এদিকে কোত্থেকে আসছিস রে?

হুলো আঙুল তুলে মুসহর বস্তির দিকটা দেখিয়ে বলে, ঝেণ্টুদার কাছে ছিলুম। ঝেণ্টুদা বিয়ে করেছে জানো না? কী বউ মাইরি হেমাদা। একেবারে মধুবালার মতো দেখতে।

তাই নাকি? জানি না তো! হঠাৎ কবে বিয়ে করল ঝেণ্টু?

এই তো পরশু।

ইয়ার্কি করছিস! ঝেণ্টু চুপচাপ বিয়ে করল? কই, ঢোলফোল বাজতে শুনলাম না—কিছু না। হেমাঙ্গ থাপ্পড় তোলে। বাঁদর সক্কালবেলায় গুল দিতে বেরিয়েছ!

হুলো একটু পিছিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার ভঙ্গী করে তারপর বলে, মাকালীর দিব্যি। জটাবাবার দিব্যি। তোমার দিব্যি হেমাদা। সে গলা চেপে ফের বলে, ভাগিয়ে এনেছে কার বউ! ইদ্রিসদা বলছিল।

হেমাঙ্গ অবাক হল। মুসহর বস্তিতে মাত্র কয়েকটি ঘর আছে মাটির দেয়াল এবং টালির চাল। ছোট্ট ঘর। তার একটা ঝেণ্টুর। বাদবাকি সব ঝোপড়ি! তেরপল ক্যানেস্তারা চাপানো গুহা বললেই চলে। ওই ঘরে কোনও সুন্দরী মেয়েকে এনে তুলেছে ঝেণ্টু? নিশ্চয় আজেবাজে চরিত্রের মেয়ে। অবশ্য ঝেণ্টুর চেহারা সুন্দর। সে স্বাস্থ্যবানও বটে! হেমাঙ্গ জিগ্যেস করে, তোকে কাল শুকতারায় খুঁজতে গিয়েছিলুম জানিস?

হুলো মাথা দোলায়। সিগারেটটা ঝুঁকে খালের জলে ফেলে দেয়। জলে সবে স্রোত বওয়ার মরশুম এসেছে।

হেমাঙ্গ বলে, তুই এতদিন কোথায় ছিলি রে হুলো?

হুলো শার্টের বুকপকেট থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে, কত জায়গায়। কাটোয়া, বহরমপুর, বেলডাঙ্গা, কেষ্টনগর। ঘুরে-ঘুরে বেড়াতুম।

খেতিস কোথায়? কে খেতে দিত তোকে?

জুটে যেত। দিনকতক এক বাবুর বাড়ি ছিলুম জানো? হুলো ফিক করে হাসে। বাবুর বউ খুব ফক্কড় মেয়ে মাইরি। কী করত জানো? রোজ দুপুরবেলা আমাকে বলত, বাইরে-টাইরে ঘুরে আয়। এই নে পয়সা। আমি এখন ঘুমোব। বিরক্ত করতে আসবি নে। তারপর কী করত উরেব্বাস! একদিন খুব রাগ

হল। বাবুকে বলে দিয়ে পালিয়ে এলুম। কী হল কে জানে—আমি আর সেখানে থাকলে তো?

হেমাঙ্গ বলে, কী করত রে বাবুর বউ?

হুলো রাঙামুখে বলে, যাঃ। বলে না ওসব। তা হ্যাঁ গো হেমাদা, অমিদির ভূত সেরেছে?

গিয়ে দেখে আয় না।

বুড়ো তেড়ে মারতে আসে। এসেই তো গিয়েছিলুম। যেই গেটের কাছে গেছি, বুড়ো বলল—কে রে? আমি বললুম—দাদু, আমি হুলো। অমনি তিড়িংবিড়িং করে তেড়ে এল। আমি লংজাম দিয়ে হাওয়া!

হেমাঙ্গ আস্তে বলে, হ্যাঁ রে! ডন কোথায় আছে জানিস?

হুলো একটু দ্বিধায় পড়ে যায় যেন। খালের জলে থুতু ফেলে। আকাশ দেখতে থাকে।

হেমাঙ্গ ফের বলে, আমাকে বলতে ভয় কী? তুই তো কত কথা আমাকে বরাবর বলেছিস। কারুর কানে তুলেছি?

হুলো পায়ের দিকে চোখ রেখে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেই বলে, আকবরদাদের গাঁয়ের বাড়িতে আছে। এই হেমাদা! জানলে আমাকে আবার পালাতে হবে। ঝেন্টুদারা বারণ করেছিল।

তুই আর কাকেও বলিস নি তো?

হুলো মাথা দোলায়।

হুলো, নতুন জামা-প্যান্ট কে দিল রে?

গুলাইশালা খুব পটাচ্ছে।

তুই ওকে শালা বলছিস? খুব নেমকহারাম তো তুই! হেমাঙ্গ দাঁতনটা খালের জলে ফেলে দেয়। তারপর জলের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত: করে। হুলো ঠিকই বলেছে। জলটা এখন নোংরা। চৈত্রের শেষে খুব পরিষ্কার থাকে। মোহনপুরের নর্দমাগুলোর সঙ্গে খালটার যোগ নেই। সব নর্দমার জল উত্তরের দিকে গড়িয়ে মাঠে পড়ে। ওই মাঠটাই নাকি ভাগীরথীর কবেকার খাত ছিল। ঘুরে

জটাবাবার থানের পাশ কাটিয়ে রেল-লাইনের তলা দিয়ে পুবের মাঠের দিকে গেছে। অবশ্য শুওরের পাল এই খালের জলে হুলুস্থুল করে বেড়ায়। হেমাঙ্গের সেটা অনেক সময় মনে থাকে না। হয়তো তার কিছু অন্যমনস্ক বদভ্যাস আছে, নিজেও আঁচ করে। কোথাও অবচেতনায় একটু পারভাস'ান আছে।

আয় হুলো, পিসিমা তোকে দেখলে খুশি হবে। বলে হেমাঙ্গ পা বাড়ায়।

হুলো ঘুরে মুসহর বস্তির দিকটা দেখে নিয়ে বলে, এখন যাব না হেমাদা। ঝেন্টুদা বকবে। তোমাকে দেখতে পেয়ে চলে এসেছি। আমি যাই গো হেমাদা।

সে আবার মুসহর বস্তির দিকে চলে যায়। হেমাঙ্গ বাড়ি ঢুকে টিউবওয়েলের ধারে বসে মুখ ধোয়। মুনাপিসি কাঁসার গেলাস আঁচলচাপা করে চা খাচ্ছে বারান্দায়। যতক্ষণ চা খাবে মুখ খুলবে না সে।

একটু পরে হেমাঙ্গ সাইকেল বের করে। বলে, পোস্টাপিস থেকে ঘুরে আসি। ডাবু চটে আর চিঠিপত্র দিচ্ছে না। একটা চিঠি লিখে দিইগে আজ।

মুনাপিসি বলে, হেমা, বাজারটা করে আনিস বাবা! রোজ আর একে-ওকে সাধতে পারিনে।

কই, দাও।

থলে আর টাকা নিয়ে হেমাঙ্গ বেরিয়ে যায়। কোন বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় সেদিকে তাকায় না। খুব জোরে বেরিয়ে যায়।

॥ বারো ॥

আরও তিনটে দিন কেটে যায়। হেমাঙ্গ কান পেতেই থাকে, ডনের গ্রেপ্তারের খবর শুনবে। হরসুন্দরের চায়ের দোকান, গুলাইয়ের হোটেল—আরও কয়েকটা পুরনো আড্ডার জায়গায় ঘোরাঘুরি করে। কিন্তু তেমন কোন খবরই নেই। পুলিসের ওপর চটে যায় সে। আরও অস্বস্তিতে ভোগে। তাহলে কি ডনকে ধরতে চায় না পুলিস? জ্ঞানবাবুর অথবা আকবরের হাত থাকাও সম্ভব। না—সম্ভব এখানে ভুল শব্দ। আকবর নিজের বাড়িতে তো তাকে লুকিয়ে রেখেছে!

হেমাঙ্গ বুঝতে চেষ্টা করে, কেন সে ডনকে এত ভঁয় পায় বরাবর? বুঝতে পারে না। শুধু মনে হয় ডন একজন জন্ম-আততায়ী। মোহনপুরের অন্ধকার জগতের সে এক শক্তিমান ক্ষুদে রাজা। অথচ হাতাহাতি লড়লে হেমাঙ্গের সঙ্গে সে গায়ের জোরে পারবে না হয়তো।

আর কলকাতায় জুয়েলারি দোকানের ডাকাতি কেসটা ধামা-চাপা দিতে কতক্ষণ? নেহাত কাগজপত্রের পদ্ধতি বজায় রাখতেই আই. বি. তাকে জেরা করতে এসেছিল, সেটা বুঝতে পারছে হেমাঙ্গ।

কিন্তু আপাততঃ ডনকে মোহনপুর থেকে সরাতে পারলে টলুর সঙ্গে বোঝাপড়া করা যেত। টলু মেয়ে। প্রমথ বোস বেঁচে থাকতে বিধবা মেয়ের কেলেঙ্কারি রটতে দেবেন না, টলু যতই শাসাক।

হেমাঙ্গ বিকেলে বেরুবে বলে তৈরী হচ্ছে, ডাবুর সাড়া পেল। ডাবু রাস্তা থেকে চেঁচাচ্ছে—হ্যামা। এই হ্যামা!

হেমাঙ্গ বেরোয় বারান্দায়। ডাবু ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে একলাফে উঁচু বারান্দায় ওঠে। হেমাঙ্গ বলে, এসে গেছিস!

ডাবু ওর জামার কলার খামচে ধরে বলে, তুই শালা যদি কিছু না করবি, মিছিমিছি আমাকে ভোগালি কেন?

হেমাঙ্গ কৈফিয়ত দেয়। মুশকিল কী জানিস? প্রমথ-জ্যাঠা আমাকে পাত্তাই দেননা। নিজে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন। আমি ব্যাপার দেখে চুপ করে আছি।

ডাবু যুক্তিটা মেনে নেয়। সেটা খানিকটা আঁচ না করেছি, তা নয়। যাক্ গে, শোন। টেলিগ্রাম পেয়ে দৌড়ে এসেছি। কমিউনিটি সেন্টারের কাজটা পেয়ে গেছি।

পাবিই। তোর শ্বশুরের কেরামতি!

ডাবু জিভ কেটে বলে, যাঃ! মিলুকে আমি বিয়ে করব ভেবেছিস? ও একরত্তি মেয়ে। আমার বডিটা দেখছিস না? সে হো-হো করে হাসে।

ভেতর থেকে মুনাপিসির সাড়া আসে। ডাবের গলা শুনছি নাকি রে হেমা?

ডাবু বলে, হ্যাঁ পিসিমা।

আয় রে, আয়। তোকে দেখি।

যাচ্ছি। হ্যামার সঙ্গে বোঝাপড়াটা সেরে নিই আগে।

হেমাঙ্গ বলে, আবার হ্যামা-হ্যামা করছ? ভেরি ইনসাল্টিং!

ডাবু চোখ নাচিয়ে বলে, তোর চেহারা এমন শুটকিমাছের মতো হয়ে গেছে কেন রে? একেবারে অমির মতো। হুবহু! ধন্যি বাবা প্রেম! তোমার খুরে নমস্কার।

হেমাঙ্গ বলে, ওদের বাড়ি আর আমি যাই নে রে।

কেন, কেন?

এমনি। হেমাঙ্গ একটু চুপ করে থাকার পর ফের বলে তোকে বলব সব।

এক্ষুণি বল্।

হেমাঙ্গ বাড়ির ভেতরদিকে ইশারা করে ঠোঁটে আঙুল রাখে। ডাবু পাঞ্জাবির পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করে। হেমাঙ্গ বলে, আয় না—বটতলার দিকে ঘুরে আসি।

চল্। ডাবু ভেতরে উঁকি মেরে মুনাপিসির উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে, পিসিমা, আসছি আমরা। এক্ষুণি আসছি তুমি রেডি হয়ে থাকো।

মুনাপিসি বলে, তোর শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবি নাকি রে?

হাসতে হাসতে বারান্দা থেকে নেমে আসে ডাবু। হেমাঙ্গ তখন রাস্তায়। দুজনে কিছুটা এগোলে সতর্ক মুনাপিসি ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।

শ্মশানতলার আগে গাবগাছটার কাছে দাঁড়িয়ে দুজনে সিগারেট ধরায়। ডাইনে পশ্চিমে কিছুটা দূরে বাঁজা চটানের দিকে তাকিয়ে ডাবু বলে, উরেব্বাস। ওখানে কারা ফুটবল গ্রাউণ্ড করল রে হেমা?

হেমাঙ্গ ঘুরে দেখে অবাক হয়। কে জানে। আজই প্রথম দেখলুম।

কারা ওরা?

মনে হচ্ছে রিফিউজি কলোনীর ছেলেরা। হেমাঙ্গ ওদের দেখতে দেখতে বলে। ব্যস! আর কী! দেখল হঁয়ে গেল। নন্দীবাবুদের বোন মিল প্রজেক্ট খতম! তবে এটা ভাল হল জানিস? বাড়ির কাছে বোনমিল! গন্ধে টেঁকা দায় হত।

আয় না, দেখে আসি খেলা।

হেমাঙ্গ ওকে টেনে আটকায়। তোর পা সুড়সুড় করতে লেগেছে? ছাড় ওসব। কথা আছে অনেক। আয়, খালের ধারে বসি।

আগাছার মধ্যে দিয়ে দুজনে খালের ধারে যায়। ঘাসে বসে। ডাবু পাছার তলায় রুমাল রাখতে ভোলে না। হেমাঙ্গ চটানের দিকে ঘুরে বসেছে। হালকা পাটকিলের রঙ রোদ খেলছে। খেলোয়াড়দের সিল্যুট মূর্তিগুলো ছোটাছুটি করছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে, হুলোও খেলছে ওদের সঙ্গে। পান্তলুন গুটিয়ে হাঁটুঅব্দি তুলে একজায়গায় দাঁড়িয়ে নাচানাচি করছে। কুঁজো হয়ে হাততালিও দিচ্ছে।

হেমাঙ্গ একটু চুপচাপ থাকার পর বলে, অনেক সিরিয়াস ব্যাপার ঘটেছে। তুই শোন। তারপর আমাকে বলবি, কী করা উচিত। তুই আমার চেয়ে অনেক ইনটেলিজেন্ট ডাবু—অন্ততঃ সাংসারিক

ব্যাপারে। তোকে যা বলব, ভেরি ইমপরট্যাণ্ট এবং কনফিডেন-সিয়াল—মাইণ্ড ছাট।

ডাবু হাঁটুতে তবলা বাজাতে বাজাতে বলে, হুঁ, বল্। হেমাঙ্গ শুরু করে।

আগাগোড়া সবটাই বলে সে। শঙ্করার কাছে যা কিছু শুনেছে, এবং অমিরও সায় দেওয়ার আভাস পেয়েছিল এক সন্ধ্যায় ওই চটানের ওখানে, ডিটেলস শোনায়। ডনের রিভালবার প্রসঙ্গও। কিন্তু টলুর সঙ্গে তার ঝড়ের সন্ধ্যার ব্যাপারটা এড়িয়ে যায়। এড়িয়ে যায়, হুলোর কাছে শুনে ডনকে ধরিয়ে দিতে থানায় খবর দেওয়ার ব্যাপারটাও।

সব শুনে ডাবু তুলতে তুলতে মুচকি হেসে বলে, হ্যামা। তুই মাইরি একটা ছাগল্।

কেন?

তুই টলুদি'কে ডনের পিস্তল দিতে গেলি কেন? অমি ছিল না—চলে এলেই পারতিস।

টলুদি—একটু ইতস্তত: করে হেমাঙ্গ বলে, টলুদিকে তো তুই জানিস! আমার পকেট হাতড়াতে গিয়ে দেখে ফেলল। তখন—

ওয়েট, ওয়েট! তোর পকেট হাতড়াতে এল টলুদি? ডাবু খ্যাক খ্যাক করে হাসে। একটা অশ্লীল জিনিস উল্লেখ করে বলে, তা ভাল। খুব ভাল। হাতড়াতে এল টলুদি! তোর মতো হাঁদারামকে পেয়েছে একা। বাঘিনী ছাগল পেয়েছে নিজের খাঁচায়। ফাইন।

হেমাঙ্গ বিব্রত হয়ে বলে, না, না! তেমন কিছু নয়।

চো-ও-প, বে! মায়ের কাছে মাসীর বাড়ির কথা শোনাচ্ছে! আমি জানি নে টলুদি কী জিনিস? আমি ঘরপোড়া গরু।

বলিস কী? তুইও তাহলে পড়েছিলি ওর পাল্লায়?

ডাবু ঘাসেভরা ঢালু পাড়ে পা ঝুলিয়ে নাচাতে নাচাতে বলে, গা ঘিনঘিন করে। বলিস নে। যাক্ গে, ছেড়ে দে। তাহলে

ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে ডনের পিস্তল নিয়ে তুই ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিস। কেমন তো?

মানে, ডন এখনও ফেরারী! ও নিশ্চয় লুকিয়ে বাড়ি আসবে কোনো এক সময়ে। অমির কাছে ওটা চাইবে। অমি বলবে, আমাকে রাখতে দিয়েছিল।

ডাবু কথা কেড়ে বলে, অমিকে আমি ম্যানেজ করছি। ভাবিস নে।

অমির সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে বললুম না? ও গোঁ ধরে আছে।

ভাব হতে কতক্ষণ? তোদের এ ব্যাপার তো ছেলেবেলা থেকে দেখছি।—বলে ডাবু ওর কাঁধে হাত রাখে। আমার সঙ্গে আয়। অমির সঙ্গে তোর আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং করিয়ে দিচ্ছি।

সূর্য ডুবে গেছে ততক্ষণে। ধূসর কালো ধূসরতর হয়েছে। চটান থেকে ছেলেরা হুল্লোড় করে ফিরে আসছে। তারা হল্লা করতে করতে পিছনের রাস্তা দিয়ে চলে গেলে হেমাঙ্গ লক্ষ্য করে হুলো একটু দাঁড়িয়ে তাদের দেখল! যেন আসবে ভাবল। তারপর চলে গেল।

ডাবু বলে, ওঠ্। তার এখানে বসা উচিৎ নয়। সাপ বেরুবে।

তারা রাস্তায় যায়। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে হেমাঙ্গ বলে, অমিকে তুই কোনোভাবে ডেকে আনতে পারিস নে ডাবু? ওদের বাড়ি যেতে আমার ইচ্ছে করে না।

টলুর ভয়ে তো?

ধর্, তাই।

রামছাগল! ডাবু হো-হো করে হাসে। তারপর গম্ভীর হয়ে যায়।—হেমা! অমির যা অবস্থা দেখলুম, সত্যি বড্ড উইক। ওকে বাইরে নিয়ে আসা মানে কষ্ট দেওয়া। তুই চল্ না বাবা। বলছি, তোকে ইনসালটেড হতে হবে না। কে ইনসালট করবে তোকে? আয়।

হেমাঙ্গ অনিচ্ছা নিয়ে পা বাড়ায়। তারপর বলে, পিসীমা রাগ করবেন যে! তুই দেখা করে আয়।

ডাবু জিভ কেটে বলে, উঁহু। এখন নয়। সন্ধ্যায় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কাল সকালে আসব'খন। আয়!

হেমাঙ্গ সারা পথ চুপ করে থাকে। অন্যমনস্ক। ডাবু গুনগুন করে গান গায়। বোস বাড়ির গেটে দেখা হয় প্রমথের সঙ্গে। বেরুচ্ছেন, হাতে ছড়ি আর টর্চ। বলেন, ওটা কে? হেমা? কোথায় ছিলে হে? তোমার পাত্তাই নেই। পিসীমা অসুস্থ বলেছিলে। কেমন আছেন?

হেমাঙ্গ বলে, ভালো। আপনি বেরুচ্ছেন?

একবার ঘুরে আসি। তোমরা যাও। জেঠিমা আছেন!—প্রথম ডাবুর দিকে ঘুরে বলেন, আকবরের সঙ্গে দেখা করেছ ডাবু? খপর পাঠিয়েছিল। দেখি কি ব্যাপার?

ডাবু বলে, কোন গোলমাল করছে নাকি?

প্রমথ মাথা নাড়েন।—না, না। টেণ্ডার তো অফিসিয়ালি অ্যাক্সেপ্টেড। অন্য কোন ব্যাপারই হবে। কতকটা আচঁও করেছি। শুনলুম আকবরদের গাঁয়ের বাড়িতে সার্চ করেছে পুলিস। ডন নাকি ওখানে আছে বলে খবর পেয়েছিল পুলিস। কোথায় ডন? খামোখা কেলেঙ্কারি!

প্রমথ চলে গেলে দু'জন লন পেরিয়ে যায় পাশাপাশি। বসার ঘরে আলো জ্বলছে। জন আর ইলু পড়তে বসেছে মাস্টামশায়ের কাছে। ডাবু হেমাঙ্গর হাত ধরে টেনে ভেতরের বারান্দায় যায়। বারান্দায় কেউ নেই। টলুর ঘরের দরজা বন্ধ। সিঁড়ির পাশের ঘরে সুলোচনার কথা শোনা যাচ্ছে। টলু সেখানেই আছে হয়তো।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠে দু'জনে। বাঁ পাশে মিলুদের ঘরে আলো জ্বলছে। মাঝের ছোট্ট ঘরটা বন্ধ। ডাইনে ডনের ঘরেও আলো জ্বলছে। পর্দা টাঙানো। হেমাঙ্গের মনে হয়, অসুস্থ অমিকে এভাবে একা ফেলে রাখে এরা! বড় অদ্ভুত এ বাড়ির লোকগুলো।

ডাবু হেমাঙ্গের দিকে চোখ নাচিয়ে অমির উদ্দেশ্যে একটু গলা ঝেড়ে বলে, আসতে পারি ম্যাডাম?

কোন সাড়া না পেয়ে ডাবু পর্দা তোলে।

হেমাঙ্গ দেখতে পায়, অমি কাত হয়ে শুয়ে আছে।

ডাবু ভেতরে ঢুকলে, সেও ঢোকে। ডাবু তার কাঁধে হাত রেখে ডাকে, অমি! ঘুমোচ্ছ? এই সন্ধ্যাবেলা!

কোন সাড়া না পেয়ে সে আবার ডাকাডকি করে। হেমাঙ্গ লক্ষ্য করে অমির পায়ের পাতা দুটো বেঁকে রয়েছে, সে বলে, ও কী রে! ওর পা'দুটো গ্যাখ্!

ডাবু ফস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তাহলে ফিট হয়ে আছে।

অমির চুল পিঠ, কাঁধ আর বিছানা জুড়ে ছড়ানো।

এক হাতের মুঠোয় বালিশ খামচে ধরে আছে। মুখটা এক পাশে কাত। হেমাঙ্গের বুকে কষ্ট ঠেলে ওঠে।

ডাবু অমিকে চিত করে শোয়ানোর চেষ্টা করে। অমির শরীরও বেঁকে সিঁটিয়ে রয়েছে। ঘোরানো যায় না। পেটের কাপড় সরে গেছে। পেটটা কাঁপছে। ফুলে ফুলে উঠেছে। ডাবু বলে, ওই গ্যাখ্! টেবিল জল আছে গ্লাসে। দে তো হেমা!

হেমাঙ্গ জলের গ্লাস দিলে ডাবু অমির মুখে ছিটিয়ে দেয়। কিন্তু অমির কোন সাড়া নাই। তখন ডাবু বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে ডাকে, টলুদি! টলুদি!

টলু সাড়া দিতে উঠোনে নেমেছে। সেখান থেকে বলে, কী রে ডাব?

অমি ফিট হয়ে পড়ে আছে যে!

থাক না। ওকে তুই ঘাঁটাতে গেলি কেন?

বা রে! এমনি হয়ে পড়ে থাকবে?

টলু চটে গিয়ে বলে, যা বুঝিস নে, কেন করিস বাবা? ডাক্তার বলেছে ওকে নিয়ে হইচই করলে ফিট বেড়ে যাবে। পড়ে থাকতে দে। নিজে থেকেই ছেড়ে যাবে। রোজ দেখছিনে আমরা?

ডাবু, তবু বলে, স্মেলিং সল্ট নেই ?

এবার টলু উঠে আসে হন্তদন্ত হয়ে। তার ধুপধুপ শব্দে বাড়ি যেন কাঁপতে থাকে। হেমাঙ্গ গম্ভীর মুখে বসে থাকে। টলু ডাবুর সঙ্গে ঘরে ঢুকে হেমাঙ্গকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। বাঁকা হেসে বলে, তাই বলো! স্বয়ং বড় ডাক্তার হাজির।

ডাবু অমিকে দেখতে দেখতে বলে, এমনি করে হাত-পা বেঁকিয়ে পড়ে থাকবে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। থাকবে।—বলে টলু হেমাঙ্গের দিকে ঘোরে। তবে আজ বড় ডাক্তার এসে গেছে। ভাবনা নেই অমির। টলু হাসতে থাকে।

হেমাঙ্গ কথা বলে। ডাবু খাটের পাশে সোফায় বসে সিগারেট বের করে হেমাঙ্গকে এগিয়ে দেয়। তারপর বলে, খুব ভুল হচ্ছে তোমাদের টলুদি। আমার মনে হয়, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কোন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখালে ভাল হত।

খরচ কে দেবে ? তুই ?—টলু ভুরু কুঁচকে বলে।

হুঁউ। দেব। দেওয়া উচিত।

টলু চোখ নাচিয়ে হেমাঙ্গকে দেখিয়ে বলে, বদান্যতা দেখিও না ডাবচন্দর। হেমা ইনসালটেড ফিল করবে। নারে হেমা ?

হেমাঙ্গ চটেছে। কি বলতে যাচ্ছিল, নীচে পল্টের গলা শোনা গেল। ঘণ্টার মাকে কী বলছে জোর গলায়। টলু বলে, আবার বুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে হতচ্ছাড়া। দেখাচ্ছি মজা!

সে বেরিয়ে যায়। ডাবু আর হেমাঙ্গ অমির দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানে চুপচাপ। ডাবু হাত বাড়িয়ে দেয়ালের তাক থেকে ডনের সুদৃশ্য অ্যাসট্রেটা টেনে নেয়। সামনে রাখে।

একটু পরে টলুর পায়ের শব্দ শোনা যায় সিঁড়িতে। হুমদাম করে দৌড়ে উঠছে। হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকে বলে, এই! জানিস ? হুলোর অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে।

হেমাঙ্গ তাকায়।—কী হয়েছে ?

মালগাড়িতে চাপা পড়েছে! পল্টে দেখে এল?

হেমাঙ্গ লাফিয়ে ওঠে।—কোথায় টল্‌দি?

মুসহর বস্তির ওখানটায়। সৈকা যেখানে চাপা পড়ে ছিল!। টল্‌ ডাবুকে বলে হুলোরে! সেই ছেলেটা—গুলাইয়ের হোটেলে থাকত! প্রায়ই ডনের সঙ্গে আসত আমাদের বাড়িতে!

ডাবু বলে হেমা! কোথায় যাচ্ছিস?

আসছি।

যাস নে বাবা। লাশ-টাস দেখে ভয় পেয়ে যাবি অমির মত। আয়, বোস।

না রে!—বলে হেমাঙ্গ টলতে টলতে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু রাস্তায় নেমে সে গতি কমায় হঠাৎ। তার চোখ ফেটে ঝরঝর করে জল এসে যায়। ঠোঁট কামড়ে ধরে সংযত থাকার চেষ্টা করে সে।

মধ্যরাতে মোহনপুরের আকাশে মেঘের ডাক শোনা গেল। একটু পরে গাছপালা শনশন করে উঠল। ঝড় আসছে। হেমাঙ্গ বাড়ির ভেতরদিকের জানালা ছুটো খোলা রাখে নি আজ রাতে। শুয়ে সিগারেট খেতে খেতে ঝড়ের শব্দ শুনতে থাকল সে।

একটু পরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রথমে বড় বড় ফোঁটায় চড়বড় ভারি শব্দ। তারপর ঝিরঝির এলোমেলো বৃষ্টি। হাওয়ার দাপট কমেনি। এখনও কি হুলোর মড়া রেলইয়ার্ডে পড়ে আছে? নিশ্চই নেই। তুলে নিয়ে গেছে।

অথচ খালি মনে হচ্ছে, ছেলেটা শুয়ে আছে লাইনের ওপর। নতুন প্যাণ্ট জামা জুতো পরে উপুড় হয়ে আছে। মাথাটা গুঁড়ো। চবচব করছে রক্ত। রক্ত ধুয়ে রেল গড়িয়ে ঘাসের পাতায় নেমে যাচ্ছে। একটা অনাথ ছেলে—মা বাবার পরিচয় জানে না, পৃথিবী-সুদ্ধ তার আপনজন। বোকা সরল নিষ্পাপ কিশোর।

হেমাঙ্গ উত্তেজনায় উঠে বসে। পা ঝুলিয়ে কিছুক্ষণ বসে হুলোর

কথা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে। পারে না। হুলোকে নিশ্চয় সৈকার মত গলা টিপে মেরে চলন্ত মালগাড়ির চাকার তলায় গুঁজে দিয়েছে ডনের চেলারা।

ঝেণ্টুই একাজ করেছে। হেমাঙ্গের এই দৃঢ়বিশ্বাস। ইদানীং ডনের বদলে ঝেণ্টুর সঙ্গেই সে ঘুরে বেড়াত। আকবরের বাড়িতে ডনের থাকার কথা হুলো জানত। হুলোর পেটে কথা থাকে না, কে না জানে মোহনপুরে? একদিন হেমাঙ্গই তো তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। হুলো জেরার চোটে নিশ্চয় কবুল করে গেছে।

হেমাঙ্গ বুঝতে পেরেছে, এবার আরও বেশী করে নিজেকে নিজেই বিপন্ন করে ফেলেছে সে। এবার তার পালা। আততায়ী আসার চরম মুহূর্তের জন্য তাকে এখন তৈরী থাকতে হচ্ছে। কখন তার ছায়া ভেসে উঠবে সামনে—পেছনে, ডাইনে আর বাঁয়ে। সিল্যুট মূর্তিগুলো ক্রমশঃ তাকে বেড় দিয়ে ঘিরবে। ক্রমশঃ কাছে আসবে। তারপর—

তারপর আরও একটা দুর্ঘটনা ঘটবে রেল-ইয়ার্ডে!

হেমাঙ্গ হিংস্রভাবে উঠে দাঁড়ায়। অস্থির পয়চারি করে অন্ধকার ঘরে। হুলোকে ঝেণ্টুই মেরেছে। ডন অন্য কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে। সে রেল-ইয়ার্ডে আসে নি ওই সন্ধ্যাবেলায়। হুলো ফুটবল খেলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই মারা পড়েছে! কাজেই এ ঝেণ্টুরই কাজ। হুলো মাঠ থেকে সোজা ওর বাড়িতে গিয়েছিল। হয়তো।

হয়তো কেন? ঠিক তাই। হেমাঙ্গ টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে খাটের তলা থেকে লোহোর মরচে ধরা রডটা টেনে বের করে। তারপরই কী এক শক্তি তাকে ভর করে। সে বাইরে দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় যায়। ঝাঁপিয়ে নীচে নামে। বৃষ্টি আর উত্তাল বাতাসের মধ্যে সে টলতে টলতে কাঠের ব্রীজে যায়। মুসহর বস্তির ও-পাশ ঘুরে রেল-ইয়ার্ডের ধারে পৌঁছায়। গেঞ্জি পাজামা ভিজে গায়ে সেঁটে গেছে। বৃষ্টিতে সব ঝাপসা দেখছে।

ঝেণ্টুর ঘরের দরজায় গিয়ে সে ডাকবে। ঝেণ্টু বেরিয়ে এলেই—

ঘোড়ানিমগাছটার তলা এসে বাঁদিকে ঝেণ্টুর ঘরের দিকে ঘোরার আগে অকারণে কিংবা অবচেতন তাগিদে সে ডাইনে একবার ঘোরে। সিগন্যাল পোস্টের পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পায় সে-রাতের মতো। অমনি হেমাঙ্গ টলতে টলতে দৌড়য় সেদিকে। রেল-ইয়ার্ডের উজ্জ্বল আকাশ-বাতির আলো যদিও বৃষ্টিতে ঝাপসা, তবু অমি ছাড়া আর কে হতে পারে?

হেমাঙ্গ চিৎকার করে ওঠে, অমি।

অমি তার দিকে ঘুরে দৌড়তে শুরু করে—সে রাতের মতো। হেমাঙ্গ রড তুলে পাগলের মতো গর্জন করে ওঠে, অমি! দাঁড়াও—নইলে খুন করে ফেলব।

প্রচণ্ড শব্দে মেঘ ডাকে। বিদ্যুতের ছটা খেলে যায় আবার। হেমাঙ্গ সেই ছটায় দেখতে পায়, অমি ভাঙা ওয়াগনটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

হেমাঙ্গ ঢুকেই আছাড় খায়। ভেতরে ইঁদুরের মাটি আর জঙ্গল গজিয়ে থাকতে দেখেছে। সাপের কথা এ মুহূর্তে মনে নেই। সে অমিকে খোঁজে। রডটা এদিকে ওদিকে ঘুরিয়ে কোথায় অমি আছে টের পেতে চায়। একটু পরে অমির ফোঁপানি শুনতে পায় সে। তখন সে দিকে পা বাড়ায়। পা ঢুকে যায় তলার ফাটলে। কেটে-ছড়ে যায় হয়তো। গ্রাহ্য করে না। অমিকে আঁকড়ে ধরে টানতে থাকে সে! রড ফেলে দেয়। তারপর দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে তুলে ফেলে বুকের কাছে। অমি ছটফট করে। তার নখের আঁচড়ে ফালা-ফালা হয়ে যায় তার বুক, গলা, ঘাড়, গাল।

হেমাঙ্গকে অমানুষিক শক্তি ভর করে আছে। সে লাইনের ধারে-ধারে ওকে তুলে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে দৌড়তে থাকে।

কাঠের ব্রীজ পেরিয়ে যাবার পর অমি অবশ হয়ে পড়েছে। তখন আস্তে আস্তে হাঁটে হেমাঙ্গ।

অনেক কষ্টে বারান্দায় উঠে হেমাঙ্গ হাঁফাতে হাঁপাতে ডাকে, পিসিমা! পিসিমা!

কাদা আর ওয়াগানের জংমাখা অমিকে সে তার বিছানায় শুইয়ে দেয়। মুনাপিসি উঠে এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। হেমা! ও হেমা! কী হল?

হেমাঙ্গ দরজা খুলে দেয়। তারপর সুইচ টিপে ওপরের বাতি জ্বালে। মুনাপিসি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, একী রে! ওকে কোথায় পেলি?

হেমাঙ্গ ভাঙা গলায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, একটা কাপড়-টাপড় আনো শীগ্‌গির। বদলে দাও। আর—চেষ্টা করে দেখ তো ফিট ভাঙতে পারো নাকি।

মুনাপিসি দ্রুত বেরিয়ে যায়। একটু পরে একটা শাড়ি নিয়ে আসে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে মুনিপিসি অমির শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়। হেমাঙ্গ জানে, এ মোহনপুরে মুনাপিসির মত বড় হৃদয় কারুর নেই।

হেমার দিকে তাকিয়ে মুনাপিসি বলে তুই এখনও ভূত সেজে রইলি কেন বাবা? ধুয়ে ফেল গে। কাপড় বদলে নে। নিমুনি হবে যে?

শেষ রাতে অমির ফিট ভাঙল। পিসি-ভাইপো পাশে বসে রাত জাগছে। অমি চোখ খুলে কিছুক্ষণ বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর অবাক হয়ে ওদের মুখের দিকে তাকায়।

তারপর উঠে বসতে চেষ্টা করে। রুগ্নস্বরে বলে, আমি এখানে কেন? কে আনল আমাকে?

মুনাপিসি ধরে শুইয়ে দেয়। বলে চুপচাপ শুয়ে থাকো মা। আমি আছি। ভয় কী? আহা, মা বেঁচে থাকলে কি—

কথা থামিয়ে মুনাপিসি চোখ মোছে। অমি একটু হাসে। একটা শীর্ণ হাত বাড়িয়ে দেয় মুনাপিসির দিকে। সব ময়লা গরম জলে

ন্যাকড়া ভিজিয়ে সাফ করে দিয়েছে মানদাসুন্দরী। অমির হাতটা নিয়ে গালে রেখে বুড়ী বলে, এবার ঘুমোবার চেষ্টা করো। বোনেরা এখনও টের পায় নি। পাবে'খন। হেমা বলে আসবে, আমার কাছে আছে। থাকলেই বা! আমার পেটেই যদি আসত এমনি একটা মেয়ে! ফেলে দিতুম?

তুমি আমার পাশে শোও না পিসিমা!

কই, সরো। হেমা, তুই ওঘরে শোগে যা বাবা।

হেমাঙ্গ শুতে যায় না। বাইরের দরজা খুলে বারান্দায় যায়। ভোরের ধূসর ভিজে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে আনমনে। তারপর ঝেণ্টু কিংবা ডনের উদ্দেশে ঠোঁট বাঁকা করে। একটা সিগারেট ধরায়।

বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে। খাল, মুসহর বস্তি, রেল-ইয়ার্ড, শ্মশানতলা জুড়ে চারিদিকে মোহনপুরের মাটি ও আকাশে এখন ধূপের ধোঁয়া ছড়িয়ে আছে। একটা স্নিগ্ধ গন্ধ ভেসে আসে। হেমাঙ্গ সেই গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সিগন্যাল পোস্টের কাছে ফেলে আসা লোহার রডটা খুঁজতে যায়।

খালপোল পেরিয়ে পায়েচলা সরু রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হেমাঙ্গ টের পায়, এভাবে সত্যিসত্যি সে একটা মরচেধরা লোহার রড ফিরে পেতে হয়তো যাচ্ছে না। সেটা কি সত্যি একটা জরুরী জিনিস তার কাছে? এ আসলে একটা প্রতীক। আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকার জন্য অসহায় একটা অবলম্বন।

কিন্তু ঝেণ্টু বা ডনদের শক্তির কাছে কত তুচ্ছ ওটা! সময়ের কোন গোপন গুহার দরজা খুলে পালেপালে যেন বেরিয়ে পড়েছে হিংস্র অশুভ নেকড়েগুলো। সব বিশুদ্ধতা নখের আর দাঁতের আচড়ে ফালা ফালা করে দিচ্ছে। পাপে অন্ধকার ঢেকে ফেলছে পুণ্যের রক্তাক্ত শরীর। সব কালো হয়ে যাচ্ছে। এখন এ পৃথিবীতে যারা বেঁচে আছে, তাদের শরীরে সেই কালো অন্ধকারের ছোপ। সিল্যুট মূর্তির মতো মানুষজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, ভালবাসছে এবং ছেলেপুলের জন্ম দিচ্ছে।

হেমাঙ্গ তাদের একজন বলে তারও অস্তিত্বে সেই কালো ছোপ। একই কলঙ্কক্ষত। গোপন উপদংশের মতো। হেমাঙ্গ শিউরে ওঠে। থমকে দাঁড়ায়। তার চোয়াল আঁটো হয়ে যায়।

অথচ মধ্য রাতের সেই ঝড়ের পর পৃথিবী এখন ধূপের ধোঁয়ার মতো কুয়াশাময় ভোরবেলায় গভীর কী এক মাদক গন্ধে ছড়িয়ে দিচ্ছে বেঁচে থাকার আনন্দকে মুঠোয়-মুঠোয়। ভিজে ঘাস, খড়-কুটো, পাখির পালক, ঘুমঘুম চোখে তাকিয়ে থাকা গাছপালা জুড়ে ধ্বংসের পর শান্তির আচ্ছন্নতা যেন। বেঁচে থাকতে ও ভালবাসতে বড় ইচ্ছে করে। ভাবতে ইচ্ছে করে, যুগ যুগ ধরে মানুষ ও তার পৃথিবীর এইরকমই তো ইতিহাস! আলো ও অন্ধকারে, পাপ ও পুণ্যে, মৃতে ও অমৃতে একাকার। দুই-ই হয়তো সত্য। এই সত্য নিয়েই অস্তিত্ব।...

রেল-ইয়ার্ডে একটা ইঞ্জিন হঠাৎ তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল দিল। একটু দূরে মালগাড়ির শান্টিং শুরু হয়েছে। কুয়াশার শীর্ষে লালচে আলো ফুটে উঠেছে দিগন্তে। ইঞ্জিনের ধোঁয়া সেই আলোকে কালো করে দিচ্ছে বারবার। সেদিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে হেমাঙ্গ।

তারপর কেউ তাকে ডাকে। হেমাদা!

হেমাঙ্গ চমকে উঠে মুখ ফেরায়। ডানদিকে খালের ধারে ঝোপঝাড় ঠেলে কে বেরিয়ে আসছে। হেমাঙ্গের হৃদপিণ্ডে মুহূর্তে রক্ত ঝিলিক দেয়। ডন!

তাহলে এতক্ষণে আততায়ী এল? হেমাঙ্গ আবিষ্টের মতো তাকিয়ে থাকে ডনের দিকে। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে ডন। ঠোঁটের কোণায় কেমন একটা হাসি। নাকি হেমাঙ্গর চোখের ভুল!

ডন সামনে এসে দাঁড়ায়। ফের ডাকে, হেমাদা!

হেমাঙ্গ গলার ভেতর থেকে বলে, কী?

ডনের হাতে ড্যাগার নেই। গলার স্বরে কেমন চাপা উৎকণ্ঠা। সে আস্তে বলে, দিদি কোথায় জানো হেমাদা?

হেমাঙ্গ বলে, জানি। কেন?

ডন একটু হাসে। তুমি কি ভয় পাচ্ছ আমাকে দেখে হেমাদা?

হেমাঙ্গ মাথা দোলায় শুধু।

বাড়ি গিয়েছিলুম। শুনলুম, দিদির পাত্তা নেই। ডন উদ্বিগ্নমুখে বলতে থাকে। হঠাৎ ফিটের ঘোরে নাকি বেরিয়ে গেছে কখন, ওরা কেউ টের পায় নি। খোঁজও করে নি। এত অকৃতজ্ঞ ওরা হেমাদা!

হেমাঙ্গ বলে, অমি মুনাপিসির কাছে আছে। ওখানেই থাকবে।

ডন,—নিষ্ঠুর ঘাতক ডনের চোখে কি জল? হেমাঙ্গ বিশ্বাস করতে পারে না। ডন হঠাৎ এগিয়ে তার দুটো হাত ধরে ধরাগলায় বলে, জানতুম হেমাদা। যেন জানতুম। তাই তোমাদের বাড়ি যাচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখলুম, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ। তাই…

স্বাভাবিক স্বরে হেমাঙ্গ বলে, তুমি কি এখনও লুকিয়ে বেড়াচ্ছ নাকি?

ডন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে জবাব দেয়, হ্যাঁ। তবে শীগগির সেট্‌ল্ হয়ে যাবে। তারপর হাসবার চেষ্টা করে বলে, ইলেকশান আসছে না? আমাকে ওদের কত দরকার, তা তো জানোই হেমাদা!

হেমাঙ্গ নিশ্বাস ফেলে বলে, তোমার রিভলবারটা আমি…

বাধা দিয়ে ডন বলে, টলুদির কাছে সব শুনেছি। ওকথা থাক হেমাদা। রিভলবারের অভাব হয় না আজকাল। যাক্ গে, শোন। দিদিকে দেখা করতে আর যাচ্ছি না। তোমাদের কাছে যখন আছে, আর আমার ভাবনা নেই। শুধু একটা অনুরোধ, হেমাদা!

কী?

যদি দিদিকে তুমি সত্যি ভালবাসো, তাহলে প্লিজ, বিয়ে করে ফেলো!

হেমাঙ্গের হাসতে ইচ্ছে করে। এই সেই বিচিত্র নীতিবাগীশ ছেলে ডন! দিদিকে সে কত ভালবাসে, তা তো বরাবর দেখেছে হেমাঙ্গ। সে বলে, দেখি। ও এখন অসুস্থ। তাছাড়া…

ডন ফের তার হাত দুটো ধরে বাচ্চাছেলের মতো বলে ওঠে, হেমাদা! দিদির জন্যে আমার পিছুটান যাচ্ছে না। এতটুকু

নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, বিশ্বাস করো। ও যদি তোমার কাছে থাকে, তাহলে আমার মুক্তি!

কিসের মুক্তি ডন?

ডন একটু চুপ করে থাকে। মাটির দিকে চোখ। তার মানুষ খুনকরা হাত দুটো এখনও হেমাঙ্গের হাতে। এ যেন কী অসহায় এক অনাথ বালকের হাত! হেমাঙ্গ ফের বলে, কিসের মুক্তি?

ডন বলে, কে জানে! ওইরকম মনে হয় খালি। আচ্ছা, চলি হেমাদা!

ডন, হুলোকে তোমরা খুন করলে কেন?

ডন চমকে ওঠে যেন। মুহূর্তে তার চেহারায় সেই পরিচিত ক্রুরতা ফিরে আসে। ঠোঁটের কোণা কামড়ে ধরে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলে, ইদানীং শুওরের বাচ্চাটা পুলিসের ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল। ছেড়ে দাও ওকথা। তুমি ভদ্রলোক হেমাদা, এসব লাইনের খবর রেখে কী করবে? তুমি তোমার লাইনে থাকো। আচ্ছা, চলি!

ডন এগিয়ে যায় মুসহর বস্তীর দিকে। হেমাঙ্গ পিছু ডেকে বলে, ডন! দিদির সঙ্গে একবার দেখা করে যাও। ওর অসুখ বেড়ে গেছে। কাল রাতে ঝড়-বৃষ্টির সময় ওকে ভাঙা মালগাড়ির ভেতর থেকে কী কষ্টে যে তুলে এনেছি, কহতব্য নয়।

ডন ঘোরে। ভুরু কুঁচকে বলে, ভাঙা মালগাড়ির ভেতর?

হ্যাঁ। তুমি যেখানে জগাকে খুন করেছিলে।

তুমি কীভাবে···

আমি জানি, ডন।

ডন আবার ফিরে আসে কাছে। আস্তে বলে, দিদি ভুল করেছিল। জগাদা হারামীবাচ্চা। টের পেতে দেরি হয়েছিল দিদির। হেমাদা, আমি দিদিকে যতটা চিনি, তুমি ততটা চেনো না।

হেমাঙ্গ হাসবার চেষ্টা করে বলে, কিন্তু তোমার দিদি ফিটের ঘোরে বারবার ওখানে যায়, জানো কি?

যায় নাকি? ডন একটু অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, দিদি বাইরে যত কড়া হোক, ভেতরে ভীষণ নরম। ভীষণ ভীতু। খুনোখুনি রক্ত এসব সইতে পারে না। আমি ওর ভাই। আমাকে মায়ের মতো মানুষ করেছে। অথচ আমাকে ওর এত ভয়, ভাবতে পারবে না।

হেমাঙ্গ সায় দিয়ে বলে, তা ঠিক।

ডন হঠাৎ ভুরু কুঁচকে তাকায় তার দিকে। একটু পরে বলে, কিন্তু ভাঙা মালগাড়ির ভেতর দিদি কেন যায়, জিগ্যেস করো নি হেমাদা?

করব'খন।

ডন একটু ভেবে নিয়ে মুখ নীচু করে বলে, বলতে নেই। কিন্তু বলা উচিত তোমার কাছে। সব ক্লিয়ার থাকা ভালো। জগাদা দিদির ওপর হামলা করেছিল। ভালবাসার ছলে ডেকে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করতে চেয়েছিল দিদিকে। আমি আঁচ করেছিলুম কী ঘটবে। তাই তক্কেতক্কে ছিলুম। হেমাদা, দিদি এত বোকা মেয়ে।

ডন চুপ করলে হেমাঙ্গ বলে, তারপর?

সৈকাকেও ঠিক একইভাবে রেপ করে মেরে ফেলেছিল জগাদা।

জানি।

তাহলে আর জিগ্যেস করছ কেন?

জিগ্যেস করছি, তার কারণ···হেমাঙ্গ আনমনে বলে, ঘটনাটা স্পষ্ট নয় আমার কাছে। এও শুনেছি, তুমি সৈকাকে ভালবাসতে।

ডন হাসবার চেষ্টা করে। কে জানে। তবে মেয়েটাকে ভাল লাগত।

সত্যি কথা বলো তো ডন, তুমি জগদীশকে সৈকার জন্যে খুন করেছিলে, না তোমার দিদিকে বাঁচাতে খুন করেছিলে?

ডন দ্রুত বলে, দুটো কারণেই। দিদি জগাদার কথামতো ওখানে গিয়ে পড়েছিল। তখনও সৈকার বডি মালগাড়ির ভেতর পড়ে আছে। দিদি ভয় পেয়ে পালিয়ে আসছে, সেইসময় জগা-

...দের্কেও রেপ করার চেষ্টা করছিল। তখন আমি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। আচ্ছা, চলি।

ডন হনহন করে চলে গেল। হেমাঙ্গ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়ি... থাকে। তারপর খালপোলের দিকে পা বাড়ায়।

অমির হিস্টিরিয়ার একটা অস্পষ্ট কারণ তার মাথায় ভে... উঠেছে এতক্ষণে। অমি সত্যি আসলে বড্ড ভীতু। গে... মেয়ে হলে কী হবে? সেদিন পরপর দুটো খুনোখুনি—সৈকার লা... এবং জগাকে খুন করার তীব্র ঘটনা তার অবচেতনায় হুলুস্থুল বাধিয়ে ছিল। সেই বিশাল ভয়ঙ্কর আতঙ্ককে হজম করার শক্তি অমির ছিল না। হেমাঙ্গ মনস্তত্ত্ব পড়েছে। সে জানে, এটা 'অবসেসনে'র অসুখ। অমি বারবার ওই ভাঙা মালগাড়ির দিকে ছুটে যায় ফিটের ঘোরে—এই অসুখের ডাক্তারী নামও আছে একটা। কী যেন...

হেমাঙ্গের ভাবনার ঘোর কেটে যায়। ডাবু খালের ওপারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ডাকছে। এ্যাই হ্যামা!

হেমাঙ্গ মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ডাবুকে এ মুহূর্তে জীবনের উল্টোপিঠের একটা বড় প্রেরণা মনে হয়। জীবনের ওইদিকটায় সব কিছু তুচ্ছ করে বেঁচে থাকার, আনন্দ পাওয়ার এবং নির্বিকার-ভাবে টাকা রোজগারের প্রচুর শক্তি পড়া রোদে ঝলমল করছে। অন্ততঃ অমির জন্যে সে ডাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। তার হাতে হাত মিলিয়ে হাঁটবে। বেঁচে থাকতে হলে এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই হেমাঙ্গের।

সে হাত তুলে সাড়া দেয়, যাচ্ছি।...

—শেষ—